তফসীরে নূরুল কোরআন

চব্বিশ পারা

২৪

মওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম (র.)

চব্বিশতম খন্ড

তফসীরে নূরুল কোরআন

২৪ পারা

২৪ খণ্ড

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক মাসিক আল-বালাগ,
তফসীরকার রেডিও বাংলাদেশ, প্রাক্তন সদস্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
বোর্ড অফ গভর্নরস, মরহুম ইমাম ও খতীব লালবাগ শাহী মসজিদ
এবং বহু দ্বীনি গ্রন্থ প্রণেতা

হযরত মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (রঃ)

আল-বালাগ পাবলিকেশন্স
ঢাকা

প্রকাশক ঃ মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম (তারেক)

পঞ্চম প্রকাশ ঃ রমজান ১৪৩৪ হিঃ
শ্রাবণ ১৪২০ বাং
আগষ্ট ২০১৩ ইং

গ্রন্থ স্বত্ব ঃ প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

হাদীয়া ঃ ৩০০.০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণে ঃ নিউ এস, আর প্রিন্টিং প্রেস
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা

অক্ষর বিন্যাস ঃ মোঃ হারুন-অর-রশীদ

প্রাপ্তিস্থান ঃ

আল-বালাগ কার্যালয়
১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড
মোহাম্মদপুর, ব্লক-এ, ঢাকা-১২০৭

গাওসিয়া পাবলিকেশন্স
১১, বাংলাবাজার (ইসলামী টাওয়ার)
ঢাকা-১০০০
ফোনঃ ৯৫৫৮৯১৩

এমদাদিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার, ঢাকা

আন্-নূর পাবলিকেশন্স
৫২, বাংলাবাজার
ঢাকা-১০০০
মোবাইল ০১৭১৩-০১৪৮৮৯

Tafsir-e-Nurul Quran (24), Published by Al-Balag Publications.
12/17, Sir Sayed ahmed Road, Mohammadpur, Block-A,
Dhaka-1207

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহ্ পাকের জন্যে, যাঁর অফুরন্ত নেয়ামত আমরা অহরহ ভোগ করছি, যাঁর অগণিত দানে আমরা ধন্য, যিনি দয়া করে আমাদেরকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উম্মতভুক্ত হবার তৌফিক দান করেছেন, যিনি দয়া করে আমাদেরকে পবিত্র কোরআন পাঠ করার সৌভাগ্য দান করেছেন এবং যিনি তাঁর বিশেষ দান স্বরূপ 'তফসীরে নূরুল কোরআন' পেশ করার তৌফিক দান করেছেন, তাঁর মহান দরবারে অগণিত শোকর যে, তিনি আজ তফসীরে নূরুল কোরআনের ২৪তম খন্ড পেশ করার সুযোগ দিয়েছেন। যদি সর্বক্ষণ, তাঁর এ নেয়ামতের জন্যে শোকর আদায় করতে থাকি তবুও তাঁর শোকর গুজারীর হক্ব কখনও আদায় হবেনা।

অগণিত দরুদ ও সালাম প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি, পৃথিবীর শুরু থেকে এ পর্যন্ত তাঁর প্রতি যত দরুদ পেশ করা হয়েছে তার সংখ্যা মোতাবেক, হে আল্লাহ! দয়া করে তোমার হাবীবের প্রতি আমার দরুদ ও সালামের হাদীয়া পৌঁছে দাও তাঁর শান মোতাবেক।

যুগে যুগে মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে আল্লাহ্ পাক লক্ষাধিক নবী রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন, আর এ উদ্দেশ্যেই চারখানি আসমানী গ্রন্থ নাযিল করেছেন। হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি তৌরাত, হযরত দাউদ (আঃ)-এর প্রতি যবুর, হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি ইঞ্জিল এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব পবিত্র কোরআন নাযিল হয়েছে। তবে পবিত্র কোরআন ব্যতীত অন্য কোন আসমানী গ্রন্থ পৃথিবীতে সঠিকভাবে সংরক্ষিত নেই। ইহুদীরা তৌরাতকে, খৃষ্টানরা ইঞ্জিলকে তাদের ইচ্ছা মাফিক পরিবর্তন করেছে। আর এজন্যেই পবিত্র কোরআনকে আল্লাহ পাক স্বয়ং হেফাজত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। কোরআনে করীমে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন ঃ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ

"নিশ্চয় আমিই কোরআন নাযিল করেছি, আর নিশ্চয় আমিই তার হেফাজতকারী"।

এজন্যেই বিগত প্রায় দেড় হাজার বছর যাবত পবিত্র কোরআন সম্পূর্ণ সংরক্ষিত। যুগের আবর্তন-বিবর্তনের কারণে পবিত্র কোরআনে কোন প্রকার পরিবর্তন হয়নি। অথচ পৃথিবীর প্রত্যেকটি ভাষারই পরিবর্তন হচ্ছে, এমনকি আরবী ভাষায়ও অনেক পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু পবিত্র কোরআন অপরিবর্তনীয়, এটি কালজয়ী গ্রন্থ, স্বয়ং আল্লাহ পাকের কালাম। মুসলিম জাতির সৌভাগ্য যে, মুসলমানদের নিকটই মহান আল্লাহ পাকের সর্বশেষ পয়গাম পবিত্র কোরআন সম্পূর্ণ সংরক্ষিত রয়েছে।

পবিত্র কোরআন সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ, পবিত্র কোরআন বিশ্ব-গ্রন্থ। বিশ্ব মানবের কল্যাণ সাধনই এ মহাগ্রন্থের সকল শিক্ষার মূল লক্ষ্য। পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হওয়ার এবং তাঁর অফুরন্ত করুণা লাভের মাধ্যমই হল পবিত্র কোরআন। এক মহান, নির্ভুল, সর্বাধিক পঠিত, সর্বকালে সংরক্ষিত পবিত্র গ্রন্থ হলো পবিত্র কোরআন।

বিশ্ব-সমস্যার সমাধান পেতে হলে দেখতে হয় পবিত্র কোরআন। বিশ্ব শান্তি কায়েম করতে হলে পথ-নির্দেশ নিতে হয় পবিত্র কোরআন থেকে।

পবিত্র কোরআনের দু'টি শব্দ অত্যন্ত তাৎপর্যবহ, একটি 'নূর' অর্থাৎ আলো বা জ্যোতি। আরেকটি 'জুলমাত' অর্থাৎ অন্ধকার। আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআন নাযিল করার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে সূরা ইব্রাহীমে ঘোষণা করেছেন,

الٓرٰ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ

অর্থাৎ 'আলিফ, লাম, রা। এই কিতাব (হে রসূল!) আমি আপনার প্রতি এজন্যে নাযিল করেছি, যেন আপনি মানুষকে গোমরাহীর অন্ধকার থেকে হেদায়েতের আলোর দিকে নিয়ে আসেন'।

এতে কয়েকটি কথা প্রমাণিত হয়ঃ হেদায়েতের আলো লাভ করার দু'টি মাধ্যম রয়েছে একটি হল পবিত্র কোরআন, আর দ্বিতীয়টি হল হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শ। অন্য আয়াতে হেদায়েতের এ দু'টি মাধ্যম সম্পর্কে আরো সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা রয়েছে, এরশাদ হয়েছে ঃ

قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ

'হে মানব জাতি! তোমাদের নিকট আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এসেছে একটি নূর আর একটি কিতাব।'

'নূর' শব্দ দ্বারা নূবওয়্যতের আকাশের দীপ্তিমান সূর্য হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, আর কিতাব হল পবিত্র

কোরআন। এমনিভাবে সূরা তাগাবুনে এরশাদ হয়েছে ঃ

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِىْٓ اَنْزَلْنَا

'তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি, তাঁর রসূলের প্রতি আর সেই নূরের প্রতি যা আমি নাযিল করেছি'।

পূর্ববর্তী আয়াতে নূর বলা হয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে, আর এ আয়াতে নূর বলা হয়েছে পবিত্র কোরআনকে।

চন্দ্র সূর্য দ্বারা সমগ্র বিশ্ব আলোকিত হয়, কিন্তু মানব-মন অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। আধুনিক বিজ্ঞানের অবদান বিদ্যুৎ দ্বারাও মানব মনকে আলোকিত করা যায় না। মানব-মন আলোকিত হয় শুধু পবিত্র কোরআন এবং হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হেদায়েত দ্বারা। যেহেতু মুসলিম জাতিই পবিত্র কোরআনের ধারক ও বাহক, আর মুসলিম জাতিই হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসারী, তাই মুসলিম জাতির প্রতি সমগ্র বিশ্ব মানবের কল্যাণ সাধনের তথা তাদের পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। এজন্যেই পবিত্র কোরআনের সূরা আলে ইমরানে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

'পৃথিবীতে প্রেরিত সকল উম্মতের মধ্যে (হে মোমেনগণ!) তোমরাই উত্তম দল, সমগ্র মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যেই তোমাদের আবির্ভাব, তোমরা মানুষকে সত্যের নির্দেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে, আর আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান আনবে'।

অতএব, হেদায়েতের আলোক-বর্তিকা মুসলিম জাতির হাতেই রয়েছে। অর্থাৎ পবিত্র কোরআন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনিন্দ্য-সুন্দর আদর্শ। এর আলো ব্যতীত সমগ্র বিশ্ব অন্ধকারে আচ্ছন্ন, এমনকি যখন মুসলিম জাতিও পবিত্র কোরআনের আলো থেকে বঞ্চিত হয় তখন তারাও গোমরাহীর অন্ধকার সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। তাই পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণ এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণের বিকল্প নেই। আজকে এ অশান্ত পৃথিবীর অশান্তি দূরীভূত করতে হলে, বিপন্ন মানবতাকে রক্ষা করতে হলে পবিত্র কোরআনের পথ-নির্দেশনা ব্যতীত গত্যন্তর নেই।

বর্ণিত আছে যে, একবার আল্লাহ্ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে বলেছিলেন, আমি উম্মতে মোহাম্মদীয়াকে দু'টি নূর দান করেছি, যেন দু'টি অন্ধকার তাদের জন্যে ক্ষতিকর না হয়। হযরত মূসা (আঃ) আরজ করলেন, হে পরওয়ারদেগার! নূর দু'টি কি? আল্লাহ্ পাক এরশাদ করলেন ঃ "নূরু রামাদ্বান ও নূরুল কোরআন" অর্থাৎ একটি হলো রমজানের নূর, অপরটি হলো কোরআনের নূর।

হযরত মূসা (আঃ) আরজ করলেন, হে পরওয়ারদেগার! অন্ধকার দু'টি কি? আল্লাহ্ পাক এরশাদ করলেন ঃ কবরের অন্ধকার এবং কেয়ামতের দিনের অন্ধকার। অতএব, পবিত্র কোরআনের নূর ব্যতীত শুধু যে জীবন-সমস্যার সমাধান হয়না তাই নয়; বরং কেয়ামতের দিনের অন্ধকারও দূর হবে না।

দ্বিতীয়তঃ এ জীবনে পবিত্র কোরআনের নূর বা জ্যোতি ব্যতীত যে কথা বা কাজই হোক না কেন তাতে রয়েছে অন্ধকার, জীবনের এ অন্ধকার দূর করতে হলে চাই পবিত্র কোরআনের নূর বা নূরুল কোরআন, আংশিক ভাবে নয়; সামগ্রিক ভাবে, মৌখিক ও লৌকিক নয়; বরং আন্তরিক ও বাস্তবিকভাবে।

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে শুধু পবিত্র কোরআনের পাঠ শেখেননি; বরং তার উপর আমল করাও শিখেছেন এবং তাঁদের জীবনের বৃহত্তর অংগনে পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার বাস্তবায়ন করেছেন, তাঁরা এর শুভ-পরিণতিও লাভ করেছেন সঙ্গে সঙ্গে। বর্বরতার যুগের সকল অন্যায়-অনাচার, জুলুম-অত্যাচার, অবিচার এবং ব্যভিচার এককথায় সকল অন্ধকার অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দূরীভূত হয়ে যায়, ন্যায় বিচার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাকওয়া পরহেযগারী হয় তাঁদের বৈশিষ্ট্য, কায়েম হয় বিশ্ব শান্তি, তাঁরা মানবতার উৎকর্ষ সাধনে আত্মনিয়োগ করেন, সমগ্র বিশ্বে ইসলামের পয়গাম পৌঁছে দেন, যারা এ পথে তাদেরকে বাধা দেয় তাদের বিরুদ্ধে তাঁরা প্রাণপণ জেহাদ করেন, ফলে তদানীন্তন দু' পরাশক্তি পারশ্য এবং রোমান সাম্রাজ্য মাত্র এক যুগের মধ্যে সাহাবায়ে কেরামের সম্মুখে ভুলুণ্ঠিত হয়, এটি ছিল পবিত্র কোরআনের নূর এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণের বরকত।

একথা অপ্রিয় হলেও সত্য যে, আজ মুসলিম জাতি পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা থেকে অনেক দূরে। পরিণামে বিশ্ব মুসলিম আজ সমস্যা-জর্জরিত, এমনকি বিপদগ্রস্ত।

এ বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে হলে পুনরায় ফিরে আসতে হবে পবিত্র কোরআনে এবং যত্ন সহকারে অনুসরণ করতে হবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের। আর এ উদ্দেশ্যে পবিত্র কোরআনের মর্মবাণী উপলব্ধি করা পুর্বশর্ত।

হয়তো এ কারণেই আল্লাহ পাক আমাদেরকে তফসীরে নূরুল কোরআন পেশ করার তৌফিক দান করেছেন। এটি নিঃসন্দেহে তাঁর মহান দান।

আলহামদুলিল্লাহ! আজ তফসীরে নূরুল কোরআনের ২৪তম খন্ড প্রকাশিত হওয়ার শুভ মুহূর্তে দরবারে এলাহীতে আদায় করি সেজ'দায়ে শোকরানা। এ পর্যন্ত যা কিছু হয়েছে তা শুধু আল্লাহ পাকের দানেই হয়েছে, আর যা অবশিষ্ট রয়েছে তাও ইন্‌শাআল্লাহ তাঁর দানেই সুসম্পন্ন হবে।

হে পরম করুণাময় আল্লাহ! কবুল কর আমাদের সাধনা এবং এ মহান গ্রন্থকে পরিপূর্ণ করার তৌফিক দান কর।

হে দয়াময়! তোমার প্রদত্ত জিন্দেগী তোমারই বন্দেগীতে অতিবাহিত করার তৌফিক দান কর। দুনিয়া আখেরাত দু' জাহানে আমাদের প্রতি রহমত নাযিল কর।

তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলের অনুসরণের তওফিক দান কর এবং তাঁর উসিলায় আমাদের দোয়া কবুল কর।

আমরা সকল পাঠক-পাঠিকার নিকট বিশেষভাবে দোয়া প্রার্থী, দয়া করে দোয়া করুন, যেন আল্লাহ পাক এ মহান গ্রন্থকে কবুল করেন, এ তফসীর গ্রন্থ সম্পূর্ণ করার তওফিক দান করেন এবং আখেরাতে এই গুনাহগারকে মাগফেরাত দান করেন। আমীন।

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله

واصحابه اجمعين

বিনীত
মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম
২০/০৩/১৯৯৬ ইং

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক
https://t.me/islaMic_fdf

সূচীপত্র

চব্বিশতম খন্ড

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা	৩
ঈমান ও নেক আমলের শুভ-পরিণতি	৩
শানে নযুল	৬
কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী	১০
পবিত্র কোরআন নাযিল করার উদ্দেশ্য	১৩
হেদায়েত গ্রহণে বাধ্য করা নবীর দায়িত্ব নয়	১৫
কাফেরদের নির্বুদ্ধিতা	২২
শানে নুযুল	৩৪
তওবার আহবান	৩৬
আয়াতের মর্মকথা	৩৭
আল্লাহ্ পাকের দয়া মায়ার একটি দৃষ্টান্ত	৩৯
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অভিমত	৪০
আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশা অত্যন্ত বড় গুনাহ	৪১
পবিত্র কোরআনের একটি বৈশিষ্ট্য	৪৭
শানে নুযুল	৫৩
প্রকৃত বন্দার কর্তব্য	৫৫
শানে নুযুল	৫৬
আয়াতের মর্মকথা	৫৬
আল্লাহ্ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম	৫৬
যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে	৫৯
কাফেরদের ভয়াবহ পরিণতি	৬৬
সূরা মোমেন প্রসঙ্গে	৭৫
নামকরণ	৭৬
এ সূরার ফজিলত	৭৬
পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার প্রতিক্রিয়া	৭৯
প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা	৮৩
মোমেনদের জন্যে আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণের দোয়া	৮৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণের অবস্থা	৮৬
জান্নাতীগণের আপনজনদেরকে একত্রিত করা হবে	৯০
আয়াতের মর্মকথা	৯৪
চির সাফল্য লাভের পথ	৯৯
'মোলাকাতের দিনে'র তাৎপর্য	১০০
কর্মফল ভোগ করতে হবে প্রত্যেককে	১০৪
কারো প্রতি জুলুম করোনা	১০৫
কেয়ামত অতি নিকটবর্তী	১০৬
কোন কিছুই আল্লাহ্ পাকের অজানা নয়	১০৬
কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী	১১০
প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা	১১২
কাফেরদের চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েই থাকে	১১৩
শান্তি লাভের পন্থা	১১৭
আয়াতের মর্মকথা	১২০
আত্ম বিস্মৃতিই ধ্বংসের কারণ হয়	১৩৪
সওয়াবের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সম মর্যাদা	১৩৭
দোয়া কবুল হওয়ার জন্যে ঈমান পূর্বশত	১৪৯
নবী রসূলগণকে সাহায্য করার তাৎপর্য	১৫০
ইসলামের বিজয় যুগে যুগে	১৫২
শানে নযুল	১৫৯
দজ্জাল প্রসঙ্গঃ	১৬০
দোয়া এবং এবাদতের তাৎপর্য	১৬৭
দোয়ার ফজিলত ও মাহাত্ম	১৬৮
দোয়া কবুল করার প্রতিশ্রুতি	১৬৯
যাদের দোয়া অবশ্যই কবুল হয়	১৭০
দোয়া কবুল হওয়ার শর্ত সমূহ	১৭১
দোয়ার আদব	১৭২
অহংকারের ভয়াবহ পরিণতি	১৭৫
রাত ও দিনের সৃষ্টি আল্লাহ্ পাকের বিশেষ দান	১৭৬
মানুষের কর্তব্য	১৭৭
শানে নুযুল	১৮৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
মানব জীবনের ক্রমবিকাশ	১৮৫
মানুষের একান্ত কর্তব্য	১৮৭
কাফেরদের বিভিন্ন প্রকার শাস্তি	১৯১
ইসলামের উদার নীতি	১৯৬
মোজেযা প্রসঙ্গে	১৯৬
ইতিহাস থেকে শিক্ষা	২০১
আত্ম সংশোধনের পথ নির্দেশ	২০২
সূরা হা-মীম আস্ সজদা প্রসঙ্গে	২০৭
নামকরণ	২০৭
এ সূরার ফজিলত	২০৭
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক	২০৭
প্রিয়নবী (দঃ)-এর খেদমতে কোরায়েশ প্রতিনিধি	২০৭
নেককারদের জন্যে পুরস্কারের ঘোষণা	২১৮
প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা	২২৯
আদ জাতির শাস্তি	২৩২
ঈমান ও সৎ কাজই নাজাতের কারণ হয়	২৩৪
কেয়ামতের দিন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাক্ষ্য দেবে	২৩৭
শানে নযুল	২৩৮
অসৎ সংসর্গ বিষতুল্য	২৪১
কাফেরদের অপচেষ্টা ব্যর্থ	২৪৩
পবিত্র কোরআন সম্পর্কে কর্তব্য	২৪৪
ফেরেশতাগণ কখন অবতরণ করবে	২৪৯
জান্নাতবাসীদের আপ্যায়ন	২৫২
আযানের ফজিলত ও মাহাত্ম	২৫৫
আয়াতের মর্মকথা	২৫৯
বর্তমান যুগের কর্তব্য	২৫৯
আত্মসংযম ও সবর অবলম্বন	২৬৩
প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-কে সান্ত্বনা	২৭২
শানে নুযুল	২৭৩

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ

হযরত মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (রঃ)-এর

অন্যান্য বই

১। পবিত্র কোরআনের মর্মকথা
২। বিশ্ব-সভ্যতায় পবিত্র কোরআনের অবদান
৩। পবিত্র কোরআনের দর্পণে মানব-জীবন
৪। হযরত গওসুল আযমের (রঃ) অমরবাণী
৫। ইসলামী আদর্শ ও বাস্তবায়ন
৬। দালায়েলুল খায়রাত (বাংলা)
৭। দরূদ শরীফের ফজিলত ও মাহাত্ম
৮। সাহাবা-চরিত
৯। হাজীদের সাথী
১০। বিশ্ব-সভ্যতায় মহানবীর (সঃ) অবদান
১১। এনায়েতুল কোরআন
১২। যুগ-সমস্যার সমাধানে পবিত্র কোরআন
১৩। মানব-মর্যাদায় মহানবী (সঃ)
১৪। ইসলামী মাহফিলের তাৎপর্য
১৫। তারীখে ইসলাম (উর্দু)
১৬। শরহে বয়যাবী
১৭। ইসলামী অর্থনীতির রূপ-রেখা
১৮। মুসলমানের কর্তব্য
১৯। দুই ঈদ
২০। পবিত্র কোরআনের অনুবাদ (প্রথম খণ্ড)
২১। ইমাম মাহদীর (আঃ) আগমনের পূর্বে ও পরে
২২। তফসীরে নূরুল কোরআন (৩০ খণ্ডে সমাপ্ত)
২৩। নূরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম

প্রাপ্তিস্থান ঃ

আল-বালাগ কার্যালয়
১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড
মোহাম্মদপুর, ব্লক-এ, ঢাকা-১২০৭

এমদাদিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার, ঢাকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

তফসীরে নূরুল কোরআন

চব্বিশতম খণ্ড চব্বিশ পারা

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ
اِذْ جَآءَهٗ ؕ اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٢﴾ وَالَّذِىْ جَآءَ
بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿٣٣﴾ لَهُمْ مَّا
يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣٤﴾ لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ
عَنْهُمْ اَسْوَاَ الَّذِىْ عَمِلُوْا وَيَجْزِيَهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ
الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٣٥﴾ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ ؕ وَيُخَوِّفُوْنَكَ
بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٣٦﴾
وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّضِلٍّ ؕ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيْزٍ
ذِى انْتِقَامٍ ﴿٣٧﴾

তরজমা

(৩২) অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং তাঁর নিকট থেকে সত্য আসার পর তা সে প্রত্যাখ্যান করে, তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে? কাফেরদের আবাসস্থল কি দোযখ নয়?

(৩৩) আর যে ব্যক্তি সত্য নিয়ে এসেছে এবং যারা সত্যকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে, তারাই প্রকৃত মোত্তাকী।

(৩৪) তাদের কাঙ্ক্ষিত সব কিছুই রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট, এটিই নেককারদের পুরস্কার।

(৩৫) কেননা, তারা যে সব মন্দ কাজ করেছিল, আল্লাহ্ পাক তা ক্ষমা করে দেবেন এবং তাদের নেক আমলের জন্যে তাদেরকে সওয়াব দান করবেন।

(৩৬) আল্লাহ্ পাক কি তাঁর বন্দার (হেফাজতের) জন্যে যথেষ্ট নন? আর (হে রসূল!) তারা আপনাকে আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্যদের (দেব-দেবীদের) ভয় দেখায়। মূলতঃ আল্লাহ্ পাক যাকে পথভ্রষ্ট করেন, (হেদায়েতের তৌফিক না দেন) তার জন্যে কোন পথ-প্রদর্শক নেই।

(৩৭) এবং আল্লাহ্ পাক যাকে হেদায়েত করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারেনা। আল্লাহ্ পাক কি সর্বশক্তিমান, প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন?

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে মোমেন ও কাফের, তৌহীদ পন্থী ও মুশরেকের মধ্যেকার পার্থক্য একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে আর একথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, শেরকের অমার্জনীয় পরিণতি অশান্তি-অকল্যাণ এক কথায় সর্বনাশ ব্যতীত আর কিছুই নয়। মানব জীবনে শান্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে হলে, জীবনকে সার্থক করতে হলে অবশ্যই মানুষকে আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদে পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। এ সত্য উদ্ভাসিত হবার পরও যারা আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাসী হয়না; বরং আল্লাহ্ পাকের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, যেমন ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্ পাকের কন্যা বলে অপবাদ দেয়, (নাউজুবিল্লাহ্ মিন জালিক) এমনিভাবে তাদের হাতে বানানো মূর্তিগুলোকে আল্লাহ্ পাকের সাথে শরীক করে তাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ

'সে ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম কে হবে? যে আল্লাহ্ পাকের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে'।

অর্থাৎ এ ব্যক্তি সবচেয়ে বড় জালেম, অতএব কেয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশী শাস্তি তারই হবে।

وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَآءَهٗ ط

'এবং তার নিকট সত্য আসার পর সে তা প্রত্যাখ্যান করে'।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের মহান বাণী পবিত্র কোরআন নাযিল হয়েছে। এটি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য, কিন্তু এ হতভাগা কাফের মুশরেকরা এ সত্যকেও প্রত্যাখ্যান করেছে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকেও তারা মিথ্যাজ্ঞান করেছে। এর চেয়ে বড় কোন অপরাধ হতে পারেনা, তাই পৃথিবীতে তাদের চেয়ে বড় জালেম আর কেউ নয়।

اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ

'কাফেরদের আবাসস্থল কি দোযখ নয়'?

অর্থাৎ এমন কাফেরদের স্থায়ী ঠিকানা অবশ্যই দোযখে হবে, আর তা তাদের অন্যায় অনাচারের কারণেই হবে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা

এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে বিশেষ সান্ত্বনা রয়েছে এ মর্মে যে, (হে রসূল!) কাফেররা যদিও আপনাকে মিথ্যাজ্ঞান করে এবং পদে পদে আপনাকে কষ্ট দেয়ার অপচেষ্টা করে, আপনি এজন্যে দুঃখিত হবেন না এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও চিন্তা করবেন না, কেননা তাদের শাস্তির জন্যে দোযখই যথেষ্ট। আল্লাহ পাক তাদেরকে দোযখের স্থায়ী অধিবাসী করে দিয়েছেন, তারা কখনো দোযখের কঠিন শাস্তি থেকে নিস্তার পাবেনা।

وَالَّذِىْ جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ

'আর যে ব্যক্তি সত্য নিয়ে এসেছে এবং যারা সত্যকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে তারাই প্রকৃত মোত্তাকী-পরহেযগার'।

ঈমান ও নেক আমলের শুভ-পরিণতি

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের অন্যায়-অনাচার ও তাদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসারী মোমেনগণের ঈমান ও নেক আমলের শুভ-পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর উম্মত ও পূর্বকালের সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং তাঁদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের শুভ-পরিণতি ঘোষণা করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট এ সত্য নিয়ে এসেছেন, পৃথিবীতে যারা তাঁর অনুসরণ করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে, তাদের সম্পর্কেই সুসংবাদ হলোঃ

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

'তারাই মোত্তাকী-পরহেযগার'।

সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, পবিত্র কোরআন নিয়ে এসেছেন জীব্রাঈল (আঃ), আর তার সত্যায়নকারী হলেন স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। অতএব, আয়াতের অর্থ হবে, জীব্রাঈল (আঃ) যে সত্য নিয়ে এসেছেন তা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম কবুল করেছেন।

কালবী এবং আবুল আলীয়া (রঃ) বলেছেন, পবিত্র কোরআন আনয়নকারী হলেন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং সর্বপ্রথম তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী হলেন হযরত আবুবকর (রাঃ)।

জুযাজ (রঃ) বলেছেন, পবিত্র কোরআন আনয়নকারী হলেন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, আর তাঁর প্রতি প্রথম ঈমান আনয়নকারী হলেন হযরত আলী (রাঃ)।

কাতাদা (রঃ) এবং মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, সত্যকে নিয়ে এসেছেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, আর তাঁর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেছেন মোমেনগণ।

আতা (রঃ) বলেছেন, সত্যকে আনয়নকারী ছিলেন সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম, আর যুগে যুগে যারা তাঁদের অনুসরণ করেছেন তাদের সবার উদ্দেশ্যেই রয়েছে আলোচ্য আয়াতের সুসংবাদ যে, তারা হলেন প্রকৃত মোত্তাকী-পরহেযগার।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ), কাতাদা (রঃ) হযরত রবী এবনে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সত্য আনয়নকারী হলেন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, আর তাঁর প্রতি বিশ্বাস

১। তফসীরে তাবারী খন্ড-২৪, পৃষ্ঠা-৩
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-১৭২-৭৩
তফসীরে রুহুল মআনী খন্ড-২৪, পৃষ্ঠা-৩

স্থাপনকারী হলেন সে সব লোক যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনে। যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছেন, তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম স্থান হলো হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর।[১]

لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط ذٰلِكَ جَزٰؤُا الْمُحْسِنِيْنَ

'তাদের কাঙ্ক্ষিত সব কিছুই রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট, এটিই নেককারদের পুরস্কার।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, ঈমানদার ও নেককার লোকদের জন্যে বিশেষ কোন পুরস্কারের কথা না বলে জান্নাতবাসীগণের আনন্দ বৃদ্ধির নিমিত্তে ঘোষণা করা হয়েছে যে, জান্নাতবাসীগণ যখন যা কিছুর আকাঙ্ক্ষা করবেন অনতিবিলম্বে তারা তা পাবেন। হাদীস শরীফে এ বিবরণ স্থান পেয়েছে যে, জান্নাতবাসীগণ যখন কোন কিছু খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবেন তখন দেখবেন যে ঐ বস্তুটি তিনি খাচ্ছেন। এমনিভাবে, যখন কিছু পরিধান করার ইচ্ছা করবেন তখন দেখবেন যে, তাঁর কাঙ্ক্ষিত পোষাক তিনি পরে আছেন। এটিই হলো নেককার মোমেনদের জন্যে আল্লাহ পাকের পুরস্কার।

বস্তুতঃ আল্লাহ পাক তাঁর নেককার বন্দাদেরকে উত্তম এবং উৎকৃষ্টতম পুরস্কার দান করবেন। শুধু তাই নয়; বরং তাদের জীবনের যাবতীয় গুনাহ এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে তাদেরকে নিঃস্কলংক করে তুলবেন। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَسْوَاَ الَّذِىْ عَمِلُوْا وَيَجْزِيَهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

'তারা যে সব মন্দ কাজ করেছিল, আল্লাহ পাক তা ক্ষমা করে দেবেন এবং তাদের নেক আমলের জন্যে তাদেরকে সওয়াব দান করবেন'।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাক দয়া করে মোমেন বন্দার কবীরা গুনাহ মাফ করে দেবেন, কেননা আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

اَسْوَاَ الَّذِىْ عَمِلُوْا

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা–২৪ পৃষ্ঠা-৩
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৬ পৃষ্ঠা-৮০

অর্থাৎ তারা যে মন্দ কাজ করেছে তন্মধ্যে সবচেয়ে বেশী মন্দ যা, আল্লাহ পাক সে গুনাহও মাফ করবেন। যখন কবীরা গুনাহ মাফ করা হবে তখন স্বাভাবিক ভাবে সগীরা গুনাহও আল্লাহ পাক ক্ষমা করে দেবেন। আর তাদের নেক আমলের জন্যে উত্তম বিনিময় তথা সওয়াব দান করবেন।

মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, একথার তাৎপর্য হলো, আল্লাহ পাক তাদের নেক আমল সমূহের অশেষ সওয়াব দান করবেন, তবে বদ আমলের কোন শাস্তি দেবেন না; বরং সেগুলো ক্ষমা করবেন। এটি দয়াময় আল্লাহ পাকের দয়া ব্যতীত আর কিছুই নয়।[১]

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ ط

'আল্লাহ পাক কি তাঁর বন্দার (হেফাজতের) জন্যে যথেষ্ট নন'?

আল্লাহ পাক কি তাঁর প্রিয় বন্দা তথা তাঁর প্রিয় রসূল হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হেফাজতের জন্যে যথেষ্ট নন? অর্থাৎ অবশ্যই যথেষ্ট।

শানে নযুল

প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কাফেরদের শেরক ও কুফরীর প্রতিবাদ করে তাদেরকে তৌহীদে বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানাতেন, তখন তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতো, আপনি যে আমাদের দেব-দেবীর বিরুদ্ধে কথা বলেন তা কিন্তু আপনার জন্যে ক্ষতিকর হতে পারে, আমাদের দেব-দেবীরা আপনার ক্ষতি করতে পারে, এমনকি আপনার মস্তিস্ক বিকৃতিও ঘটাতে পারে, যেমন পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَيُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ط وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ

'আর (হে রসূল!) তারা আপনাকে আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্যদের (দেব-দেবীদের) ভয় দেয়ায়। মূলতঃ আল্লাহ পাক যাকে পথভ্রষ্ট করেন (হেদায়েতের তৌফিক না দেন) তবে তার জন্যে কোন পথ-প্রদর্শক নেই।

কাফেরদের এসব ভিত্তিহীন উক্তির প্রতি-উত্তরেই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ

'আল্লাহ পাক কি তাঁর বন্দার (হেফাজতের) জন্যে যথেষ্ট নন'?[২]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-১৭৪
২। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৪, পৃষ্ঠা-৫

বস্তুতঃ যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের প্রতি ভরষা রাখে, তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করে, আল্লাহ পাক সে ব্যক্তির হেফাজত করেন, তাই অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

'(হে রসূল!) আপনি বলুন, আল্লাহ পাকই আমার জন্যে যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তিনিই একমাত্র মা'বুদ, আমি তাঁর প্রতিই ভরসা করেছি, তিনি মহান আরশের অধিপতি'।

আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেনঃ হে নবী! এ কাফেররা আপনাকে আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কিছুর ভয় দেখায়, এটি তাদের মূর্খতা এবং পথভ্রষ্টতা। মূলতঃ যাকে আল্লাহ পাক হেদায়েতের তৌফিক না দেন তাকে কেউ হেদায়েত করতে পারেনা, আর আল্লাহ পাক যাকে হেদায়েত করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারেনা।

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيْزٍ ذِى انْتِقَامٍ

'আল্লাহ পাক কি সর্বশক্তিমান, প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন'?

এখানে কয়েকটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। হেদায়েতের পথে পরিচালনা করা না করা সম্পূর্ণ আল্লাহ পাকের হাতে, তিনি যাকে হেদায়েত করেন তাকে পথভ্রষ্ট করার শক্তি কারোই নেই, কিন্তু যাকে তার অন্যায় অনাচারের কারণে পথভ্রষ্ট অবস্থায় থাকতে দেন তাকে কেউ হেদায়েত করতে পারেনা। এ সত্য সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। এরপরও যদি কেউ আল্লাহ পাকের প্রিয় বন্দার সাথে অন্যায় আচরণ করে তবে আল্লাহ পাক অবশ্যই তাকে সমুচিত শাস্তি দেবেন, কেননা তিনি পরাক্রমশালী, তিনি সর্বশক্তিমান, তাঁর নেককার বন্দাদেরকে তিনি রহমত দ্বারা পুরস্কৃত করেন। আর তিনি প্রতিশোধ গ্রহণকারী, তাই তাঁর দুশমনদেরকে তিনি শাস্তি দিয়ে থাকেন।

আলোচ্য আয়াতের তফসীরে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তাতে এরশাদ হয়েছে, তুমি আল্লাহকে স্মরণ কর, তিনি তোমার হেফাজত করবেন, তুমি যদি আল্লাহকে স্মরণে রাখ তবে সর্বদা তাকে তুমি নিকটে পাবে, আরামের সময় তুমি আল্লাহ পাকের নেয়ামত সমূহের শোকর আদায় কর, তাহলে বিপদের সময় তিনি তোমার উপকার করবেন, আর যদি কিছু চাওয়ার থাকে তবে শুধু আল্লাহ পাকের নিকট চাও, যদি কোন ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা করতে হয় তবে শুধু আল্লাহ পাকের নিকটই তা কর। বিশ্বাস রাখ, যদি সারা পৃথিবীর মানুষ

একত্রিত হয়ে তোমার ক্ষতি সাধন করতে চায় যা আল্লাহ পাকের মর্জি নয়, তবে তারা তোমার সামান্যতম ক্ষতিও করতে পারবে না। আর যদি সারা পৃথিবীর মানুষ একত্রিত হয়ে তোমার কল্যাণ করতে চায়, আর তোমার তকদীরে তা আল্লাহ পাক লিপিবদ্ধ করেননি, তবে কখনও তারা তোমার কল্যাণ সাধন করতে পারবেনা। কিতাব বন্ধ হয়েছে, কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ একীন রেখে কৃতজ্ঞাবনত হয়ে নেক আমলে মশগুল থাক। কষ্টের সময় সবর করলে নেকী পাওয়া যায়, সবরের পাশাপাশি সাহায্য আসে, দুঃখের পরেই আসে সুখ। (এবনে আবি হাতেম)

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ ۚ قُلْ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ
مِن دُونِ اللّٰهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ
ضُرِّهِۦٓ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهِۦ ۚ قُلْ
حَسْبِيَ اللّٰهُ ۖ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾ قُلْ يٰقَوْمِ
اعْمَلُوا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾
مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٤٠﴾

তরজমা

(৩৮) আর (হে রসূল!) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, আসমান জমীন কে সৃষ্টি করেছে? তবে তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ, (হে রসূল!) তাহলে আপনি বলুন, তোমরাই বলো আল্লাহ পাকের পরিবর্তে তোমরা যাদের ডাক, যদি আল্লাহ পাক আমাকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা করেন, তবে কি তারা তাঁর দেয়া কষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি যদি আমার প্রতি দয়া করতে করতে চান, তবে তারা কি সে দয়া প্রতিরোধ করতে পারবে? (হে রসূল!) আপনি বলুন, আমার জন্যে আল্লাহ পাকই যথেষ্ট, তাঁর উপরই তো ভরসাকারীরা ভরসা করে থাকে।

(৩৯) (হে রসূল!) আপনার জাতিকে সম্বোধন করে এভাবে) ঘোষণা করুন, হে আমার জাতি! তোমরা তোমাদের অবস্থানে কাজ করে যাও, নিশ্চয় আমিও কাজ করছি। অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের কাজের পরিণতি সম্পর্কে তোমরা জানতে পারবে।

(৪০) কার উপর এমন আযাব আসে যা তাকে অপমানিত, লাঞ্ছিত করে দেয় এবং কার উপর চিরস্থায়ী আযাব আপতিত হয়।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে এরশাদ হয়েছে যে, অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ লোকদের জন্যে আল্লাহ পাকের শাস্তি-ই যথেষ্ট। তারা আল্লাহ পাকের আযাব থেকে কোনভাবেই রক্ষা পাবেনা, কেননা আল্লাহ পাক পরাক্রমশালী, তিনি জালেমদের থেকে প্রতিশোধ নিয়ে থাকেন।

আর এ আয়াতে আল্লাহ পাক তাঁর এমন শক্তি এবং ক্ষমতার কথা উল্লেখ করেছেন যা এ কাফেররাও স্বীকার করে, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ط

(হে রসূল!) যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, এ নীলাভ আকাশ এবং এ বিশাল বিস্তৃত পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে? তারা স্বীকার করবে, নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা ও পালনকর্তা একমাত্র আল্লাহ পাকই, এতে কারোই কোন সন্দেহ নেই।

وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

অর্থাৎ (হে রসূল!) যদি আপনি মক্কাবাসীকে একথা জিজ্ঞাসা করেন যে, আসমান জমীন কে সৃষ্টি করেছে? তখন তারা বলবে যে, আল্লাহ পাকই সৃষ্টি করেছেন। তারা অপকটে এ সত্য স্বীকার করবে যে, নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা ও পালনকর্তা একমাত্র আল্লাহ পাকই। তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতকে অস্বীকার করলেও আল্লাহ পাকের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করতো না, কেননা তারা জানত যে, তাদের হাতে বানানো মূর্তিগুলো কোন কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেনা, এগুলো প্রাণহীন জড়বস্তু, নিজস্ব কোন ক্ষমতাই এগুলোর নেই। আর এ কারণেই মক্কার কাফেররা এ সত্য স্বীকার করতো যে, আল্লাহ পাকই একমাত্র স্রষ্টা ও পালনকর্তা।

قُلْ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِىَ اللّٰهُ بِضُرٍّ

(হে রসূল!) আপনি তাদেরকে (আরো) জিজ্ঞাসা করুন যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ডাক, যদি আল্লাহ পাক আমাকে কোন প্রকার কষ্ট দিতে চান, তবে তোমাদের ঠাকুর দেবতারা আমার সে কষ্ট দূর করতে পারবে কি? অথবা আল্লাহ পাক যদি আমার প্রতি রহমত নাযিল করতে ইচ্ছা করেন, তবে কি তোমাদের হাতে বানানো ঐ ঠাকুর দেবতারা আল্লাহ পাকের রহমতকে বাধা দিতে পারবে? তা তো কখনো হবার নয়, কেননা তারা সম্পূর্ণ অসহায়। অতএব, তোমরা কোন্ যুক্তিতে প্রিয়নবীকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তোমাদের ঠাকুর-দেবতাদের ভয় দেখাও?

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, এ আয়াত নাযিল হবার পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এ প্রশ্ন করেছিলেন, কিন্তু তারা কোন জবাব দিতে সক্ষম হয়নি, তখন পরবর্তী আয়াত নাযিল হয়ঃ

قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ط عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ

'(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, আল্লাহ পাকই আমার (হেফাজতের) জন্যে যথেষ্ট'। তোমাদের এ ভয় প্রদর্শনের কারণে আমার কিছু যায় আসেনা, আর ভরসাকারীগণ শুধু আল্লাহ পাকের প্রতিই ভরসা করে, কেননা সুখ-দাতা শুধু তিনিই, আর দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূতকারীও তিনিই। তাই মোমেনগণ শুধু আল্লাহ পাকের প্রতিই ভরসা করে। তারা একথা নিশ্চিতভাবে অবগত যে, আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ কোন ক্ষতি কিংবা কোন উপকার করতে পারেনা। তাই আমি সেই মহান আল্লাহ পাকের প্রতিই ভরসা করি।

বস্তুতঃ যাদের বিবেক-বুদ্ধি আছে, যারা পরিণাম্দর্শী, তারা অবশ্যই আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা করে, আর এটিই মোমেনদের ঈমানী দাবী।

قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّيْ عَامِلٌ ج

কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী

'(হে রসূল!) আপনার জাতিকে সম্বোধন করে এভাবে) ঘোষণা করুন, হে আমার জাতি! তোমরা যখন আমাকে মিথ্যা জ্ঞান করছো তখন তোমরা তোমাদের অবস্থানে কাজ করে যাও, (তোমাদের নিজেদের অবস্থা মোতাবেক তোমরা কাজ করে যাও) নিশ্চয় আমিও কাজ করছি, তবে অদূর ভবিষ্যতে তোমরা জানতে পারবে তোমাদের কর্মের পরিণতি, তোমরা জানতে পারবে সে ব্যক্তি কে? যার উপর

দুনিয়াতে এমন আযাব আসে যা তাকে অপমানিত, লাঞ্ছিত করবে, আর মৃত্যুর পর যার উপর স্থায়ী আযাব আপতিত হবে, যা থেকে সে কখনো রেহাই পাবেনা।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত দ্বারা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যে অবস্থা ছিল, তার আশু পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। যত সময় অতিবাহিত হবে, ততই আল্লাহ পাকের তরফ থেকে সাহায্য আসবে এবং ইসলাম শক্তিশালী হবে। এতে কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে এ মর্মে যে, অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের প্রতি এমন শাস্তি আপতিত হবে, যা তোমাদের অপমানের কারণ হবে। যেমন হিজরতের এক বছর পরই বদরের যুদ্ধে আল্লাহ পাক মুসলমানগণকে বিজয়ী করেছেন এবং কাফেরদের ৭০ জন নিহত ও সমসংখ্যক বন্দী হয়েছে, শুধু তাই নয়; বরং আখেরাতেও তাদের জন্যে স্থায়ী ও কঠিন শাস্তি রয়েছে।

এ আয়াতে কাফেরদেরকে দু' ধরণের শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। এক প্রকার দুনিয়ার শাস্তি যা তাদের অপমানের কারণ হবে, আর দ্বিতীয় প্রকার আখেরাতের শাস্তি যা চিরকাল তাদেরকে ভোগ করতে হবে।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, এর অর্থ হলো তোমরা মনে কর তোমরা অত্যন্ত শক্তিশালী, তোমরা জনবল, ধনবলে বলীয়ান, আর এজন্যে তোমরা ইসলামের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে চলেছ, তোমরা তোমাদের এ অবস্থায় থাক এবং তোমাদের যেমন খুশী অপকর্ম অব্যাহত রাখ।

فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ

অচিরেই তোমরা জানতে পারবে, শাস্তি এবং অপমান কিভাবে তোমাদের উপর আপতিত হয়।[২]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-১৭৬
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৬ পৃষ্ঠা-৮৩
২। তফসীরে কবীর খন্ড-২৬, পৃষ্ঠা-২৮৩

إِنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ ۖ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ
فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم
بِوَكِيلٍ ﴿٤١﴾ ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِى لَمْ
تَمُتْ فِى مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ ٱلَّتِى قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَ
يُرْسِلُ ٱلْأُخْرَىٰٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾ أَمِ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءَ ۚ قُلْ
أَوَلَوْ كَانُوا۟ لَا يَمْلِكُونَ شَيْـًٔا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٣﴾ قُل لِّلَّهِ
ٱلشَّفَٰعَةُ جَمِيعًا ۖ لَّهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ
تُرْجَعُونَ ﴿٤٤﴾

তরজমা

(৪১) (হে রসূল!) আমি আপনার প্রতি মানুষের উপকারার্থে এই কিতাব নাযিল করেছি, যা সত্যের বাহক, অতএব যে কেউ হেদায়েত গ্রহণ করবে সে তা তার কল্যাণেই করবে আর যে পথভ্রষ্ট হয়, সে পথভ্রষ্টতার পরিণতি তাকেই ভোগ করতে হবে। (হে রসূল!) আপনি তাদের তত্ত্বাবধায়ক নন।

(৪২) আল্লাহ পাকই মানুষের মৃত্যুর সময় তাদের প্রাণ হরণ করেন এবং যাদের মৃত্যুর সময় আসেনি তাদের প্রাণও (হরণ করেন) নিদ্রার সময়। এরপর যার জন্যে মৃত্যুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তার প্রাণ তিনি রেখে দেন আর অন্যদের প্রাণ এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে সরিয়ে দেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে নিশ্চয় এতে নিদর্শন সমূহ রয়েছে।

(৪৩) তারা কি আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্যকে সুপারিশকারী ধরেছে? (হে রসূল!) আপনি জিজ্ঞাসা করুন, যদি তারা কোন প্রকার ক্ষমতা না রাখে বা কিছুই বুঝতে না পারে তবুও?

(৪৪) (হে রসূল!) আপনি বলুন, সকল সুপারিশ একমাত্র আল্লাহ পাকেরই এখতিয়ারে, আসমান জমিনের রাজত্ব একমাত্র তাঁরই, এরপর তোমাদেরকে তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

তফসীরুল কোরআন

মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা এবং পবিত্র কোরআনকে অবিশ্বাস করাই তাদের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিল। কোন অবস্থাতেই ইসলাম গ্রহণের জন্যে তারা প্রস্তুত ছিল না। এজন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত ব্যথিত এবং মর্মাহত হতেন। অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এ মর্মবেদনার কথা এভাবে এরশাদ করেছেনঃ

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ

'তারা ঈমান আনে না দেখে আপনি কি নিজেকে ধবংস করে দেবেন'?

এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ج فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهٖ ج وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ج

(হে রসূল!) নিশ্চয় আমি আপনার নিকট এই কিতাব পবিত্র কোরআন মানুষের উপকারার্থেই নাযিল করেছি, আর এই কিতাব হল সত্যের বাহক, এই কিতাবে সত্যকেই সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। জীবন-সাধনাকে সার্থক ও সুন্দর করে তোলার উদ্দেশ্যে যে এই কিতাব পাঠ করবে এবং এর হেদায়েত গ্রহণ করবে, সে তার নিজেরই উপকার করবে। পক্ষান্তরে, যে এই কিতাব দ্বারা হেদায়েত গ্রহণ করবে না সে নিজেই তার সর্বনাশ ডেকে আনবে।

পবিত্র কোরআন নাযিল করার উদ্দেশ্য

স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাক মানুষকে দেহ এবং রুহের সমন্বয়ে জীবন্তরূপে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। পৃথিবীতে মানুষের জীবন-যাপনের জন্যে তিনি বিধি-নিষেধ বা পথ-নির্দেশনা প্রেরণ করেছেন। আর তাই হলো পবিত্র কোরআন, কোন্ কাজে মানুষের উপকার হয়, আর কোন্ কাজটি মানুষের জন্যে ক্ষতিকর হয় তার বিস্তারিত বিবরণ স্থান পেয়েছে পবিত্র কোরআনে। এমনিভাবে কোন্ কাজটি

আল্লাহ পাকের পছন্দনীয়, আর কোন্ কাজটি অপছন্দনীয় তারও বিবরণ রয়েছে এ মহান গ্রন্থে। দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে মানুষকে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, সেগুলোর সন্তোষজনক সমাধানও রয়েছে পবিত্র কোরআনে। মানুষের পরস্পরের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নীতিমালাও বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে এ মহান গ্রন্থে। আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার পন্থাও এতে নির্দেশ করা হয়েছে। পিতা-মাতার হক্ব, স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের হক্ব, সন্তান-সন্ততির হক্ব, পাড়া-প্রতিবেশীর হক্ব সম্পর্কে বিশ্বগ্রন্থ পবিত্র কোরআনে বিশেষ তাগিদ রয়েছে। এ জীবনে মানুষকে দু'টি দায়িত্ব পালন করতে হয়। স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের প্রতি দায়িত্ব ও তাঁর সৃষ্টির প্রতি দায়িত্ব, যাকে শরীয়তের পরিভাষায় 'হক্কুল্লাহ' এবং 'হক্কুল এবাদ' বলা হয়। এ দু'টি দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্যে বিশেষ তাগিদ রয়েছে পবিত্র কোরআনে। মানুষের এ জীবনই শেষ কথা নয়; বরং এরপর আসবে আরেকটি জীবন, এ জীবন যদি আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় হয় তবে আখেরাতের জীবন হবে চিরসুখ এবং চির শান্তির। এ জীবন ও পরজীবন সম্পর্কে বিস্তারিত হেদায়েত রয়েছে পবিত্র কোরআনে, এর পাশাপাশি চিরশান্তির কেন্দ্র জান্নাতের বিরবণ যেমন রয়েছে, চির দুঃখের স্থল দোযখের শাস্তির বিবরণও তেমনি স্থান পেয়েছে পবিত্র কোরআনে। মানুষের জীবন ও মৃত্যু খুব কাছাকাছি, পাশাপাশি। পৃথিবীতে আগমণের মাধ্যমে সে জীবন লাভ করে, আর পৃথিবী থেকে গমন করে মৃত্যুর মাধ্যমে। পবিত্র কোরআনে পৃথিবীতে জীবনের পথ ও পন্থা যেমন বর্ণিত হয়েছে, ঠিক তেমনি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে করণীয় ওসিয়তের কথাও বর্ণিত হয়েছে এবং মৃত্যুর পর কার কি পরিণতি হবে তারও বর্ণনা রয়েছে, এক কথায় মানব জীবনের জন্যে সম্পূর্ণ এবং পরিপূর্ণ হেদায়েত নামা হিসেবে নাযিল হয়েছে পবিত্র কোরআন। তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ.....

(হে রসূল!) নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি মানুষের উপকারার্থে এ কিতাব নাযিল করেছি যা সত্যের বাহক, অতএব, যে কেউ এর হেদায়েত গ্রহণ করবে সে তার কল্যাণার্থেই করবে, পক্ষান্তরে যে পথভ্রষ্ট হবে তথা পবিত্র কোরআনকে অস্বীকার করবে, অথবা অমান্য করবে তার শোচনীয় পরিণতি তাকেই ভোগ করতে হবে।)

আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং এভাবে এরশাদ হয়েছে, '(হে রসূল!) আমি আপনার নিকট কোরআন নাযিল করেছি', এর দ্বারা দু'টি কথা প্রমাণিত হয়। (এক) পবিত্র কোরআন আল্লাহ পাকের তরফ থেকেই অবতীর্ণ হয়েছে। এটি তাঁরই মহান বাণী, এতে রসূলেরও

কোন অংশ নেই, এর সব কিছুই এক আল্লাহ পাকের। সমগ্র মানব জাতির উপকারার্থেই এর অবতারণা। বিশ্ব মানবের কল্যাণ সাধনই পবিত্র কোরআন নাযিলের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। (দুই) মানব জাতির দেহ-যন্ত্রের পরিচালনার জন্যে হেদায়েত নামা হলো পবিত্র কোরআন, আর আল্লাহ পাকের তরফ থেকে পথ-প্রদর্শক হিসেবে আগমন করেছেন প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, অতএব মানব জাতির সার্বিক কল্যাণার্থেই পবিত্র কোরআনের বিধান মেনে চলতে হবে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করতে হবে।

وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ

হেদায়েত গ্রহণে বাধ্য করা নবীর দায়িত্ব নয়

(হে রসূল!) আপনি তাদের তত্ত্বাবধায়ক নন, হেদায়েত গ্রহণের জন্যে তাদেরকে বাধ্য করা আপনার দায়িত্ব নয়, আল্লাহ পাকের মহান বাণী, সত্যের পয়গাম তাদের নিকট পৌঁছে দেয়াই আপনার কাজ, সত্যের মশাল জ্বালিয়ে দেয়াই আপনার দায়িত্ব, এ দায়িত্ব আপনি পালন করেছেন, এরপর কে হেদায়েত গ্রহণ করলো আর কে পথভ্রষ্ট রয়ে গেল, এজন্যে আপনি দায়ী নন। এ সম্পর্কে আপনাকে কোন প্রকার জবাবদেহী করতে হবেনা।[১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, (হে রসূল!) কোন মানুষকে ঈমানের জন্যে বাধ্য করা আপনার দায়িত্ব নয়। আপনার দায়িত্ব শুধু মানুষকে সত্য গ্রহণের জন্যে আহবান করা। এ আহবানে সাড়া দেয়া না দেয়া তাদের কাজ, এতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে সান্ত্বনা রয়েছে এ মর্মে যে, কাফেররা কোন অবস্থাতেই ঈমান আনতে প্রস্তুত হচ্ছিল না, যা ছিল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে পীড়াদায়ক, তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, তাদেরকে ঈমান আনয়নে বাধ্য করা আপনার দায়িত্ব নয়।[২]

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِىْ لَمْ تَمُتْ فِىْ مَنَامِهَا ۚ فَيُمْسِكُ الَّتِىْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰٓى اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۭ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-১৭৭
২। তফসীরে কবীর খন্ড-২৬, পৃষ্ঠা-২৮৪

'আল্লাহ পাকই মানুষের মৃত্যুর সময় তাদের প্রাণ হরণ করেন এবং যাদের মৃত্যুর সময় আসেনি তাদের প্রাণও (হরণ করেন) নিদ্রার সময়। এরপর যার জন্যে মৃত্যুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তার প্রাণ তিনি রেখে দেন, আর অন্যদের প্রাণ এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে সরিয়ে দেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে নিশ্চয় এতে নিদর্শন সমূহ রয়েছে'।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আল্লাহ পাক অবিশ্বাসীদের ভ্রান্ত ধারণা নিরসন-কল্পে তাঁর বিস্ময়কর কুদরত হেকমতের উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়াই ছিল উদ্দেশ্য। এর পাশাপাশি একথা ঘোষণা করা হয় যে, কেয়ামতের দিন পাপীষ্ঠ লোকদের পরিণতি তারা দেখতে পাবে। আলোচ্য আয়াতে কেয়ামতের একটি দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে, আর এটি এমন এক দৃশ্য যা প্রতিনিয়ত মানব জীবনে লক্ষ্য করা যায়, আর তা হলো মানুষের নিদ্রা যা মৃত্যু সদৃশ। এরপর জাগ্রত হওয়া হলো মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ করা। এ অবস্থা প্রতিদিনই মানুষের জীবনে আসে অর্থাৎ নিদ্রা ও জাগরণের মধ্য দিয়ে প্রতিনিয়ত মৃত্যু এবং পুনর্জীবন লাভের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِىْ لَمْ تَمُتْ فِىْ مَنَامِهَا

'আল্লাহ পাকই মানুষের মৃত্যুর সময় তাদের প্রাণ হরণ করেন এবং যাদের মৃত্যুর সময় আসেনি তাদের প্রাণও (হরণ করেন) নিদ্রার সময়'।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, মানুষ যখন নিদ্রিত অবস্থায় থাকে তখন আল্লাহ পাক তার রুহ দেহ থেকে নিজের কাছে নিয়ে যান, যখন নিদ্রার অবসান ঘটে তখন দেহে রুহ ফেরত দেন, নিদ্রিত অবস্থায় যার মৃত্যুর সময় হয়ে যায় তার প্রাণ ফেরত দেয়া হয়না।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, মানুষ যখন নিদ্রিত হয় তখন তার রুহ সম্পূর্ণ ভাবে বের হয়ে যায় তবে দেহের সঙ্গে রুহের সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়না; বরং কিছুটা সংযোগ অব্যাহত থাকে, ফলে দেহ এবং জীবন বিনষ্ট হয়না। এর একটি একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। সূর্য ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূর থেকে তার কিরণের সাহায্যে পৃথিবীতে স্বীয় প্রভাব বজায় রাখে। মানবাত্মা তার নিদ্রার সময় দেহ থেকে দূরে থাকা সত্ত্বেও একটা সম্পর্ক বজায় রাখে, কিন্তু মৃত্যু হলে রুহের সাথে দেহের সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

যেহেতু নিদ্রাকালে দেহ ও রুহের মধ্যে এক প্রকার সম্পর্ক বজায় থাকে তাই নিদ্রিত অবস্থায় মানুষ স্বপ্ন দেখে, এরপর যখন সে জাগ্রত হয় তখন সঙ্গে সঙ্গে এক মুহূর্তও বিলম্ব না করে রুহ দেহের মাঝে ফিরে আসে।

সোলায়েম এবনে আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একবার হযরত ওমর (রাঃ) বলেছিলেন, একটা আশ্চর্য ব্যাপার হলো এই, কিছু লোক নিদ্রিত অবস্থায় এমন কিছু দেখে যা সে কখনও কল্পনাও করেনি, যখন সে জাগ্রত হয় তখন ঐ বিষয়টি তার সম্মুখে এসে পড়ে। অর্থাৎ স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয়। অথচ কারো কারো স্বপ্নের কোন গুরুত্বই নেই। হযরত আলী (রাঃ) একথা শ্রবণ করে বললেন, হে আমীরুল মোমেনীন! আমি আপনাকে এর কারণ বলছি। এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করলেনঃ

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا

(আল্লাহ পাক মানুষের মৃত্যুর সময় তাদের প্রাণ হরণ করেন, যখন রুহ সমূহ আসমানে আল্লাহ পাকের নৈকট্যে থাকে) তখন তারা যা দেখে তাই সত্য স্বপ্ন হয়। আর রুহ সমূহকে তাদের দেহের দিকে প্রেরণ করা হয়, তখন পথিমধ্যে শয়তানের মুখোমুখি হয়, শয়তান তাদেরকে কিছু ভিত্তিহীন কথাবার্তা শুনিয়ে দেয় তখন তা মিথ্যা স্বপ্নে পরিণত হয়। হযরত আলী (রাঃ)-এর একথা শ্রবণ করে হযরত ওমর (রাঃ) অত্যন্ত আশ্চর্যন্বিত হন।[১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, মানুষের মধ্যে দু'টি জিনিষ রয়েছে। একটি হলো বিবেক-বুদ্ধি এবং উপলব্ধি-শক্তি, অপরটি হলো রুহ। মানুষ যখন নিদ্রিত হয় তখন তার বিবেক বুদ্ধি এবং উপলব্ধি-শক্তি থাকেনা, কিন্তু রুহ থেকে যায়, যখন মানুষের মৃত্যু হয় তখন রুহ বিদায় নেয়, দেহ তখন নিস্প্রাণ হয়ে পড়ে।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, মানুষের জীবন আল্লাহ পাকের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন, যে কোন সময় মানুষের জীবনে আল্লাহ পাকের হুকুম জারী হয়ে থাকে।

মানুষের মৃত্যু দু' প্রকার। একটি ক্ষুদ্র এবং সাময়িক, আরেকটি বৃহৎ এবং স্থায়ী। ক্ষুদ্র মৃত্যু হলো নিদ্রা, আর বৃহৎ মৃত্যু হলো যখন মানুষের দেহ থেকে তার রুহকে

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-১৭৮
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৪, পৃষ্ঠা-৮
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৬ পৃষ্ঠা-৮৬-৮৭

বিচ্ছিন্ন করা হয় তখন তার জীবনের অবসান ঘটে চিরতরে। নিদ্রা বা ক্ষুদ্র মৃত্যু সম্পর্কে অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَهُوَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰكُمْ بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ

অর্থাৎ 'তিনিই সেই আল্লাহ পাক, যিনি রাত্রিবেলা তোমাদের প্রাণ হরণ করেন, আর দিনে তোমরা যা কিছু কর তা তিনি জানেন'।

আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰى اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى

আল্লাহ পাক যার জন্যে মৃত্যুর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তার প্রাণ তিনি রেখে দেন, নিদ্রিত অবস্থায় তার মৃত্যু হয়, আর অপরগুলোকে এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ফেরত দেন। অর্থাৎ জাগ্রত হওয়ার তৌফিক দান করেন এবং মৃত্যুর জন্যে যে নির্দিষ্ট সময় রয়েছে সে সময় পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হয়।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যখন নিদ্রিত হওয়ার উদ্দেশ্যে তার বিছানায় যায় তখন তার কর্তব্য হলো বিছানাকে ঝেড়ে নেয়া। কেননা সে জানেনা যে তার পরে তাতে কী হয়েছে। এরপর তার কর্তব্য হলো এ দোয়া পাঠ করাঃ

باسمك ربى وضعت جنبى وبك ارفعه ان امسكت نفسى فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بماتحفظ له عبادك الصالحين

(হে আমার প্রতিপালক! তোমার পবিত্র নামের বরকতেই আমি শায়িত হবো। যদি তুমি আমার রুহকে রেখে দেয়ার সিদ্ধান্ত কর তবে তার প্রতি দয়া করো, আর যদি আমার রুহকে তুমি ফেরত দেয়া পছন্দ কর তবে এভাবেই তার হেফাজত কর, যেভাবে তুমি তোমার নেককার বন্দাদের হেফাজত করে থাক।)

এ পর্যায়ে বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত বরা এবনে আযেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন রাতে বিছানায় যেতেন তখন ডান কাত হয়ে শায়িত হতেন এবং ডান হাতকে তাঁর গাল মোবারকের নীচে রেখে এ দোয়া পাঠ করতেনঃ

اللهم بك اموت واحيى

'হে আল্লাহ! আমার জীবন ও মরণ তোমারই হাতে'।

এরপর যখন তিনি জাগ্রত হতেন তখন এ দোয়া পাঠ করতেনঃ

الحمد لله الذى احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور

'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ পাকের জন্যে, যিনি আমার প্রাণ হরণের পর পুনরায় জীবন দান করেছেন, আর তাঁরই নিকট কেয়ামতের দিন হাযির হতে হবে'।

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

'নিশ্চয় এতে আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমতের বহু নিদর্শন রয়েছে সে সব লোকদের জন্যে যারা চিন্তা করে থাকে'।

অর্থাৎ যারা চিন্তা করতে অভ্যস্ত, তারা জীবন-মৃত্যু, নিদ্রা এবং জাগরণে আল্লাহ পাকের অসীম কুদরতের অনেক জীবন্ত নিদর্শন দেখতে পায়। যিনি মানুষকে জীবন দান করেছেন এবং যিনি প্রতিদিন মানুষকে ক্ষণিকের জন্যে হলেও নিদ্রার মাধ্যমে পৃথিবী থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন, আর যিনি মানুষকে চিরতরে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দেন তথা মৃত্যুর অলঙ্ঘনীয় বিধান কার্যকর করেন, তাঁর পক্ষে সমগ্র মানব জাতিকে কেয়ামতের দিন তাঁর দরবারে হাযির করা আদৌ কোন কঠিন কাজ নয়। অতএব, প্রতিদিন জাগ্রত হয়ে আল্লাহ পাকের এ কুদরত হেকমত উপলব্ধি করা এবং পুনরায় জীবন লাভ করার জন্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে শোকর আদায় করা যেমন কর্তব্য, ঠিক তেমনি আরেকটি কর্তব্য হলো এ সত্য উপলব্ধি করা যে অবশেষে আমাদের সকলকে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে অবশ্যই হাযির হতে হবে এবং পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্যে যেমন জীবনোপকরণ সংগ্রহ করতে হয় ঠিক তেমনি পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যেও আমাদেরকে নেক আমলের সম্বল সংগ্রহ করতে হবে। যারা চিন্তাশীল, যারা পরিণামদর্শী, তারা এ পর্যায়ের কর্তব্য সম্পর্কে গাফেল হয়না।

اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَآءَ ط قُلْ اَوَلَوْ كَانُوْا لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَعْقِلُوْنَ

'তারা কি আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্যকে সুপারিশকারী ধরেছে? (হে রসূল!) আপনি জিজ্ঞাসা করুন, যদি তারা কোন প্রকার ক্ষমতা না রাখে বা কিছুই বুঝতে না পারে তবুও'?

কাফের মুশরেকদের এ ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে, তাদের ঠাকুর দেবতারা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তাদের পক্ষে সুপারিশ করবে, এজন্যে তারা ঠাকুর দেবতাদের উপাসনা করে। কিন্তু তারা এ সত্য উপলব্ধি করে না যে, আল্লাহ পাক যাকে সুপারিশ

করার অনুমতি দান করবেন শুধু সে-ই সুপারিশ করতে পারে আর মুশরেক বা তাদের ঠাকুর দেবতারা আল্লাহ পাকের দরবারে সুপারিশ করার কোন অনুমতি বা যোগ্যতা রাখেনা। তাদের ঠাকুর-দেবতাগুলো হলো জড় পদার্থ, অসহায়, নিরুপায়, সুপারিশ করার কোন ক্ষমতাও তাদের নেই, তারা বিবেক বুদ্ধিহীন, কিছু বোঝেওনা, আর কিছু করতেও সক্ষম নয়, অতএব তাদের সুপারিশ করার প্রশ্নই ওঠেনা। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ اَوَلَوْ كَانُوْا

অর্থাৎ কারো নিকট সুপারিশ করার জন্যে সুপারিশকারীর যে গুণাবলীর প্রয়োজন তা এ জড় পদার্থের তৈরী মূর্তিগুলোর নেই, অতএব সুপারিশ করার কোন অধিকারও তাদের নেই। আর কাফের মুশরেকেরা আল্লাহ পাকের দরবারে শুধু যে অপ্রিয় তাই নয়; বরং অভিশপ্তও। তাই তাদের পক্ষে সুপারিশ করার অধিকার কারোই নেই। এরপর এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ط لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

'(হে রসূল!) আপনি বলুন, সকল সুপারিশ একমাত্র আল্লাহ পাকেরই এখতিয়ারে, আসমান জমীনের রাজত্ব একমাত্র তাঁরই, এরপর তোমাদেরকে তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে'।

অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন, আল্লাহ পাকের দরবারে সুপারিশ করার চাবিকাঠি শুধু তাঁরই হাতে রয়েছে। অনুমতি ব্যতীত কেউ আল্লাহ পাকের দরবারে সুপারিশ করতে পারেনা, তিনি যে আসমান জমীনের মালিক, তিনি যে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তাঁর দরবারে অনুমতি ব্যতীত কেউ কোন কথা বলতে পারেনা। অতএব, যারা অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ, পাপীষ্ঠ তাদের পক্ষে কে সুপারিশ করবে, আর কাফেররা যাদেরকে মানে, তারা জড় পদার্থ, অক্ষম বস্তু ব্যতীত আর কিছুই নয়। আল্লাহ পাকের দরবারে তাঁর অনুমতি মোতাবেকই সুপারিশ করা সম্ভব হবে, যেমন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

انا اول شافع واول مشفع

'আমিই (কেয়ামতের দিন) সর্ব প্রথম সুপারিশকারী হবো, আর আমার সুপারিশই সর্বপ্রথম গ্রহণ করা হবে'। আর যে কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে, তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি তাদের পক্ষে

তিনি কি সুপারিশ করবেন? তা তো কখনো সম্ভব নয়। আর কাফেররা একথা যেন মনে রাখে যে,

ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

'অবশেষে তোমাদের প্রত্যেককে আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে ফিরে যেতে হবে'। তখনই হবে তোমাদের জীবনের যাবতীয় কর্মের বিচার, যাদেরকে তোমরা সুপারিশকারী মনে কর তারা দরবারে এলাহীতে সুপারিশ করার যোগ্য নয়, আর যিনি সুপারিশ করবেন তার সঙ্গে তোমরা কর শত্রুতা, অতএব তোমাদের পরিণতি কত ভয়াবহ হবে, তা উপলব্ধি কর।

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ
لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۖ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ
يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٥﴾ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا
فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٤٦﴾ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ
جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِن سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ ۚ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴿٤٧﴾

তরজমা

(৪৫) আর যখন শুধুমাত্র আল্লাহ্ পাকের নাম উল্লেখ করা হয় (যে তিনিই একমাত্র মা'বুদ) তখন যারা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস করেনা, তাদের অন্তরগুলো সংকুচিত হয়ে পড়ে, আর যখন আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্যদের (দেব-দেবীদের) উল্লেখ করা হয়, তখন তারা প্রফুল্ল হয়ে ওঠে।

(৪৬) (হে রসূল!) আপনি বলুন, হে আল্লাহ্! তুমিই আসমান জমীনের স্রষ্টা, গোপন ও প্রকাশ্যের পরিজ্ঞাতা, তোমার বন্দারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করে সে সম্পর্কে (কেয়ামতের দিন) তুমিই তাদের মাঝে ফয়সালা করবে।

(৪৭) আর কাফেরদের নিকট যদি পৃথিবীর সব কিছু থাকে, তার সাথে আরো এই পরিমাণ সম্পদ থাকে, তা তারা কেয়ামতের দিনের কঠিন আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে মুক্তিপণ হিসেবে আদায় করে (তবুও তারা রক্ষা পাবেনা)। আর তাদের জন্যে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এমন কিছু প্রকাশ পাবে যা তারা কল্পনাও করেনি।

তফসীরুল কোরআন

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

কাফেরদের নির্বুদ্ধিতা

আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের নির্বুদ্ধিতার কথা বর্ণিত হয়েছে। তৌহীদ বা আল্লাহ পাকের কথা তাদের নিকট অপছন্দনীয়, তাই যখন তাদের সম্মুখে এক আল্লাহ পাকের উল্লেখ করা হয় যেমন আল্লাহ পাকই একমাত্র উপাস্য, তিনিই একমাত্র মা'বুদ, তিনিই নিখিল বিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা ও পালনকর্তা, তখন তাদের মন দমে যায়, অন্তর সংকুচিত হয়। আল্লাহ পাকের একচ্ছত্র ক্ষমতা এবং রাজত্ব ও মহিমা বর্ণনা করা হলে কাফেররা আদৌ খুশী হয়না, পক্ষান্তরে তাদের ঠাকুর দেবতাদের কথা বলা হলে তারা যার-পর-নাই উল্লসিত হয়। এটিই তাদের নির্বুদ্ধিতা এবং বোকামীর পরিচায়ক, কেননা আল্লাহ পাকের জিকর হলো সঠিক কল্যাণ লাভের উপায়, তারা এতে অখুশী হয়ে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়, আর দেব-দেবীর উল্লেখ আল্লাহর গজবের কারণ হয়, তা তাদের সর্বনাশ ডেকে আনে, তাতে তারা খুশী হয়ে নিজেদের নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয়। এ অবস্থা তাদের, যারা আখেরাতে বিশ্বাস করেনা, যারা এ দুনিয়ার জীবনকেই 'সব কিছু' মনে করে, তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কথা শ্রবণে আনন্দিত হয়, কুফর ও শেরক তাদের মনে স্থায়ী আসন গেড়ে বসেছে, এজন্যে তৌহীদের কথা শ্রবণ করলে তাদের গাত্রদাহ হয় এবং চেহারা বিষন্ন হয়ে পড়ে। আজকের দুনিয়াতে অনেক নামধারী মুসলমানকেও দেখা যায় আল্লাহ, রসূল এবং আখেরাতের কথা বললে তারা হয় চরম নাখোশ, আর শুধু দুনিয়ার উন্নতি-অগ্রগতির কথা বললে তারা হয় অত্যন্ত আনন্দিত। এমনকি মসজিদের ইমাম, ওলামায়ে কেরাম যারা ওয়াজ নসিহত করেন, তাদেরকে অনুরোধ করা হয় যে, আল্লাহ, রসূল ও আখেরাতের কথা তো সব সময়ই বলেন, তবে এখন দুনিয়ার উন্নতির কিছু কথা বলুন। এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, এসব কাফেরদের বৈশিষ্ট্য বিশেষতঃ সে সব লোকদের, যারা আখেরাতে বিশ্বাস করেনা, যারা এ সত্য অনুধাবন করেনা যে, এ জীবন নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী, চিরস্থায়ী জীবন হলো আখেরাত।

দ্বিতীয়তঃ আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের সাফল্য নির্ভর করে এ জীবনের সাধনার উপর, যদি কেউ ঈমানদার ও নেককার হয়ে জীবন যাপন করে, তবে আখেরাতের জীবনের সাফল্য সুনিশ্চিত হয়, পক্ষান্তরে, যে ভোগবাদী জীবন-দর্শনে বিশ্বাসী হয়ে আখেরাতকে ভুলে থাকে, ঈমান ও নেক আমলের প্রতি অমনোযোগী হয়, তার জীবনের ব্যর্থতা অবধারিত এবং আখেরাতের শাস্তি অনিবার্য।

قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عٰلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِىْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ

'(হে রসূল!) আপনি বলুন, হে আল্লাহ! তুমিই আসমান জমীনের স্রষ্টা, গোপন ও প্রকাশ্যের পরিজ্ঞাতা, তোমার বন্দারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করে সে সম্পর্কে (কেয়ামতের দিন) তুমিই তাদের মাঝে ফয়সালা করবে'।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের নির্বুদ্ধিতা এবং শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে, আর এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে একটি দোয়ার তা'লিম দেয়া হয়েছে যাতে রয়েছে তাঁর জন্যে সান্ত্বনা, যেন তিনি কাফেরদের বিরোধিতা এবং শত্রুতায় ব্যথিত না হন। এরশাদ হয়েছেঃ

قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

'(হে রসূল!) আপনি আল্লাহ পাকের দরবারে এভাবে মোনাজাত করুন, হে আল্লাহ! তুমিই আসমান জমীনের স্রষ্টা, গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু সম্পর্কে তুমি সম্পূর্ণ অবগত, কেয়ামতের দিন তোমার বন্দাদের মধ্যে সে সব বিষয়ে তুমি ফয়সালা করবে, যে সম্পর্কে তারা দুনিয়াতে মতবিরোধ করেছে'। (হে রসূল!) এ দোয়া করে আপনি সমস্ত বিষয় আল্লাহ পাকের হাতে সোপর্দ করুন, আল্লাহ পাক নিজেই সব কিছুর মীমাংসা করবেন।

অর্থাৎ কাফেররা তৌহীদের কথা শ্রবণ করে অসন্তুষ্ট হয়, শেরকের কথা শ্রবণ করে হয় আনন্দিত, এটি তাদের নিবুর্দ্ধিতা এবং বোকামী, কিন্তু তাদের এহেন নির্বুদ্ধিতা দূর করা কারো পক্ষেই সম্ভব হচ্ছেনা, অতএব আল্লাহ পাকের দরবারে ফরিয়াদ করাই হলো একমাত্র পথ। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েত দান করেন, তিনিই সকল অশান্তি, অকল্যাণ দূরীভূত করেন।

হযরত আবু সালমা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছি, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোন্ কথা দিয়ে রাতের নামাজ শুরু করতেন? তখন উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, তিনি এভাবে দোয়া করতেনঃ

اللهم رب جبرئيل وميكائيل واسرافيل فاطر السموت والارض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فى ما كانوا فيه يختلفون اهدنى لما اختلف فيه من الحق باذنك تهدى من تشا الى صراط مستقيم

'হে আল্লাহ! হে জীব্রাঈল, মিকাঈল ও ইস্রাফীলের প্রতিপালক! হে আসমান জমীনের সৃষ্টিকর্তা! হে গোপন ও প্রকাশ্যের পরিজ্ঞাতা! তুমি তোমার বন্দাদের মাঝে ফয়সালা করে দেবে, যে সব বিষয়ে তারা মতবিরোধ করছে। আর আমাকে তুমি তোমার নির্দেশে সে সব বিষয়ে হক্ব পথে চলার তৌফিক দান কর, তুমি যাকে ইচ্ছা তাকে সরল সঠিক পথ দেখিয়ে থাক'।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে বন্দা নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করবে, আল্লাহ্ পাক কেয়ামতের দিন এরশাদ করবেন, এ বন্দা আমার নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে, সে অঙ্গীকার পূর্ণ কর, অতএব তাকে জান্নাতে প্রেরণ করা হবে।

দোয়াটি হলো ঃ

اللهم فاطر السموت والارض عالم الغيب والشهادة انى اشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك فانك ان تكلنى الى انفسى تقربنى من الشر وتباعدنى من الخير وانى لا اثق الا برحمتك فاجعل لى عندك عهدا توفيه يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد

'হে আল্লাহ! আসমান জমীনকে কোন প্রকার নমুনা ব্যতীত সৃষ্টিকর্তা , গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ের পরিজ্ঞাতা, আমি এ পৃথিবীতে তোমার সাথে অঙ্গীকার করি, তুমি

ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তুমি একক, তোমার কোন শরীক নেই, আর এ সাক্ষ্যও প্রদান করি যে, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তোমার বন্দা ও রসূল। যদি তুমি আমাকে আমারই নিকট সোপর্দ কর, তবে আমি অকল্যাণের নিকটবর্তী এবং কল্যাণ থেকে দূরে সরে পড়বো। হে আল্লাহ! আমি শুধু তোমারই রহমতের আশ্রয় গ্রহণ করি, আর তোমার প্রতিই ভরষা করি, অতএব, তুমিও আমার সঙ্গে অঙ্গীকার কর, যা তুমি কেয়ামতের দিন পূর্ণ করবে, নিশ্চয় তুমি অঙ্গীকার ভঙ্গ কর না'।

যাহোক, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, শত চেষ্টার পরও যখন কাফেররা সঠিক পথে আসেনি; সত্যকে মেনে নেয়নি, এমন অবস্থায় আপনি আল্লাহ পাকের মহান দরবারে মোনাজাত করে বলুন, হে আল্লাহ! কাফেররা কোন অবস্থাতেই সত্যের পথ, শান্তির পথ গ্রহণ করলো না, দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে বাদানুবাদই তাদের কর্ম, এমন অবস্থায় কেয়ামতের দিন তুমি তাদের বিচার করবে এবং মতবিরোধ সংক্রান্ত বিষয়ে তুমিই চূড়ান্ত ফয়সালা করবে।

وَلَوْ اَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ مِنْ سُوْٓءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط

'আর কাফেরদের নিকট যদি পৃথিবীর সব কিছু থাকে, তার সাথে আরো এই পরিমাণ সম্পদ থাকে, তা তারা কেয়ামতের দিনের কঠিন আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে মুক্তিপণ হিসেবে আদায় করে (তবুও তারা রক্ষা পাবেনা)'।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক কাফেরদের সম্পর্কে যে চূড়ান্ত ফয়সালা করবেন, তা কোন চেষ্টা-তদবিরের দ্বারা রদ করা সম্ভব হবেনা, এমনকি যদি সারা পৃথিবীর সমস্ত সম্পদও তাদের কাছে থাকে এবং অনুরূপ আরেকটি পৃথিবীর সম পরিমাণ সম্পদেরও তারা অধিকারী হয়, আর এসব কিছু তাদের মুক্তিপণ হিসেবে আদায় করতে ইচ্ছুক হয়, তবুও কেয়ামতের দিনের কঠিন আযাব থেকে তারা নিস্কৃতি পাবেনা, তাদের কৃতকর্মের শাস্তি অবশ্যই তারা ভোগ করবে।

وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ

'আর কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এমন কিছু প্রকাশ করা হবে, যা তারা ধারণাও করতে পারেনা'।

অর্থাৎ সেদিন তারা এত কঠিন এবং ভয়াবহ আযাবের সম্মুখীন হবে, যা সম্পূর্ণ কল্পনাতীত।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, কেয়ামতের দিন এত কঠিন শাস্তি তারা দেখতে পাবে, যা দুনিয়াতে কখনো তারা কল্পনাও করেনি।

অথবা এর অর্থ হলো, দুনিয়াতে তাদের ধারণা ছিল, মূর্তিগুলো কেয়ামতের দিন তাদের পক্ষে সুপারিশ করবে কিন্তু তার কোন লক্ষণই তারা দেখতে পাবেনা।

অথবা তাদের ধারণা ছিল, কেয়ামত, হাশর, নশর, বিচার-আচার কিছুই হবেনা, দুনিয়াতেই জীবনের শুরু এবং শেষ হবে। কিন্তু অবশেষে এটি ভ্রান্ত ধারণা হিসেবেই প্রমাণিত হবে।

তফসীরকার সুদ্দী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হলো দুনিয়াতে তারা মনে করতো যে, আমরা যা কিছু করছি এসবই নেক আমল কিন্তু কেয়ামতের দিন প্রকাশ পাবে যে, এগুলো নেক আমল নয়; বরং সবই ছিল অপরাধ। এ কাফেররা মূর্তি পূজাকে সৎ কাজ মনে করতো, এমনকি তাদের ধারণা ছিল যে, মূর্তি পূজা আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য লাভের মাধ্যম হবে কিন্তু আখেরাতে যখন মূর্তি পূজার শাস্তি দেখবে তখন তারা উপলব্ধি করবে যে, তারা কত বড় অপরাধে লিপ্ত ছিল, আর এ অপরাধ বা শাস্তির কথা তারা পৃথিবীতে কল্পনাও করেনি।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতের অর্থ হলো কেয়ামতের দিন কাফেররা এত ভয়ংকর এবং বিপজ্জনক শাস্তি দেখবে, যা দুনিয়াতে কখনো তারা চিন্তা করেনি। এর দৃষ্টান্ত হলো, জান্নাত সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ জান্নাতে এমন নেয়ামত সমূহ রয়েছে যা পৃথিবীতে কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি আর কেউ এ সম্পর্কে কল্পনাও করেনি। ঠিক এমনিভাবে দোযখের শাস্তি সম্পর্কে এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, দোযখে এমন ভয়ংকর রকমারী শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে, যা পৃথিবীতে কেউ কল্পনাও করতে পারেনা।[২]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-১৮২
২। তফসীরে কবীর খন্ড-২৬, পৃষ্ঠা-২৮৭

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ
يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٤٨﴾ فَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ اِذَا
خَوَّلْنٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ اِنَّمَآ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ ؕ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ
وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٩﴾ قَدْ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ
فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٥٠﴾ فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ
مَا كَسَبُوْا ؕ وَالَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ هٰٓؤُلَآءِ سَيُصِيْبُهُمْ سَيِّاٰتُ
مَا كَسَبُوْا ۙ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿٥١﴾ اَوَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ
الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ
يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٥٢﴾

তরজমা

(৪৮) তাদের কীর্তিকলাপের মন্দ পরিণতি তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়বে, আর তারা যে বিষয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতো, তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে।

(৪৯) মানুষকে যখন কোন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে তখন সে আমাকেই ডাকে, আর যখন আমি তাকে আমার নেয়ামত দান করি তখন সে বলে, আমি তো এ নেয়ামত লাভ করেছি আমার জ্ঞানের মাধ্যমে, মূলতঃ এটি তার জন্যে একটি পরীক্ষা, তবে তাদের অনেকেই তা বুঝতে পারেনা।

(৫০) তাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও এমন কথা বলেছে, কিন্তু তাদের কৃতকর্ম তাদের কোন কাজেই আসেনি।

(৫১) অবশেষে তাদের কৃতকর্মের মন্দ পরিণতি তাদের উপরই আপতিত হয়েছে। আর এদের মধ্যে যারা পাপীষ্ঠ, অদূর ভবিষ্যতে তাদের উপরও তাদের কীর্তিকলাপের শোচনীয় পরিণতি আপতিত হবে, তারা সে পরিণতি ঠেকাতে পারবেনা।

(৫২) তারা কি জানেনা যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক যার জন্যে ইচ্ছা তার রিয্ক বাড়িয়ে দেন, অথবা হ্রাস করেন। এতে ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্যে নিশ্চয় বহু নিদর্শন রয়েছে।

তফসীরুল কোরআন

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এ আয়াতেও তাদের শাস্তির ঐ বিবরণই অব্যাহত রয়েছে। কেয়ামতের দিন তাদের অন্যায়-অনাচারের শাস্তি তারা দেখতে পাবে, আর যে সব শাস্তি সম্পর্কে তারা দুনিয়াতে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতো, অবিশ্বাস করতো, কেয়ামতের দিন সে শাস্তিগুলো তাদেরকে ঘিরে ফেলবে। আর এটি হবে ঠাট্টা-বিদ্রুপের শাস্তি।

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, মানুষ পৃথিবীতে যেসব অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত হয় তন্মধ্যে প্রত্যেকটি অন্যায়ের ভিন্ন ভিন্ন শাস্তি সে কেয়ামতের দিন দেখতে পাবে। বিশেষতঃ দুনিয়াতে যারা আল্লাহ্ পাকের বিধান অমান্য করার ঘোষিত শাস্তিকে অবজ্ঞা করে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতো, সেদিন হবে তাদের কঠিন কঠোর শাস্তি।

ইমাম রাজী (রঃ) আরো লিখেছেন, কেয়ামতের দিন প্রত্যেককে তার আমলনামা দেয়া হবে এবং তাদের কুকর্মের সুদীর্ঘ ফিরিস্তি তাদের সম্মুখে রাখা হবে এবং যেহেতু তারা দুনিয়াতে কেয়ামতের দিনের কথা অস্বীকার করতো, বরং একথা শুনলে তারা উপহাসে লিপ্ত হতো, আল্লাহ্ পাক তাদের প্রত্যেকটি অন্যায়ের জন্যে শাস্তি ঘোষণা করবেন। বিশেষতঃ যে সব বিধান নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতো সেগুলোর কঠিন শাস্তি তারা দেখতে পাবে।

فَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا ۙ قَالَ اِنَّمَآ
اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ ؕ بَلْ هِىَ فِتْنَةٌ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

'মানুষকে যখন কোন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে তখন সে আমাকেই ডাকে, আর যখন আমি তাকে আমার কোন নেয়ামত দান করি, তখন সে বলে, আমি তো এ নেয়ামত লাভ করেছি আমার জ্ঞানের মাধ্যমে। মূলতঃ এটি তার পক্ষে একটি পরীক্ষা, তবে তাদের অনেকেই তা বুঝতে পারেনা'।

পূর্ববর্তী একখানি আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

'আর যখন শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের নাম উল্লেখ করা হয় (যে তিনিই একমাত্র মা'বুদ) তখন যারা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস করেনা, তাদের অন্তরগুলো সংকুচিত হয়ে পড়ে, আর যখন আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্যদের (দেব-দেবীদের) উল্লেখ করা হয় তখন তারা প্রফুল্ল হয়ে ওঠে'।

এটি ছিল কাফেরদের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, আর আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের আরেকটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখন তারা বিপদগ্রস্ত হতো যেমন অভাবের তাড়ণায় জীবন হয়ে উঠত দুর্বিষহ, অথবা তারা অসুস্থ হতো তখন এ কাফেররা একান্ত মনে শুধু আল্লাহ পাককে ডাকতো এবং এ সত্য উপলব্ধি করতো যে, আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ তাদের বিপদ দূর করতে পারবেনা, সমুদ্র বক্ষে যখন জাহাজডুবির আশঙ্কা হতো তখন তারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতো যে, আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ তাদেরকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারবেনা। আল্লাহ পাক ব্যতীত যে সব দেব-দেবীদের তারা পূজা করতো, বিপদ-মুহূর্তে তাদেরকে একেবারেই ভুলে থাকত। তারা এ বিপদে সাহায্য করতে পারে- একথা তারা চিন্তাও করতো না। কিন্তু কি বিস্ময়কর ব্যাপার, যখন আল্লাহ পাক তাদেরকে দয়া করে বিপদ থেকে উদ্ধার করতেন তথা তাদের দারিদ্র দূরীভূত করে তাদেরকে সম্পদশালী করে দিতেন, অথবা রোগ-বালা দূরীভূত করে দিতেন তখন তারা বলতো, এ নেয়ামত তো আমার প্রাপ্যই ছিল, আর এসব যে আমি পাব, তা পূর্বেই আমার জানা ছিল। আর শুধু যে নেয়ামত আমি পেয়েছি তা নয়; বরং আমার যোগ্যতার কারণেই পেয়েছি। অর্থ-সম্পদ পেলে বলতো, আমি ব্যবসা-বাণিজ্য করেছি, লাভবান হয়েছি আর এভাবে সম্পদশালী হয়েছি। আর যদি সে সুস্থ হতো তবে বলতো, অমুক চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করেছি বলেই সুস্থ হয়েছি।

এভাবে তারা আল্লাহ পাকের দানকে অস্বীকার করতো, নিজের যোগ্যতা অভিজ্ঞতা এবং বুদ্ধিমত্তার বড়াই করতো এবং আল্লাহ পাকের নেয়ামতের না-শোকরী করতো।

بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

'বরং এটি তার জন্যে একটি পরীক্ষা, তবে তাদের অনেকেই তা বুঝতে পারেনা'।

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের নেয়ামত ও দানে ধন্য হয়ে তারা যা বলেছে, তা সত্য নয়, বরং প্রকৃত সত্য হলো এই, এ নেয়ামত তাদের জন্যে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে একটি পরীক্ষা, কে নেয়ামত লাভ করে আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করে,

আর কে অকৃতজ্ঞ থাকে। অথবা এটি আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে একটি অবকাশ যাতে করে কাফেরদের অন্যায়ের ঘট পূর্ণ হয় এবং তাদের প্রতি আযাব আপতিত হওয়া যুক্তিযুক্ত হয়। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই এ সত্য উপলব্ধি করেনা।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, কোন কোন কাফের এ ধারণা করতো যে, আমরা বাতিলপন্থী, সত্য তাই যা বলেন হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। কিন্তু শুধু জেদ, শত্রুতা এবং অহংকারের কারণেই তারা ঈমান আনত না। তাই লক্ষ্য করা যায়, অনেক কাফের মূর্খতাবশতঃ কাফেরই থাকত। কোন কোন কাফের জানতো এবং বুঝতো কিন্তু শত্রুতার বশবর্তী হয়ে ঈমান আনত না। মোট কথা, অধিকাংশ কাফের তাদের মূর্খতার কারণেই ঈমান আনত না।

দ্বিতীয়তঃ কোন কোন কাফের বুঝে শুনেও শুধু শত্রুতা এবং জেদের বশবর্তী হয়ে ঈমান আনত না।[১]

قَدْ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

'তাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও এমন কথা বলেছে, কিন্তু তাদের কৃতকর্ম তাদের কোন কাজেই আসেনি'।

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, এ দূরাত্মা কাফেরদেরকে যখন কোন নেয়ামত দান করা হয় তখন তারা বলে, এ নেয়ামত তো আমার প্রাপ্য ছিল, অথবা তারা বলে, আমার যোগ্যতা বলেই আমি এ নেয়ামত লাভ করেছি। আর আলোচ্য আয়াতে

قَدْ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

বলে এরশাদ হয়েছেঃ আল্লাহ্ পাকের নেয়ামতকে অস্বীকার করা নতুন কোন কথা নয়; বরং ইতিপূর্বেও কাফেররা এমন কথা বলেছে। কিন্তু তাদের অর্জিত সম্পদ তাদের কোন কাজে আসেনি।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, পূর্ববর্তী লোকদের কথা বলে হযরত মুসা (আঃ)-এর যুগের কারুণকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা সে-ও একথাই বলেছিল। কিন্তু যেভাবে কারুণের অগাধ সম্পদ তার কোন কাজে আসেনি; অর্থাৎ তার যে বিপুল পরিমাণ সম্পদ ছিল তা তাকে চরম শাস্তি থেকে রক্ষা করতে

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২৬, পৃষ্ঠা-২৮৭-৮৮
তফসীরে মাজহারী খন্ড-২০, পৃষ্ঠা-১৮৩

পারেনি ঠিক তেমনি এ যুগের কাফেরদেরকে তাদের অর্জিত ধন-সম্পদ তাদেরকে বিপদমুক্ত করতে পারবেনা।[১]

فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا ط وَالَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ هٰٓؤُلَآءِ سَيُصِيْبُهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا لا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ

'অবশেষে তাদের মন্দ কর্মের পরিণতি-আযাব তাদের উপর আপতিত হলো। আর এদের মধ্যে যারা পাপীষ্ঠ তাদের কুকর্মের ভয়াবহ পরিণতি তাদের উপরও আপতিত হবে, আর তারা তা ঠেকিয়ে রাখতে পারবেনা'।

বস্তুতঃ ইতোপূর্বে যারা পৃথিবীতে নবী রসূলগণের বিরোধিতা করেছে, আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়েছে তারা তার শাস্তিও যথাসময়ে ভোগ করেছে, নিক্ষিপ্ত হয়েছে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে। কোরআনে করীমেই বর্ণিত হয়েছে এসব কোপগ্রস্ত জাতিগুলোর শিক্ষণীয় ঘটনাবলী। আদ, সামুদ এবং হযরত নূহ (আঃ)-এর জাতি, এমনিভাবে ফেরাউন, নমরুদ গংয়ের ঘটনাবলী, এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে এরশাদ হয়েছেঃ মক্কাবাসীর মধ্যে যারা ইসলামের বিরোধিতা করে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে ইসলাম প্রচারে বাধা দেয় তাদের শাস্তিও অনিবার্য এবং অপ্রতিরোধ্য। এ পর্যন্ত কেউ আল্লাহ পাকের আযাবকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি, কেউ তাঁর আযাব থেকে রক্ষা পায়নি। দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে আল্লাহ পাকের আযাব থেকে কেউ রক্ষা পাবেনা।

আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতে মক্কাবাসী কাফেরদের উদ্দেশ্যে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। ইতিপূর্বে নবী রসূলগণের বিরোধিতার কারণে যেভাবে অন্যান্য জাতিকে শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে ঠিক তেমনি তোমাদেরকেও সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতার কারণে শাস্তি ভোগ করতে হবে। আর এ শাস্তি হলো দুনিয়ার জীবনের শাস্তি। যেমন মক্কাবাসী সাত বছর একাধারে দুর্ভিক্ষের কষ্ট ভোগ করেছে।

দ্বিতীয়তঃ বদরের যুদ্ধে তারা পরাজয় বরণ করেছে এবং তাদের তথাকথিত ৭০ জন নেতা নিহত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এ শাস্তির কথাই বলা হয়েছে।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে যে শাস্তির কথা বলা হয়েছে তা হলো আখেরাতের শাস্তি।[২]

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৪, পৃষ্ঠা-১২
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-১৮৪
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৪ পৃষ্ঠা-৯
২। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৪, পৃষ্ঠা-১৩

أَوَلَمْ يَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

'তারা কি জানেনা আল্লাহ্ পাক যাকে ইচ্ছা তার রিয্ক বাড়িয়ে দেন, আর যাকে ইচ্ছা তার রিয্ক হ্রাস করেন, নিশ্চয় এতে বহু নিদর্শন রয়েছে ঈমানদারদের জন্যে'।

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে অথচ তারা ছিল তখন সমৃদ্ধশালী, আল্লাহ্ পাক তাদেরকে দুনিয়ার ধন-সম্পদ দিয়ে রেখেছেন, দুনিয়ার সম্পদ ও ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য দেখে মানুষ বিভ্রান্ত হয়, মানুষ এ ভ্রান্ত ধারণা করে যে, এভাবে 'সুখের সাগরে'ই জীবন অতিবাহিত হবে, অথচ পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের কঠোর শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থ-সম্পদের ক্ষেত্রে যে ভুল বোঝাবুঝি হয় তার নিরসন-কল্পেই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

أَوَلَمْ يَعْلَمُوٓا۟

'তারা কি জানেনা'? অর্থাৎ জানা উচিত যে, স্বচ্ছলতা এবং সংকীর্ণতার রহস্য কি? এ পর্যায়ে প্রথম কথা হলো কারো স্বচ্ছল বা দরিদ্র হওয়া সম্পূর্ণ আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছাধীন, আর স্বচ্ছল হওয়া আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে প্রিয় এবং পছন্দনীয় হবার দলিল নয়; এমনিভাবে দরিদ্র হওয়াও অপ্রিয় হওয়ার প্রমাণ নয়। দ্বিতীয়তঃ স্বচ্ছলতা জ্ঞান-বুদ্ধি এবং যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল নয়; মূলতঃ আল্লাহ্ পাক যাকে ইচ্ছা তার রিয্ক বাড়িয়ে স্বচ্ছলতা-স্বাচ্ছন্দ্য দান করেন, আবার কোন কোন গুণী ব্যক্তিকেও দারিদ্র্য-প্রপীড়িত করেন। কোন কোন নেককার লোককে দারিদ্র্যের কষাঘাত সইতে হয়, আর কোন দুর্বৃত্তকেও ধন-সম্পদের অধিকারী হতে দেখা যায়। এটি সম্পূর্ণ আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছাধীন। এজন্যে অনেক মূর্খ লোকও সম্পদশালী হয়, আর অনেক গুণী লোককেও ঐ মূর্খ ব্যক্তির আজ্ঞাবহ হতে দেখা যায়।

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, স্বচ্ছলতা এবং দারিদ্র দু' ই তাঁর ইচ্ছা ও মর্জির বিষয়। অতএব, রিয্ক অধিক পরিমাণে পেলে একথা বলা উচিত নয় যে, আমার বুদ্ধিমত্তার কারণেই আমি সম্পদের অধিকারী হয়েছি; বরং আল্লাহ্ পাকের দানে ধন্য হবার কারণেই সম্পদ লাভ হয়েছে, এজন্যে তাঁর শোকর আদায় করা উচিত। আর দারিদ্র্য-প্রপীড়িত হলেও সবর অবলম্বন করা উচিৎ, কেননা হয়তো এ ব্যক্তিকে আল্লাহ্ পাক আখেরাতে অনেক সওয়াব দান করবেন, উচ্চ মর্তবায় আসীন করবেন, এজন্যে দুনিয়াতে তাকে দরিদ্র রেখেছেন। তাই সম্পদশালী হলে শোকর এবং না হলে সবর করাই কর্তব্য। আর আল্লাহ্ পাকের সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকাও কর্তব্য।

একবার হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহ পাকের মহান দরবারে আরজী পেশ করেছিলেনঃ دلنى الى رضاءك অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আমাকে তোমার সন্তুষ্টি লাভের পথ বাতলে দাও'। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ رضاءى برضائك فى قضاءى

'তুমি যদি আমার সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাক, তবে তাতেই থাকবে আমার সন্তুষ্টি নিহিত'।

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ
لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ؕ
اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٥٣﴾ وَاَنِيْبُوْٓا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ
قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ﴿٥٤﴾ وَاتَّبِعُوْٓا اَحْسَنَ
مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ
بَغْتَةً وَّاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ﴿٥٥﴾ اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يّٰحَسْرَتٰى عَلٰى
مَا فَرَّطْتُّ فِيْ جَنْۢبِ اللّٰهِ وَاِنْ كُنْتُ لَمِنَ السّٰخِرِيْنَ ﴿٥٦﴾

তরজমা

(৫৩) (হে রসূল!) আপনি বলুন (আল্লাহ পাক এরশাদ করেন), হে আমার বন্দাগণ! তোমরা যারা (পাপাচারের মাধ্যমে) নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, তোমরা আল্লাহ পাকের রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা, আল্লাহ পাক সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন, নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

(৫৪) আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে ফিরে আস, এবং তোমাদের প্রতি আযাব আসার পূর্বেই তোমরা তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ কর, নতুবা এরপর তোমরা কোন প্রকার সাহায্য পাবেনা।

(৫৫) তোমাদের উপর অতর্কিতভাবে, তোমাদের অজ্ঞাতসারে আযাব আসার পূর্বেই তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে অবতীর্ণ উত্তম বিধি-নিষেধগুলো মেনে চল।

(৫৬) যাতে করে কাউকে একথা বলতে না হয়, হায়! আক্ষেপ আমার সে ত্রুটির জন্যে যা আমি আল্লাহ পাকের দরবারে করেছি। আফসোস! আমি আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধের বিদ্রুপকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী কয়েক খানি আয়াতে মুশরেকদের অন্যায় আচরণের বিবরণ ও তাদের শাস্তির ঘোষণা ছিল। এরপর অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক পন্থায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছিল, এ আয়াত সমূহ শ্রবণের পর হয়তো কারো মনে ইসলাম গ্রহণের আকাঙ্ক্ষাও সৃষ্টি হতে পারে, এর পাশাপাশি এ চিন্তাও হতে পারে যে, এত অন্যায়-অনাচারের পর কি আর আমাদেরকে ক্ষমা করা হবে? এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়।

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ.....

শানে নযুল

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, কিছু মুশরেক যারা মানুষকে হত্যা করেছে, ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে আরজ করেছ, আপনি যা কিছু বলেন তা অত্যন্ত ভাল, আর যে বিষয়ের প্রতি আপনি আহবান করেন তা-ও নিঃসন্দেহে উত্তম, কিন্তু আমরা যে বড়ই পাপী, আমাদের পাপাচার মাফ হবে কি? তখন এ আয়াত এবং সূরা ফোরকানের একখানি আয়াত নাযিল হয়।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে মক্কার মুশরেকদের সম্পর্কে।

তেবরানী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত হামজা (রাঃ)-এর ঘাতক ওয়াহশীকে ইসলাম গ্রহণের জন্যে লোক মারফত আহবান জানান, ওয়াহশী জবাব দেয় আমাকে ইসলাম গ্রহণের জন্যে কিভাবে দাওয়াত দিচ্ছেন, কেননা আপনি বলেছেন, যে শেরক করে, যে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাকে কেয়ামতের দিন দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে। তখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়ঃ

اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا

(কিন্তু যারা তওবা করে, ঈমান আনে এবং নেক আমল করে।)

তখন ওয়াহশী বললো, এ শর্তটি অত্যন্ত কঠিন, যদি তা পূর্ণ করা আমার দ্বারা সম্ভব না হয়, তবে অন্য কোন পথ আছে কি? তখন নাযিল হয়ঃ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

'নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাঁর সঙ্গে শেরক করাকে মাফ করবেন না, এতদ্ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা তিনি মাফ করতেও পারেন'।

তখন ওয়াহশী বললো, মাফ করা না করা আল্লাহ পাকের ইচ্ছাধীন, আমি তওবা করে ইসলাম গ্রহণ করলেও ক্ষমা না-ও পেতে পারি, এমন পরিস্থিতিতে আমার কী অবস্থা হবে? তখন আলোচ্য আয়াত-

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

নাযিল হয়। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ 'হে আমার বন্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, তোমরা আল্লাহ পাকের রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা। নিশ্চয় আল্লাহ পাক তোমাদের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান'।

এ আয়াত নাজিল হবার পর সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! এ ঘোষণা শুধু কি ওয়াহশীর জন্যে, না সকল মুসলমানের জন্যে? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ সকল মুসলমানের জন্যে।

হাকেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, কিছু লোক ইসলাম গ্রহণের পর বিপদগ্রস্ত হয়ে ইসলাম পরিত্যাগ করে, তাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ আয়াত নাযিল হয়েছে ইয়াশ এবনে রবীয়া (রাঃ) এবং ওলীদ (রাঃ) এবনে ওলীদ সহ এমন মুসলমানদের ব্যাপারে, যারা প্রথমে ঈমান এনেছিল কিন্তু ঈমানের কারণে যখন দুঃখ-দুর্দশা দেখা দেয় তখন তারা ইসলাম পরিত্যাগ করে। আমরা বলতাম, আল্লাহ পাক তাদের কোন আমল কবুল করবেন না, ফরজও নয়, নফলও নয়, আর কোন ভাবেই তাদের তওবাও কবুল হবেনা, তখন আল্লাহ পাক এ আয়াত নাযিল করেন।

খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর নিজের হাতে এ আয়াত লিখে ইয়াশ এবনে রবীয়া এবং ওলীদ (রাঃ) সহ অন্যান্য লোকের নিকট প্রেরণ করেন। তখন তাঁরা পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মক্কা শরীফ থেকে হিজরত করে মদীনা শরীফে চলে আসেন।[১]

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ۭ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

'(হে রসূল!) আপনি বলুন (আল্লাহ পাক এরশাদ করেন), হে আমার বন্দাগণ! তোমরা যারা পাপাচার করে নিজেদের প্রতি জুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা, নিশ্চয় আল্লাহ পাক তোমাদের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন, নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান'।

তওবার আহবান

এ আয়াতে আল্লাহ পাক সকল পাপীষ্ঠকে তওবা করার আহবান জানিয়েছেন। ইতোপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, মুশরেকরা হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে আরজ করেছিল, আপনার কথা, আপনার দ্বীন সব দিক থেকেই ভাল কিন্তু সমস্যা হলো আমাদের দ্বারা যে সব বড় বড় অপরাধ হয়েছে সেগুলোর কি হবে? তখন এ আয়াতে তওবার আহবান জানিয়ে ক্ষমা প্রাপ্তির সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

মসনদে আহমদে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ সারা পৃথিবী এবং তার সব কিছু প্রাপ্ত হলেও আমার এত খুশী হতো না, এ আয়াত নাযিল হওয়াতে যত খুশী হয়েছি। এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো, যে ব্যক্তি শেরক করেছে, তাকেও মাফ করা হবে? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর বললেন, সতর্ক থাক, যে ব্যক্তি শেরক করেছে (তাকেও মাফ করা হবে অর্থাৎ যদি শেরক থেকে তওবা করে ঈমান আনে, তাকে মাফ করা হবে। কিন্তু যদি সে শেরকের উপর আমৃত্যু কায়েম থাকে তবে তাকে ক্ষমা করা হবেনা)।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা কান্দালভী (রঃ), খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৯২
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-১৮৫-৮৬
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৬৩-৬৪
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৪ পৃষ্ঠা-১১

মসনদে আহমদে অন্য একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি রয়েছে, একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি লাঠি ভর দিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে আরজ করলেন, 'আমার ছোট খাট গুনাহ অনেক রয়েছে, আমাকে কি ক্ষমা করা হবে'? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি আল্লাহ পাকের তৌহীদের প্রতি বিশ্বাস করে তার স্বাক্ষ্য দিয়েছ'? তিনি বললেন, 'জ্বী-হ্যা এবং আপনার রেসালতের প্রতিও স্বাক্ষ্য প্রদান করি', তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তোমার ছোট-খাট গুনাহ মাফ।

এই হাদীস সমূহ দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, তওবা দ্বারা সকল গুনাহ মাফ হয়। আল্লাহ পাকের রহমত থেকে কোন বন্দারই নিরাশ হওয়া উচিত নয়, তওবা এবং রহমতের দ্বার উন্মুক্ত এবং প্রশস্ত (পশ্চিমাকাশে সূর্য উদিত হবার পূর্ব পর্যন্ত)। যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

أَلَمْ يَعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ

'তারা কি জানেনা? যে, নিশ্চয় আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদের তওবা কবুল করেন'।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাকের দয়া-মায়া, রহমত কত বেশী তা বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়, যারা আল্লাহ পাকের প্রিয় বন্দাগণকে হত্যা করেছে, তাদেরকেও তওবা এস্তেগফারের আহবান জানানো হয়েছে। এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে অনেক বিবরণ স্থান পেয়েছে।[১]

তেবরানীতে হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। তিনি বলেছেন, পবিত্র কোরআনে সর্বাধিক মাহাত্মপূর্ণ আয়াত হলো আয়াতুল কুরসী। পবিত্র কোরআনে সবচেয়ে বেশী আনন্দের আয়াত হলো আলোচ্য আয়াত।[২]

আয়াতের মর্মকথা

আলোচ্য আয়াতের মর্মকথা হলো, আল্লাহ পাকের রহমত থেকে কখনো নিরাশ হতে নেই। যত বড় পাপীই হোক, যদি সঠিক পন্থায় তওবা করে এবং পাপাচার বর্জন করে লজ্জিত-অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হয়, তবে আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করেন। কেননা, আল্লাহ পাকের অনন্ত করুণা এবং অসীম দয়ার দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে, এ জীবনে মানুষ যদি যথা নিয়মে তওবা করে দরবারে

১। তওবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন, তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-৩৫৪-৬৪
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৪ পৃষ্ঠা-১১

এলাহীতে হাযির হয় তবে আল্লাহ পাক তার তওবা কবুল করেন। অবশ্য বন্দার হক্বের ব্যাপার হলে তা আদায় করতে হয় অথবা তার কাছ থেকে মাফ নিতে হয়, আর হক্কুল্লাহর মধ্যে যদি ফরজ এবাদত কাজা হয়ে থাকে, তবে তা আদায় করতে হয়। যদি সে সুযোগ না হয়, তবে যথা নিয়মে তার কাফ্ফারা আদায় করতে হয়।

এখানে আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, আখেরাতে কোন লোককে ক্ষমা করা-না করা সম্পূর্ণ আল্লাহ পাকের এখতিয়ারভুক্ত বিষয়; এতে কোন মানুষের হাত নেই। এজন্যে তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, এসব বিষয়ে কথা বলার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা একান্ত জরুরী, ক্ষণিকের গাফলত মহা বিপদের কারণ হতে পারে। এ পর্যায়ে হাদীস শরীফে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। হযরত জুন্দব (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ এক ব্যক্তি বলেছিলো, আল্লাহর শপথ! আল্লাহ পাক অমুক ব্যক্তিকে মাফ করবেন না, তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন যে, এ ব্যক্তি কে? যে আমার নামের শপথ করে বলছে, আমি তাকে মাফ করবো না। আমি ঐ ব্যক্তিকে মাফ করে দিলাম আর যে এ কথা বলেছে, তার সমস্ত আমল বাতিল করলাম (মুসলিম শরীফ)।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক জান্নাতে কোন কোন বন্দার মর্তবা তার আমলের চেয়ে বাড়িয়ে দেবেন। তখন বন্দা আরজ করবে, এ উচ্চ মর্তবা কিভাবে বৃদ্ধি হলো? আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, তোমার জন্যে তোমার সন্তান-সন্ততিরা মাগফেরাতের দোয়া করেছে, তারই ফলে (তোমার মর্তবা বৃদ্ধি করা হয়েছে)। (আহমদ)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কবরের ভেতরে মৃত ব্যক্তির অবস্থা হলো সে ব্যক্তির ন্যায় যে ডুবন্ত অবস্থায় রক্ষা পাবার জন্যে ফরিয়াদ করে। এমনিভাবে মৃত ব্যক্তি অপেক্ষা করে পিতা-মাতা-ভাই-বন্ধু যেন তার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করে। তাদের দোয়া তার নিকট দুনিয়া এবং দুনিয়ার সমস্ত কিছুর চেয়ে যেন অধিক প্রিয়। জমীনের অধিবাসীদের তরফ থেকে কবরের অধিবাসীদের জন্যে যে দোয়া করা হয়, আল্লাহ পাক তার বিনিময়ে তাদেরকে পাহাড়ের ন্যায় সওয়াব দান করবেন। জীবিত লোকদের পক্ষ থেকে মৃতদের জন্যে মাগফেরাতের দোয়া হলো হাদীয়া স্বরূপ। (বায়হাকী)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাকের একশতটি রহমত রয়েছে। তন্মধ্যে

একটি রহমত সমগ্র জ্বীন জাতি, মানব জাতি, জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গের মধ্যে বিতরণ করে দিয়েছেন। আর ঐ রহমতের কারণেই তারা পরস্পরের প্রতি দয়া করে। আর অবশিষ্ট রহমত সমূহ আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদের জন্যে সংরক্ষণ করেছেন যা কেয়ামতের দিন বন্দাদেরকে দান করা হবে। (সকল হাদীস গ্রন্থ)

হযরত ওমর এবনুল খাত্তাব (রাঃ) বর্ণনা করেন, কিছু বন্দীকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে পেশ করা হয়। ঐ বন্দীদের মধ্যে একজন মহিলাও ছিল যার দুধ ফোটা ফোটা করে পড়ে যাচ্ছিল। সে এদিক-সেদিক দৌড়ে কয়েদীদের মধ্যে যদি কোন দুগ্ধ পোষ্য শিশু দেখত, তবে তাকে বুকে নিয়ে দুধ পান করাতো। তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তোমরা কি জান এ স্ত্রীলোকটি কখনো কি তার সন্তানকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করতে পারে? (যখন সে অন্যের সন্তানদের এভাবে আদর করে) আমরা আরজ করলাম, যতক্ষণ তার মধ্যে শক্তি থাকে, সে তার সন্তানদেরকে আগুনে ফেলবেনা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদের প্রতি এর চেয়ে অধিকতর মেহেরবান, যতটা এ স্ত্রীলোক তার সন্তানের প্রতি মেহেরবান।

আল্লাহ পাকের দয়া মায়ার একটি দৃষ্টান্ত

হযরত আমের (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি উপস্থিত হলেন, তাঁর গায়ে চাদর এবং হাতে কোন জিনিষ ছিল, যা তিনি চাদর দিয়ে ঢেকে রেখেছেন। তিনি আরজ করলেন, আমি একটি বৃক্ষের নীচ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম, সেখানে পাখির ছানার শব্দ শুনলাম, আমি সেগুলোকে ধরে আমার চাদরে রেখে দিলাম। এরই মধ্যে তাদের মা এসে আমার মাথার উপর ঘোরাফেরা করতে লাগলো, আমি তখন পাখির ছানাগুলোকে তার সম্মুখে রেখে দিলাম, মা পাখিটি এগিয়ে আসলে আমি সবগুলোকে আমার চাদরে তুলে নিলাম, এখন এসবই আমার কাছে রয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আদেশ করলেন, এগুলোকে রেখে দাও, তখন দেখা গেল মা তার ছানাদের আঁকড়ে ধরে রেখেছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, মা পাখিটি তার বাচ্চাদের উপর কত মেহেরবান তা দেখে তোমরা কি আশ্চর্যন্বিত হচ্ছো? শপথ সেই আল্লাহ পাকের যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, এই পাখিটি তার ছানাগুলোর উপর যত মেহেরবান আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদের প্রতি তার চেয়ে অনেক বেশী মেহেরবান। এরপর তিনি ঐ ব্যক্তিকে আদেশ দিলেন, যাও, যেখান থেকে এগুলো ধরে এনেছ সেখানে এগুলো

রেখে দাও। নির্দেশ মোতাবেক ঐ ব্যক্তি সেগুলোকে নিয়ে চলে গেল। (আবু দাউদ শরীফ)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমরা এক জেহাদে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম, পথে কিছু লোকের সাথে দেখা হল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তোমাদের কি পরিচয়? তারা আরজ করলেন, আমরা মুসলমান। তাদের সঙ্গে একজন স্ত্রীলোকও ছিল, সে রান্না করছিল, তার সঙ্গে একটি শিশু সন্তানও ছিল। যখন অগ্নি বেশি করে জ্বলে উঠতো তখন সে তার সন্তানকে দূরে সরিয়ে রাখতো, এরপর সে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে আরজ করলো, আপনি কি আল্লাহর রসূল? তিনি এরশাদ করলেন, হ্যাঁ। তখন সে বললো, আপনার প্রতি আমার পিতা মাতা কোরবান, আল্লাহ পাক কি দয়াবানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান নন? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, কেন নয়? এরপর সে বললো, মা তার সন্তানের প্রতি যতটা দয়াবান আল্লাহ পাক কি তাঁর বন্দাদের প্রতি তার চেয়ে অধিকতর দয়াবান নন? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, কেন নয়? (অবশ্যই) এরপর সে বললো, মা তার সন্তানকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করেনা। একথা শ্রবণ করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম চিন্তিত হলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি এরশাদ করলেন, আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদের মধ্য থেকে শুধু তাকেই আযাব দেবেন যে অবাধ্য, যে বিদ্রোহী, আর যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলতে অস্বীকৃতি জানায়। (এবনে মাজা শরীফ)

এ পর্যায়ে আরো বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। প্রশ্ন হল, যে সব মোমেন কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয় তারা কি জান্নাতে যাবে? মুতাজেলা ফেরকা এ মত পোষণ করে, যে মোমেন কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয় সে যদি তওবা না করে তবে চিরদিন দোযখে থাকবে। তাদের এ মত সঠিক নয়, তারা বিভ্রান্ত। আর মুরজিয়া ফেরকার মত হল, গুনাহ ছোট হোক বা বড় যদি ঈমান সঠিক থাকে তবে মোমেনের আখেরাতে কোন আযাবই হবেনা। এ মতটিও সঠিক নয়, কেননা এর দ্বারা সে সব আয়াত ও হাদীস সমূহ অস্বীকার করা হয় যাতে গুনাহর শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে। উপরোক্ত দু'টি মতই ভ্রান্ত।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অভিমত

সঠিক মত হল, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আর তা হলো, গুনাহর শাস্তি হওয়াই স্বাভাবিক কিন্তু তা আল্লাহ পাকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তিনি ইচ্ছা করলে গুনাহ মাফ করতে পারেন, আবার ইচ্ছা করলে শাস্তিও দিতে পারেন। গুনাহ

মাফ হয় তওবার মাধ্যমে অথবা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শাফাআতের মাধ্যমে কিংবা কোন ওলী আল্লাহর সুপারিশ ক্রমে, অথবা শুধু আল্লাহর রহমতে। যদি আল্লাহ পাক কোন গুনাহগার মোমেনকে আযাব দেয়ার ইচ্ছাও করেন তবে তা স্থায়ী আযাব হবেনা; বরং সাময়িক হবে। কেননা আল্লাহ পাক প্রত্যেক নেক আমলের সওয়াব প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যেমন কোরআনে করীমে এরশাদ হয়েছেঃ

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ

'যে ব্যক্তি সামান্যম নেক আমলও করবে সে তার বিনিময় অবশ্যই দেখতে পাবে'। আর ঈমান হল সবচেয়ে বড় নেক আমল এবং সকল নেক আমল কবুল হওয়া নির্ভর করে ঈমানের উপর, আর আল্লাহ পাকের ওয়াদার বরখেলাফ হওয়া সম্ভব নয়। আখেরাতে সওয়াব প্রদানের স্থানই হল জান্নাত, অতএব মোমেন মাত্রই জান্নাতে যাবে। আযাব ভোগ করার পর অথবা কোন আযাব ব্যতীতই আল্লাহ পাক তাকে জান্নাত নসীব করবেন। মোমেনের অবস্থা এই, যদি তার দ্বারা একটি গুণাহ হয়ে যায় তবে সে মনে করে সে পাহাড়ের পাদদেশে বসে আছে, আর উপর থেকে পাহাড় আপতিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আর কাফের তার গুণাহকে মনে করে একটি মাছি তার নাকের ডগায় বসেছে, একটি ইঙ্গিতেই তাকে উড়িয়ে দেয়া যাবে।[১] (বোখারী শরীক)

আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশা অত্যন্ত বড় গুনাহ

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাকের রহমত থেকে নিরাশ হওয়া অত্যন্ত বড় গুনাহ। কেননা আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে,

لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ

(আল্লাহর রহমত থেকে তোমরা নিরাশ হয়োনা) এমনিভাবে আরো এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّهٗ لَا يَايْئَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ

(সূরা ইউসুফ)

'নিশ্চয় আল্লাহর রহমত থেকে কাফের ব্যতীত কেউ নিরাশ হয়না'। আরও এরশাদ হয়েছেঃ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-১৯২-৯৩

وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖٓ اِلَّا الضَّآلُّوْنَ

'পথভ্রষ্ট লোক ব্যতীত বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্ পাকের রহমত থেকে কে নিরাশ হয়'?

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ আয়াত সমূহের সুস্পষ্ট ঘোষণার পরও যদি কেউ আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় তবে সে আল্লাহর কিতাবকে অস্বীকার করে।[১]

وَاَنِيْبُوْٓا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ

'আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে ফিরে আস, আর তোমাদের প্রতি আযাব আসার পূর্বেই তোমরা তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ কর, নতুবা এরপর তোমরা কোন প্রকার সাহায্য পাবেনা'।

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহর রহমতের প্রতি আশান্বিত হবার আদেশ হয়েছে এবং রহমত থেকে নিরাশ না হবার নির্দেশ দিয়ে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাক সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেবেন। তাই এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্ পাকের এ ঘোষণার সুযোগ গ্রহণ কর এবং নিজের কৃত অন্যায়-অনাচারের জন্যে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে তওবা-এস্তেগফার কর। তাঁর রহমতের আশা কর এবং তাঁর যাবতীয় নাফরমানী থেকে নিজেকে রক্ষা কর এবং আল্লাহ্ পাকের বিধি-নিষেধ পালনে আত্মনিয়োগ কর, আর কৃত অন্যায়ের জন্যে আল্লাহ্ পাকের দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হও, আর এ অঙ্গীকার কর যে ভবিষ্যতে এমন অন্যায় আর করবো না, সর্বদা আল্লাহ্ পাকের অনুগত বন্দা হিসাবে থাকব। হাদীস শরীফে সাইয়্যেদুল এস্তেগফার এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

اللهم انت ربى لا اله الا انت خلقتنى وانا عبدك وانا على عهدك اعوذبك ووعدك ابوء بنعمتك وابوء بذنبى واغفرلى فانه لا يغفر الذنوب الا انت

এ তওবার তাৎপর্য হল, আল্লাহ্ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর বন্দেগীর অঙ্গীকার গ্রহণ করা, আর কৃত অন্যায়ের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হওয়া। আল্লাহ্ পাকের সাথে কৃত অঙ্গীকার রক্ষা করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা। আর এসব

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৬ পৃষ্ঠা-৯৬-৯৭

কথার প্রকৃত তাৎপর্য হল আল্লাহ্ পাকের প্রতি সম্পূর্ণ তন্ময় থাকা, তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা। এজন্যে আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَاَنِيْبُوْٓا اِلٰى رَبِّكُمْ

আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে ফিরে আস তথা শেরক থেকে তওবা কর, আল্লাহ্ পাকের বন্দা হয়ে জীবন যাপন করে বন্দেগীর হক্ব আদায় কর, আর তার পন্থা হলো আল্লাহ্ পাকের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা। তাই পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

وَاَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ

'এবং আল্লাহ্ পাকের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ কর, তোমাদের প্রতি তাঁর আযাব আসার পূর্বে সম্পূর্ণ এবং পরিপূর্ণ অনুগত হও, নতুবা এরপর তোমরা কোন প্রকার সাহায্য পাবেনা'।

এ আয়াতে যে আযাবের কথা বলা হয়েছে, তা কোন্ আযাব? আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ আযাব হলো কবরের আযাব অথবা কেয়ামতের দিনের আযাব। এ অবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে, এ জীবনে পূর্বে কৃত যাবতীয় পাপাচার থেকে তওবা কর, মানবতার কলঙ্ক শেরক বর্জন কর। আল্লাহ্ পাকের কথা মত জীবন যাপন কর। যদি তা না কর, তবে তোমাদের রক্ষা নেই। এ অবস্থায় মৃত্যু হলে কবরের আযাব থেকে এবং কেয়ামতের দিনের আযাব থেকে রেহাই পাবেনা। আর কারো এবং কোন প্রকার সাহায্যও তোমরা পাবেনা।[১]

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ পাকের রহমত এবং মাগফেরাত লাভের দু'টি শর্তারোপ করা হয়েছে। এক, কুফর ও শেরক বর্জন করে আল্লাহ্ পাকের দিকে ফিরে আস, কেননা, যে কাফের মুশরেক সে আল্লাহর বিদ্রোহী।

দুই, সঠিকভাবে ইসলাম কবুল কর, অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ কর। এ দু'টি শর্ত পূর্ণ করা হলে রহমত ও মাগফেরাতের দ্বার উন্মুক্ত হবে। অন্যথায় আযাব অবশ্যম্ভাবী। আর তা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হবে। কবর, হাশর, দোযখ সর্বত্রই আযাব থাকবে, পক্ষান্তরে ঈমান ও আনুগত্যের গুণ অর্জন করলে রহমত ও মাগফেরাত লাভ করা সম্ভব হবে।[২]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-১৯৩
২। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৯৩০

وَاتَّبِعُوْٓا اَحْسَنَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ

'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে অবতীর্ণ উত্তম বিধি-নিষেধগুলো মেনে চল, তোমাদের প্রতি অতর্কিতভাবে, তোমাদের অজ্ঞাতসারে আযাব আসার পূর্বেই তোমরা আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা কর'।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ উত্তম বিধি-নিষেধ বলে পবিত্র কোরআনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, কেননা পৃথিবীতে পবিত্র কোরআনের চেয়ে উত্তম কিছুই নেই, এটি আল্লাহ্ পাকের মহান বাণী, সমগ্র বিশ্ব আল্লাহ্ পাকের সৃষ্টি যা 'কুন' (হও) আদেশে অস্তিত্ব লাভ করেছে। আবার আল্লাহ্ পাকের আরেক আদেশে সমগ্র সৃষ্টি জগৎ লয়ঃপ্রাপ্ত হবে, কিন্তু পবিত্র কোরআন এমন নয়; বরং এটি মহান আল্লাহ্ পাকের নিজস্ব কালাম যা আগুনেও পোড়েনা, পানিতেও বিনষ্ট হয় না, সমস্ত পৃথিবীতে যার কোন দৃষ্টান্ত নেই।

যারা পবিত্র কোরআন মেনে চলে, তারাই ভাগ্যবান আর যারা পবিত্র কোরআনে বিশ্বাস করেনা, বা বিশ্বাস করেও তার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেনা তথা পেয়েও পায়না, তারা নিঃসন্দেহে ভাগ্য-বিড়ম্বিত।

এ আয়াতে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে, যদি তোমরা পবিত্র কোরআনের বিধি-নিষেধ মেনে চলতে রাজী না হও, তবে তোমাদের প্রতি যে কোন সময় অতর্কিতভাবে, অজ্ঞাতসারে আযাব আসতে পারে। তখন তোমরা বুঝতেও পারবেনা, কখন কিভাবে এ আযাব এসে পড়ল? বিগত ১৯৯৪ সালে ভারতের মহারাষ্ট্রে যে ভূমিকম্প হয়েছিল, এরপর মহামারী আকারে প্লেগের যে প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল এবং ৯৫'র শুরুতে জাপানের কোবে শহরে যে প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্প হয়েছিল, তা পবিত্র কোরআনের এ আয়াতের ঘোষণারই বাস্তব রূপ।

অতএব, আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান এনে তাঁর বিধি-নিষেধ পালন করে পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের সম্বল সংগ্রহ করা বুদ্ধিমান মাত্রেরই কর্তব্য।

اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يّٰحَسْرَتٰى عَلٰى مَا فَرَّطْتُّ فِيْ جَنْۢبِ اللّٰهِ وَاِنْ كُنْتُ لَمِنَ السّٰخِرِيْنَ

'নতুবা অবশেষে আফসোস করে তোমাদেরকে বলতে হবে, হায় আক্ষেপ! আমার সে ত্রুটির জন্যে যা আমি আল্লাহ্ পাকের বিধি-নিষেধ পালনে করেছি।

আফসোস! আমি আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধের প্রতি বিদ্রুপকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম'।

মূলতঃ কেয়ামতের কঠিন দিনের আযাব দেখে কাফেররা এভাবেই আক্ষেপ করবে।

مَا فَرَّطْتُّ

এর অর্থ হলো আমি যে ত্রুটি করেছি,

فِىْ جَنْۢبِ اللّٰهِ

হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ পাকের আনুগত্যে যে ত্রুটি করেছি।

আর মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাকের ব্যাপারে যে ত্রুটি করেছি।

সাঈদ এবনে যোবায়ের বলেছেনঃ আল্লাহ পাকের হক্ব আদায়ের ব্যাপারে যে ত্রুটি করেছি। এক কথায় আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ পালনে যে ত্রুটি করেছি, তার জন্যে আক্ষেপ। কেননা এ ত্রুটির কারণেই চিরস্থায়ী আযাব ভোগ করতে হবে।

কিন্তু তখনকার আক্ষেপ তাদের কোন কাজে আসবেনা।

أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٧﴾ أَوْ
تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ
الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾ بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ
وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٥٩﴾ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا
عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى
لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا
يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦١﴾

তরজমা

(৫৭) অথবা কেউ যেন না বলে, যদি আল্লাহ পাক আমাকে পথ-প্রদর্শন করতেন, তবে আমি অবশ্যই পরহেযগার লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

(৫৮) অথবা যখন শাস্তি দেখবে তখন যেন কাউকে বলতে না হয়, আহ! যদি কোন ভাবে আবার পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারতাম তবে আমি নেককার লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

(৫৯) (আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন) হ্যাঁ, নিশ্চয় তোমার নিকট আমার নিদর্শন সমূহ এসেছিল, কিন্তু তুমি সেগুলোকে মিথ্যাজ্ঞান করেছিলে এবং অহংকার করেছিলে, আর তুমি ছিলে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত।

(৬০) যারা আল্লাহ পাকের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, (হে রসূল!) আপনি কেয়ামতের দিন তাদের মুখ কালো দেখবেন। এই অহংকারীদের আবাসস্থল কি দোযখে নয়?

(৬১) যারা মোত্তাকী, পরহেযগার, আল্লাহ পাক তাদেরকে নাজাত দেবেন, কোন অমঙ্গল তাদেরকে স্পর্শও করবেনা, তাদের কোন দুঃখও থাকবেনা।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ কাফের মুশরেকরা কেয়ামতের দিন আক্ষেপ করে বলবে, দুনিয়াতে আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ মেনে চলিনি বলেই আজ এ দুর্দিন দেখতে হচ্ছে। কাফেররা এভাবেই অনুতাপ করতে থাকবে। কিন্তু যখন দেখবে এসব অনুতাপে কোন ফলোদয় হচ্ছেনা তখন তারা সুর পরিবর্তন করে যে কথা বলবে তা আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

اَوْتَقُوْلَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدٰنِىْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ

তারা বলবে, আমাদের দোষ কোথায়? আল্লাহ পাক যদি ইচ্ছা করতেন, তবে আমাদেরকে হেদায়েত করতেন। আর এ অবস্থায় আমরা নিশ্চয় মোত্তাকী পরহেজগারদের অন্তর্ভুক্ত হতাম এবং এ মহা বিপদের সম্মুখীন হতাম না। আলোচ্য আয়াতের المتقين। শব্দটির অর্থ হলো আত্মরক্ষাকারী অর্থাৎ শেরক এবং অন্যান্য অপরাধ থেকে আত্মরক্ষাকারী হতাম।

اَوْ تَقُوْلَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِىْ كَرَّةً فَاَكُوْنَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ

অথবা তারা কোন আযাব দেখে আক্ষেপ করে একথা বলবে, হায়! যদি আমাদেরকে আর একটি বার দুনিয়াতে ফিরে যাবার সুযোগ দেয়া হতো, তবে আমরা নেককার বন্দাদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

পবিত্র কোরআনের একটি বৈশিষ্ট্য

এ আয়াত সমূহে যে সব কথাবার্তা রয়েছে, এগুলো কেয়ামতের দিন কাফেররা বলবে, এটি পবিত্র কোরআনের বৈশিষ্ট্য যে, কেয়ামতের দিন কাফেররা কি বলবে পবিত্র কোরআন তা এখনই বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছে। পবিত্র কোরআন যে মহান আল্লাহ্ পাকের কালাম, এটি তার অন্যতম প্রকৃষ্ট প্রমাণ এজন্যে হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, বন্দা কি করবে এবং কি বলবে, এসব কথা আল্লাহ্ পাক পূর্বাহ্নেই পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি মহাজ্ঞানী, তিনি সব কিছু জানেন, সব কিছু দেখেন। কাফেরদের এসব কথার জবাবও রয়েছে পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে, এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ

'যদি এ কাফেরদেরকে দ্বিতীয়বারও পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়, তবুও তারা হেদায়েত গ্রহণ করবে না; বরং তাদের জন্যে নিষিদ্ধ কাজগুলোই তারা করবে, নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী'।

মসনদে আহমদে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রত্যেক দোযখের অধিবাসীকে জান্নাতে তার জন্যে নির্দিষ্ট স্থানটি দেখিয়ে দেয়া হবে। তখন সে বলবে, হায়! আক্ষেপ! যদি আল্লাহ্ পাক আমাকে হেদায়েত দান করতেন, তবে আমার এ বিপদ হতোনা। এমনিভাবে, প্রত্যেক জান্নাতী ব্যক্তিকে দোযখে তার জন্যে নির্দিষ্ট স্থানটি দেখিয়ে দেয়া হবে, তখন সে বলবে, যদি আল্লাহ্ পাক আমাকে হেদায়েত দান না করতেন, তবে আমি জান্নাতে আসতে পারতাম না।

যখন কাফের মুশরেকরা দুনিয়াতে ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা করবে এবং ঈমানদার না হওয়ার এবং নেক আমল না করার জন্যে আক্ষেপ করবে, তখন আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে ঘোষণা করা হবে, এখন আক্ষেপ-অনুতাপ সম্পূর্ণ নিরর্থক, দুনিয়াতে আমি আমার নবী রসূলগণের মাধ্যমে আমার বিধি-নিষেধ প্রেরণ করেছি, কিন্তু তোমরা তা মিথ্যাজ্ঞান করেছ, আমার বিধি-নিষেধ পালনে দম্ভ ভরে অস্বীকৃতি জানিয়েছ, আজ শাস্তি অনিবার্য।[১]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৪ পৃষ্ঠা-১৪
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৬৬

তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

بَلٰى قَدْ جَآءَتْكَ اٰيٰتِىْ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ

'(আল্লাহ পাক এরশাদ করবেনঃ) হ্যা, নিশ্চয় তোমাদের নিকট আমার নিদর্শন সমূহ এসেছিল, কিন্তু তুমি সেগুলোকে মিথ্যাজ্ঞান করেছিলে এবং অহংকার করেছিলে, আর তুমি ছিলে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত'।

আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের একথার প্রতিবাদ রয়েছে, যা তারা কেয়ামতের দিন বলবে যে, আমাদেরকে হেদায়েত দান করা হলে আমরা পরহেযগার হতাম।

এ পর্যায়ে একখানি হাদীস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই হাদীসে রয়েছে যে, কেয়ামতের দিন হযরত নূহ (আঃ)-কে তলব করা হবে, আল্লাহ পাক তাঁকে জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি কি তোমার উম্মতের নিকট আমার বাণী পৌঁছিয়ে ছিলে? হযরত নূহ (আঃ) আরজ করবেন, 'জ্বী হ্যাঁ'। এরপর তাঁর উম্মতকে হাযির করা হবে এবং জিজ্ঞাসা করা হবে, 'তোমাদের নিকট কি আমার বাণী পৌঁছেছিল'? তখন তারা অস্বীকার করে বলবে, 'আমাদের নিকট কোন সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী আসেনি'। আলোচ্য আয়াতে তাদের ঐ উক্তিরও প্রতিবাদ রয়েছে।

وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ ط اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ

'যারা আল্লাহ পাকের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে (হে রসূল!) কেয়ামতের দিন আপনি তাদের মুখ কালো দেখবেন, এ অহংকারীদের আবাসস্থল কি দোজখ নয়'?

যারা আল্লাহ পাকের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, কেয়ামতের দিন তাদের চেহারা কাল হবে, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রেরিত নবী রসূলগণকে অস্বীকার করা, তাঁর মহান বাণী পবিত্র কোরআনকে মিথ্যাজ্ঞান করা, তাঁর বিধি-নিষেধকে অমান্য করা- এসবই হলো আল্লাহ পাকের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা। যেহেতু আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবী রসূলগণ সম্পর্কে তারা বলেছে যে, আল্লাহ পাক তাঁদেরকে প্রেরণ করেননি; এভাবে তারা আল্লাহ পাকের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে। আল্লাহ পাকের মহান বাণী পবিত্র কোরআনকে অস্বীকার করেও তারা আল্লাহ পাকের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে। কেয়ামতের দিন তাদের চেহারা কালো হবে, দোযখের অগ্নিতে দগ্ধ হবার কারণেও কালো হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ দোযখের আযাব দেখার কারণে তাদের অন্তরে যে ভয় সৃষ্টি হবে, তার কারণেও চেহারা কালো হতে পারে। এছাড়া তাদের মনে পথভ্রষ্টতার যে অন্ধকার রয়েছে, তাদের চেহারায় তার ছাপ পড়ার কারণেও চেহারা কালো হতে পারে।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রঃ) লিখেছেন, আখেরাতে সব কিছুর বাস্তব রূপ দেখা যাবে, কাফের মুশরেকদের মনের বাস্তব রূপ তাদের চেহারায় প্রকাশ পাবে তাই তাদের চেহারা কালো দেখা যাবে।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, কেয়ামতের দিন দু' প্রকার লোক হবে, কৃষ্ণ বর্ণের চেহারা বিশিষ্ট এবং নূরানী চেহারা বিশিষ্ট, কাফের-মুশরেক-মুরতাদ-নাস্তিক তথা পাপীষ্ঠদের চেহারা হবে কৃষ্ণ বর্ণের, আর ঈমানদার ও নেককার লোকদের চেহারা হবে নূরানী। আর অহংকারীদের ঠিকানা হবে দোযখে। এবনে আবি হাতেমে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, দুনিয়ার অহংকারী লোকদের হাশর হবে পিপীলিকার আকৃতিতে, সকলেই তাদেরকে পদদলিত করবে, অবশেষে তাদেরকে দোযখে বন্দী করা হবে। যে দোযখে তাদেরকে রাখা হবে, তার নাম হবে 'বোলাস'। তার অগ্নি হবে অত্যন্ত প্রখর। দোযখীদের দেহ থেকে নির্গত পুঁজ তাদেরকে পান করানো হবে।[২]

وَيُنَجِّى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوْٓءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

'যারা মোত্তাকী, পরহেযগার, আল্লাহ পাক তাদেরকে নাজাত দেবেন, কোন অমঙ্গল তাদেরকে স্পর্শও করবেনা, তাদের কোন দুঃখও থাকবেনা'।

বস্তুতঃ এটিই সাফল্য, জীবন-সাধনায় এ সাফল্য লাভ করাই হলো পরম সৌভাগ্য। যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান এনে তার দাবী মোতাবেক তাকওয়া-পরহেযগারী অবলম্বন করে জীবন যাপন করে, এ সাফল্য এবং এ সৌভাগ্য তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে, তাদের প্রতি এটি হবে আল্লাহ পাকের মহান দান (হে আল্লাহ! তৌফিক দান কর)।

১। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৯৩১
তফসীরে বয়ানুল কোরআন, পৃষ্ঠা-৯০৪
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা–২৪ পৃষ্ঠা-১৪

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّ
هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ﴿٦٢﴾ لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٦٣﴾ قُلْ
اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْٓنِّيْٓ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ ﴿٦٤﴾ وَلَقَدْ
اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَئِنْ اَشْرَكْتَ
لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٦٥﴾ بَلِ اللّٰهَ
فَاعْبُدْ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٦٦﴾ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ
قَدْرِهٖ ۖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ
مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ ۭ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٧﴾

তরজমা

(৬২) আল্লাহ পাকই সমস্ত বস্তুর স্রষ্টা এবং তিনিই সব কিছুর কর্ম বিধায়ক।

(৬৩) আসমান জমীনের কুঞ্জিকা তাঁরই নিকট রয়েছে, যারা আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহকে অস্বীকার করেছে, তারাই সর্বস্বান্ত হয়েছে।

(৬৪) (হে রসূল!) আপনি বলুন, হে অজ্ঞ লোকেরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কারো এবাদত করতে বলছো?

(৬৫) (হে রসূল!) আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তী নবী রসূলগণের প্রতি নিশ্চয় ওহী নাযিল হয়েছে যে, হে শ্রোতা! যদি তুমি আল্লাহ পাকের সাথে শরীক মেনে নাও, তবে তোমার আমল বরবাদ হয়ে যাবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত।

(৬৬) বরং এক আল্লাহ পাকেরই বন্দেগী কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হও।

(৬৭) আর তারা আল্লাহ পাকের যথাযোগ্য সম্মান করেনা। কেয়ামতের দিন সমগ্র পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোয় আর আসমান সমূহ থাকবে তাঁর করায়ত্ত। তিনি পবিত্র এবং তিনি তাদের বর্ণিত শরীকদের বহু উর্দ্ধে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে প্রথমতঃ কাফেরদের শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে এবং দ্বিতীয়তঃ মোত্তাকী পরহেযগারদের সাফল্যের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। আর এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাকই সমগ্র বিশ্ব জগতের স্রষ্টা, সব কিছু তাঁরই সৃষ্টি, তাঁরই একচ্ছত্র কতৃত্ব সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত, তিনিই সব কিছুর অভিভাবক এবং কর্মবিধায়ক, আসমান জমীনের চাবি তাঁরই হাতে। অতএব, যারা আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহকে অস্বীকার করবে, তাঁর বিধি-নিষেধকে অমান্য করবে, তাঁর একত্ববাদে অবিশ্বাস করবে স্বাভাবিক ভাবেই তারা হবে ক্ষতিগ্রস্ত, সর্বস্বান্ত, তাদের শাস্তি হবে অনিবার্য। আল্লাহ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তাই কেউ তাদেরকে তাঁর শাস্তি থেকে রেহাই দিতে পারবেনা। এরশাদ হয়েছেঃ

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ وَّكِيْلٌ

'আল্লাহ পাকই সমস্ত বস্তুর স্রষ্টা, তিনিই সব কিছুর কর্ম বিধায়ক'।

لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط

আলোচ্য আয়াতের مقاليد শব্দটি مقلاد বা مقليد এর বহু বচন, যেমন مفتاح এর বহু বচন مفاتيح।

অর্থাৎ আসমান জমীনের সকল ভান্ডারের চাবি একমাত্র আল্লাহ পাকের নিকটই রয়েছে। সারা জাহানে তাঁরই নিরঙ্কুশ মালিকানা সুপ্রতিষ্ঠিত।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) এবং মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের مقاليد শব্দটির অর্থ হলো রিয্ক এবং রহমত। আর তফসীরকার কালবী (রঃ) বলেছেন, السموٰت। مقاليد বলে বৃষ্টির ভান্ডারকে বোঝানো হয়েছে। এক কথায় নিখিল বিশ্বে যা কিছু রয়েছে সব কিছুরই মালিক এক আল্লাহ পাক, এতদসত্ত্বেও যারা তাঁকে মানেনা, তাঁকে বিশ্বাস করেনা তাদের ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকতে পারেনা।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ

'আর যারা আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহকে অস্বীকার করেছে, তারাই সর্বস্বান্ত হয়েছে'।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে 'আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহ' বলে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এবং কোরআনে করীমকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে অর্থাৎ যারা যেখানে যখনই প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতকে অস্বীকার করবে এবং পবিত্র কোরআনকে অবিশ্বাস করবে, আখেরাতে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[১]

সে যুগে আবু জেহেল গয়রহ যেমন ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, এ যুগে কুখ্যাত রুশদী-তসলিমা সহ যারাই এমন অন্যায়ে লিপ্ত হবে তাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াও অবধারিত, অনিবার্য।

ইমাম এবনে আবি হাতেম এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ওসমান (রাঃ) বর্ণিত একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ)-ও বর্ণনা করেছেন, যা আবু ইয়ালা 'মসনদে' সংকলন করেছেন, আর তেবরানী 'আদ দোয়া'য় এবং বায়হাকী 'আল আসমাউস সেফাত' গ্রন্থে এর উল্লেখ করেছেন। হাদীসের বিবরণঃ হযরত ওসমান (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে (আলোচ্য আয়াত) لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করেছি, তখন তিনি এরশাদ করলেন, হে ওসমান! তোমার পূর্বে কেউ আমার নিকট এ আয়াতের তফসীর জিজ্ঞাসা করেনি। এ আয়াতের তফসীর হলো একাধিক, لا اله الا الله (আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই) الله اكبر (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ) سبحان الله وبحمده (পবিত্র আল্লাহ পাক, সমস্ত প্রশংসা তাঁরই) (আমি আল্লাহ পাকের নিকট ক্ষমা প্রার্থী) لا هول ولا قوة الا بالله (আল্লাহ পাক ব্যতীত কারো কোন শক্তি নেই) الاول والاخر (তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ) بيده الخير (সকল কল্যাণ তাঁরই হাতে) يحيى ويميت (তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যুমুখে পতিত করেন) وهو على كل شىء قدير (আর তিনি সর্বোপরি সর্বশক্তিমান)।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনায়ও হযরত ওসমান (রাঃ)-এর প্রশ্ন এবং জবাবের উল্লেখ রয়েছে। আর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় একথাও রয়েছে, যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যা এ বাক্যগুলো দশবার করে পাঠ করবে, আল্লাহ পাক তাকে ছয়টি নেয়ামত দান করেন। যেমনঃ

১। তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা-৩৯১

(১) ইবলিস ও তার দলবল থেকে আল্লাহ পাক তাকে হেফাজত করবেন।

(২) জান্নাতে তাকে অঢেল সওয়াব দান করবেন।

(৩) হুরগণ তার স্ত্রী হবে।

(৪) তার গুনাহ মাফ করা হবে।

(৫) সে হযরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর সাথে থাকার তৌফিক পাবে।

(৬) মৃত্যুর সময় তার নিকট বারজন ফেরেশতা আসবে এবং তাকে সুসংবাদ দান করবে এবং কবর থেকে হিসাবের স্থান পর্যন্ত সসম্মানে তাকে নিয়ে যাবে। কেয়ামতের দিন যখন সে ভীত হবে তখন তাকে ফেরেশতাগণ সান্ত্বনা প্রদান করবে। তার হিসাব সহজ করা হবে। এরপর তাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেয়া হবে। অত্যন্ত সম্মান এবং মর্যাদার সঙ্গে তাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে, যখন অন্যরা থাকবে কঠিন বিপদের মুখোমুখি।[১]

قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْنِّيْٓ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ

"(হে রসূল!) আপনি বলুন, হে অজ্ঞ লোকেরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কারো এবাদত করতে বলছো"?

শানে নযুল

তেবরানী এবং এবনে আবি হাতেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে প্রস্তাব দেয়, আপনি যদি রাজী থাকেন, আমরা আপনাকে এত ধন-সম্পদ দেব যে, আপনি মক্কার সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী হয়ে যাবেন। অথবা মক্কার রাজত্ব আপনি গ্রহণ করবেন অথবা যে কোন সুন্দরী স্ত্রীলোককে আপনি বিয়ে করতে চাইলে আমরা তার ব্যবস্থা করবো, তবে আমাদের একটি মাত্র শর্ত এই যে, আপনি আমাদের উপাস্যদেরকে মন্দ বলবেন না, তাদের সমালোচনা করবেন না। অথবা যদি আপনি পছন্দ করেন তবে এ ব্যবস্থাও হতে পারে যে, এক বছর আপনি আমাদের উপাস্যদের পূজা করবেন, আর এক বছর আমরা আপনার মা'বুদের পূজা করবো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন তাদেরকে বললেন, যখন আমার প্রতিপালকের তরফ থেকে জবাব আসবে তখন আমি তোমাদের একথার জবাব দেব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ ওহীর অপেক্ষা করবো। তখন 'সূরা কাফেরুন' এবং আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড১০, পৃষ্ঠা-১৯৬-৯৭
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৪, পৃষ্ঠা-২২
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৬৭

বায়হাকী 'দালায়েলে' হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, মুশরেকরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলেছিল, আপনি আপনার পিতা-পিতামহকে পথভ্রষ্ট বলেছেন, তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।

আল্লামা বগভী (রঃ) তফসীরকার মোকাতেল (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলেছিল, আপনি আপনার পূর্ব পুরুষের ধর্মে ফিরে আসুন, তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

কাফেরদের এ প্রশ্নের জবাবেই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْنِّيْٓ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ

'(হে রসূল!) আপনি বলুন, হে অজ্ঞ লোকেরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কারো এবাদত করতে বলছো'?

যারা এ ধারণা করে যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কিছুর এবাদত করবেন, তাদের মত বোকা বা মূর্খ আর কেউ হতে পারেনা।

হে মুশরেকের দল! তোমরা কি একথা মনে কর যে, আমি স্বভাব-ধর্ম ইসলাম ছেড়ে দিয়ে মানবতার কলঙ্ক শেরক গ্রহণ করবো? যা নির্বুদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

পরবর্তী আয়াতে শেরকের ভয়াবহ পরিণতির ঘোষণা করা হয়েছেঃ

وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

'(হে রসূল!) আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তী নবী রসূলগণের প্রতি নিশ্চয় ওহী নাযিল করা হয়েছে যে, 'হে শ্রোতা! যদি তুমি আল্লাহ পাকের সাথে শরীক মেনে নাও, তবে তোমার সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে, তোমার জীবন-সাধনা হবে ব্যর্থ, আর তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত'।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, যদি কেউ মুরতাদ হয়, তবে তার বিগত দিনের সমস্ত নেক আমল বাতিল হয়ে যায়, যেভাবে কোন কাফের যখন ইসলাম গ্রহণ করে তখন কাফের অবস্থায় কৃত গুনাহ সমূহ

ইসলাম গ্রহণের কারণেই দূরীভূত হয়ে যায়। এমনকি, যদি কোন ব্যক্তি মুরতাদ হওয়ার পর পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে, আর এমন সময় মুসলমান হয় যখন নামাজের সময় এখনো বাকী রয়েছে, তবে মুরতাদ হওয়ার পূর্বে যে নামাজ আদায় করেছিল, তা-ও বাতিল হয়ে যাবে। তাকে নতুন করে ঐ নামাজ আদায় করতে হবে। ঠিক এভাবে যদি কেউ হজ্ব আদায় করলো, এরপর মুরতাদ হলো, এরপর পুনরায় সে মুসলমান হলো, এমন অবস্থায় তাকে দ্বিতীয়বার ফরজ হজ্ব আদায় করতে হবে। আর আলোচ্য আয়াতে একথাই ঘোষণা করা হয়েছে।

لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ

'যদি তুমি শেরক কর, তবে তোমার আমল বাতিল হয়ে যাবে'।

আর এজন্যেই পরবর্তী আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছেঃ

بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ

বরং এক আল্লাহ পাকেরই বন্দেগী কর, শুধু তাঁরই সম্মুখে মাথা নত কর, শুধু তাঁর নিকটই আশা কর এবং শুধু তাঁর প্রতিই ভরসা কর, আর আল্লাহ পাকের শোকর গুজার বন্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও তথা তিনি যে অনন্ত অসীম নেয়ামত দান করে রেখেছেন তার জন্যে সর্বদা শোকর আদায় করতে থাক।

প্রকৃত বন্দার কর্তব্য

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃত বন্দার দু'টি কর্তব্য একান্ত পালনীয় (১) শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের বন্দেগী করা, তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা তথা তাঁর যাবতীয় বিধি-নিষেধ পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা। (২) আল্লাহ পাকের প্রদত্ত অগণিত নেয়ামত সমূহের শোকর আদায় করতে থাকা। যারা আল্লাহ পাকের প্রকৃত বন্দা, তাদের মধ্যে এ দু'টি গুণ অবশ্যই থাকবে।

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌ بِيَمِيْنِهٖ ط سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

'আর তারা আল্লাহ পাকের যথাযোগ্য সম্মান করেনা, কেয়ামতের দিন সমগ্র পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোয়, আর আসমান সমূহ থাকবে তাঁর করায়ত্ত, পবিত্র তিনি, আর তিনি তাদের বর্ণিত শরীকদের বহু উর্দ্ধে'।

শানে নুযুল

তিরমিজী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, একবার এক ইহুদী ধর্মযাজক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয় এবং বলে, 'হে আবুল কাশেম! আল্লাহ পাক যখন আসমান সমূহকে এ আঙ্গুলের উপর আর জমীন সমূহকে এ আঙ্গুলের উপর এবং সমুদ্রগুলোকে এ আঙ্গুলের উপর আর পাহাড়গুলোকে এ আঙ্গুলের উপর রাখবেন, তখন কি অবস্থা হবে'? তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

আয়াতের মর্মকথা

এ আয়াতের মর্মকথা হলো, আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম, সম্মান এবং মর্যাদা যতখানি করা উচিত ছিল, বন্দারা তা করেনি, আর কেয়ামতের দিন সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি আল্লাহ পাকের হাতের মুঠোয় থাকবে। আসমানগুলো আল্লাহ পাকের দক্ষিণ হস্তে থাকবে, আর কাফেররা যে শেরক করে, তিনি তা থেকে অনেক উর্দ্ধে।

আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম

ইমাম তাবারী (রঃ) লিখেছেনঃ হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের তফসীরে বলেছেন, যারা কাফের, তারা আল্লাহ পাকের সম্মান এবং মর্যাদা রক্ষা করেনি। পক্ষান্তরে, যারা ঈমান এনেছে আর একথা বিশ্বাস করেছে যে, আল্লাহ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি সর্বশক্তিমান, তারা আল্লাহ পাকের সত্যিকার মর্যাদা উপলব্ধি করেছে। অতএব, যারা কাফের, মুশরেক, বে-দ্বীন, তারা আল্লাহ পাকের যথাযোগ্য মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারেনি; তাঁর অনন্ত অসীম মহিমা সম্পর্কে যদি তারা সঠিক ধারণা করতো, তবে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করতো না, আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হতো না।[১]

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, তৌহীদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করা ব্যতীত আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করা প্রমাণিত হয় না। কেননা, বিশ্ব স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের সর্ব প্রথম হক্ব হলো, তাঁর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করা। যদি কেউ তৌহীদে বিশ্বাস না করে তথা শেরক করে, তবে সে আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম সম্পর্কে কোন ধারণাই রাখেনা। আল্লাহ পাকের শান হলো এই যে, কেয়ামতের দিন আসমান জমীন তাঁর হাতের মুঠোয় থাকবে।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এ আয়াতখানি 'মুতাশাবিহাত' এর অন্তর্ভুক্ত, কেননা এর প্রকৃত অর্থ আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ জানেনা। এর উদ্দেশ্য হলো,

১। তফসীরে তাবারী খন্ড-২৪, পৃষ্ঠা-১৭

আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ব সম্পর্কে একথা জানিয়ে দেয়া যে, আল্লাহ পাকের মহান মর্যাদা সম্পর্কে তাঁর বন্দারা কিছুই জানেনা। আর আল্লাহ পাকের মাহাত্ম সম্পর্কে আঁচ করা বন্দার পক্ষে সম্ভবই নয়।

মানুষের সীমিত জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা মহান আল্লাহ পাকের কুদরত, হেকমত, শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম সম্পর্কে ধারণা করা এবং তাঁর হক্ব আদায় করা কখনো সম্ভব নয়। তবে আল্লাহ পাকের পবিত্র সত্ত্বা সম্পর্কে যতখানি জ্ঞান অর্জন করা বন্দার অবশ্য কর্তব্য, তার ন্যূনতম সীমা হলো তৌহীদে বিশ্বাস স্থাপন করা। যারা তৌহীদ তথা আল্লাহ পাকের একত্ববাদেই বিশ্বাস করেনা, তারা আল্লাহ পাকের যথাযোগ্য সম্মান করেনা।[২]

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত এবং বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক এ বিশাল বিস্তৃত জমীনকে তাঁর কুদরতী হাতের মুঠোয় নিয়ে নেবেন। আর আসমানকে গুটিয়ে তাঁর দক্ষিণ হস্তে নেবেন, এরপর এরশাদ করবেন, আমিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বাদশাহ, জমীনের রাজা বাদশারা কোথায়?

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে। কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক আসমান গুলোকে গুটিয়ে ডান হাতে নিয়ে এরশাদ করবেন, আজ কোথায় সেই শক্তিশালী লোকেরা? কোথায় অহংকারী লোকেরা? এরপর জমীন গুলোকে গুটিয়ে বাঁ হাতে নিয়ে এরশাদ করবেন, আমি-ই বাদশাহ, শক্তিশালী লোকেরা কোথায়? অহংকারীরা কোথায়?

আবুশ শেখ হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন আসমান জমীনকে আল্লাহ পাক তাঁর কুদরতী হাতের মুঠোয় নিয়ে নেবেন। এরপর এরশাদ করবেন, আমি-ই আল্লাহ, আমি-ই রহমান, আমি বাদশাহ, আমি সকল দোষ ত্রুটি থেকে পবিত্র। আমি-ই নিরাপত্তা দানকারী, আমি-ই অভিভাবক, আমি-ই বিজয়ী, আমি-ই পরম শক্তিশালী, আমি-ই শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী, আমি-ই পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছি, যখন তার কোন অস্তিত্বই ছিলনা। আর আমি-ই পুনর্জীবন দান করেছি। আজ বাদশারা কোথায়? বড় বড় শক্তিশালী লোকেরা কোথায়?

এবনে আবি হাতেম হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ইহুদীরা সর্ব প্রথম পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের সৃষ্টি সমূহকে গণনা করেছে। এরপর আসমান জমীন ও ফেরেশতাগণের সৃষ্টি সম্পর্কে গবেষণা করেছে।

১। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৯৩২

এরপর তারা স্বয়ং আল্লাহ পাক সম্পর্কে কথাবার্তা শুরু করেছে, তখন আলোচ্য আয়াত وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ নাযিল হয়েছে।

সায়ীদ এবনে যোবায়ের (রঃ) বলেছেন, ইহুদীরা আল্লাহ পাকের গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা করেছে এবং এমন সব কথা বলেছে, যার জ্ঞান তাদের ছিলনা। তখন এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

এবনুল মুনজের রবী এবনে আনাসের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যখন وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ নাযিল হয় তখন সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! যখন কুরসীই এত বিরাট, বিশাল এবং বিস্তৃত তখন আরশের কী অবস্থা? এ প্রশ্নের জবাবেই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াত وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ নাযিল করেছেন।[১]

سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

তিনি পবিত্র এবং তিনি তাদের বর্ণিত শরীকদের বহু উর্দ্ধে।

অর্থাৎ কাফের মুশরেকরা আল্লাহ পাকের সঙ্গে শেরকের যে কথা বলে, তা থেকে তিনি পবিত্র। তাদের এহেন ভ্রান্ত ধারণা থেকে তিনি অনেক উর্দ্ধে।

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ
اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ۭ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ۝۶۸
وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِايْٓءَ بِالنَّبِيّٖنَ
وَالشُّهَدَاۗءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝۶۹ وَوُفِّيَتْ
كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ۝۷۰

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-২০০-০১
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৪ পৃষ্ঠা-১৬
তফসীরে তাবারী খন্ড-২৪, পৃষ্ঠা-১৮-১৯
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৪, পৃষ্ঠা-২৬-২৭
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৬৮-৬৯

তরজমা

(৬৮) আর (কেয়ামতের দিনে) শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন আসমান সমূহের ও জমীনের অধিবাসীগণ বেহুশ হয়ে পড়বে। শুধুমাত্র আল্লাহ্ পাক যাকে চান সে বেহুশ হবেনা। এরপর পুনরায় শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। সঙ্গে সঙ্গে সকলে দাঁড়িয়ে যাবে এবং চতুর্দিকে দেখতে থাকবে।

(৬৯) আর জমীন তার প্রতিপালকের নূরে উদ্ভাসিত হবে, আমলনামা পেশ করা হবে, নবীগণকে ও সাক্ষীগণকে উপস্থিত করা হবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায় বিচার করা হবে এবং তাদের প্রতি কোন জুলুম করা হবেনা।

(৭০) প্রত্যেককেই তার কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে, তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক সবিশেষ অবগত।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম কুদরত-হেকমতের কথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, সমগ্র পৃথিবী আল্লাহ্ পাকের হাতের মুঠোয় রয়েছে, আর আসমান গুলোকে কেয়ামতের দিন তিনি গুটিয়ে নেবেন।

যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে

আর এ আয়াতেও আল্লাহ্ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষ কুদরতের কথা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিনের পূর্ব মুহূর্তে শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, আর ঐ সর্বগ্রাসী ফুঁক এত ভয়াবহ হবে যে আসমান জমীনের সমস্ত অধিবাসী সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়বে, জীবিতরা তখন মৃত্যুমুখে পতিত হবে, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ

'আর শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন আসমান সমূহের ও জমীনের অধিবাসীগণ বেহুশ হয়ে পড়বে'।

اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ

'শুধুমাত্র আল্লাহ্ পাক যাকে চান, সে বেহুশ হবেনা'।

বর্ণিত আছে, যারা সংজ্ঞাহীন হবেন না তারা হলেন জীব্রাঈল (আঃ), মিকাঈল (আঃ), ইস্রাফিল (আঃ) এবং আজরাঈল (আঃ)।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আল্লাহ পাকের আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণও সংজ্ঞাহীন হবেন না।

কারো কারো মতে, নবী রসূলগণ এবং শহীদগণও সংজ্ঞাহীন হবেন না।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, শিংগায় ফুঁক দেয়া হলে আসমান জমীনের সকল অধিবাসীর মৃত্যু হবে, শুধু জীব্রাঈল, মিকাঈল, ইসরাফীল এবং আজরাঈলের মৃত্যু হবেনা। এরপর আল্লাহ পাক মিকাঈল ও ইস্রাফীলকে মৃত্যুমুখে পতিত করবেন, এরপর জীব্রাঈলের মৃত্যু হবে, আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে, জান্নাতের হুরগণ, আরশ এবং কুরসীর অধিবাসীগণের সংজ্ঞাহীন হবার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হবে।

ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ

'এরপর পুনরায় শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, সঙ্গে সঙ্গে সকলে দাঁড়িয়ে যাবে এবং চতুর্দিকে দেখতে থাকবে'।

বোখারী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দ্বিতীয়বার যখন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে তখন সকলে সংজ্ঞা ফিরে পাবে। আমিই সে ব্যক্তি, যে সর্ব প্রথম হুশ ফিরে পাবে, আমি তখন দেখব মুসা (আঃ) আল্লাহ পাকের আরশের খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে আছেন, আমি বলতে পারিনা যে, তিনি আমার পূর্বে চেতনা ফিরে পেয়েছেন নাকি তিনি বেহুশ হননি, কেননা কোহেতুরে আল্লাহ পাকের নূরের তাজাল্লী দেখে তিনি সংজ্ঞাহীন হয়েছিলেন, তাই আজকের সংজ্ঞালুপ্ততা থেকে তিনি অব্যাহতি পেয়েছেন।

এবনে মোবারক হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, দু'বার শিংগায় ফুঁক দেয়ার মাঝে চল্লিশ বছর অতিবাহিত হবে। প্রথমবার শিংগায় ফুঁক দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাক প্রাণী মাত্রকে মৃত্যুমুখে পতিত করবেন। আর দ্বিতীয় বার শিংগায় ফুঁক দিলে আল্লাহ পাক সকলকে জীবিত করবেন।

এবনুল মুনজের হযরত যাবের (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, শিংগায় ফুঁক দেয়া হলে আসমান জমীনের সকল অধিবাসী সংজ্ঞাহীন হয়ে যাবে। তবে আল্লাহ পাক যার সম্পর্কে ইচ্ছা করবেন, সে সংজ্ঞাহীন হবেনা। তিনি আরো বলেছেন, হযরত মুসা (আঃ) সেদিন সংজ্ঞাহীন হবেন না, কেননা ইতোপূর্বে তিনি সংজ্ঞাহীন হয়েছিলেন।

আবদ এবনে হোমায়েদ, এবনুল মুনজের একরামা (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যাদেরকে সেদিন সংজ্ঞা লুপ্ত হওয়া থেকে অব্যাহতি দেয়া হবে, তারা হলেন আল্লাহ পাকের আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ।

কাতাদা (রঃ)-এর মতে, শিংগায় ফুঁক দেয়ার দিন সকলেই সংজ্ঞাহীন হবে তবে যাকে আল্লাহ পাক অব্যাহতি দেন, আর কাকে আল্লাহ পাক অব্যাহতি দেবেন তা তিনিই জানেন।[১]

فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ

'সঙ্গে সঙ্গে সকলে দাঁড়িয়ে যাবে এবং সবিস্ময়ে কেয়ামতের দিনের অবস্থা লক্ষ্য করতে থাকবে'।

সকলেই কবর থেকে বের হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে এবং চতুর্দিকে দেখতে থাকবে। এর অর্থ হলো, সকলেই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবে যে, এরপর তাদের সঙ্গে কী ব্যবহার করা হবে অথবা তাদের প্রতি কী আদেশ দেয়া হবে?

তফসীরকারগণ বলেছেন, সমগ্র মানব জাতি ঐ পরিস্থিতিতে স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। অর্থাৎ গতি হারিয়ে সকলেই নিজ নিজ অবস্থানে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকবে। ভয়-ভীতি, বিস্ময়, অজানা ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা প্রতিটি মানুষকেই পেয়ে বসবে।[২]

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

'আর পৃথিবী তার প্রতিপালকের নূরে উদ্ভাসিত হবে, আমলনামা পেশ করা হবে, নবীগণকে ও সাক্ষীগণকে উপস্থিত করা হবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায় বিচার করা হবে, আর তাদের প্রতি কোন জুলুম করা হবেনা'।

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا

অর্থাৎ 'ময়দানে কেয়ামতের জমীন তার প্রতিপালকের নূরে উদ্ভাসিত হবে'।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, যখন আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদের মাঝে ফয়সালা করার জন্যে আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন যেভাবে আসমানে সূর্যকে দেখতে কোন সন্দেহ থাকতে পারেনা, ঠিক তেমনি আল্লাহ পাকের নূর দেখতেও কোন সন্দেহ থাকবেনা।

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৭০-৭১
২। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৩, পৃষ্ঠা-২৮

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের الارض শব্দ দ্বারা এ জমীনকে উদ্দেশ্য করা হয়নি, যাতে মানুষ এখন বসবাস করছে, বরং এটি হবে অন্য জমীন, যাকে আল্লাহ্ পাক কেয়ামতের দিনে সমগ্র বিশ্ববাসীকে একত্রিত করার জন্যে সৃষ্টি করবেন। আল্লাহ্ পাক যখন সেখানে তাঁর বন্দাদের মাঝে ফয়সালা করার জন্যে আত্মপ্রকাশ করবেন, তখন ঐ জমীন তাঁর নূরে আলোয় ঝলমল করে উঠবে।[১]

হযরত হাসান বসরী (রঃ) এবং সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের نُوْرِ رَبِّهَا শব্দটি দ্বারা আল্লাহ্ পাকের ন্যায় বিচারকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যেভাবে আলো আঁধারকে দূরীভূত করে দেয়, ঠিক তেমনি জুলুমের অন্ধকারকে দূরে সরিয়ে দেয় সুবিচারের আলো। এজন্যে সুবিচারকে 'নূর' আখ্যা দেয়া হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এটি হলো সেই নূর, যা আল্লাহ্ পাক সেদিনের জন্যে সৃষ্টি করবেন যেমন চন্দ্র-সূর্য সৃষ্টি করেছেন।[২]

وَوُضِعَ الْكِتٰبُ

'আর আমলনামা পেশ করা হবে'।

অর্থাৎ প্রত্যেকের হাতে তার যাবতীয় কর্মকান্ডের বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত আমলনামা প্রদান করা হবে।

বায়হাকী হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ সকল আমলনামা আল্লাহর আরশের নীচে রয়েছে। যখন সময় হবে অর্থাৎ কেয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশের জন্যে সমগ্র মানব জাতিকে এক ময়দানে একত্রিত করা হবে তখন আল্লাহ্ পাক একটি বাতাস প্রেরণ করবেন, যা আমলনামা গুলোকে উড়িয়ে আনবে এবং মানুষের ডান বা বাম হাতে পৌছাবে। এ আমলনামায় যে কথাটি সর্ব প্রথম লিপিবদ্ধ থাকবে তা হলোঃ

اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا

'পাঠ কর তোমার আমলনামা, তোমার হিসাবের জন্যে আজ তুমি নিজেই যথেষ্ট'।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২৭, পৃষ্ঠা-১৯
২। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৪, পৃষ্ঠা-২৯০
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-২০৩

وَجِاْئَ بِالنَّبِيّٖنَ

'নবীগণ ও স্বাক্ষীগণকে উপস্থিত করা হবে'।

আল্লামা সয়ুতি (রঃ) লিখেছেন, নবী রসূলগণের সম্মুখেই মানুষের হিসাব-নিকাশ হবে।

আবদুল্লাহ এবনে মোবারক সায়ীদ এবনুল মুসায়্যেব (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এমন কোন দিন যায় না, যেদিন সকাল সন্ধ্যায় হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্মুখে তাঁর উম্মতকে হাযির না করা হয়। তিনি তাদের আকৃতিগুলো এবং আমলগুলো দেখে চিনতে পারেন। এজন্যে কেয়ামতের দিন মানুষের সম্পর্কে তিনি স্বাক্ষ্য প্রদান করবেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) একথাও বলেছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উম্মত অন্য পয়গম্বরগণের পক্ষ থেকে স্বাক্ষ্য প্রদান করবে যে, তাঁরা তাদের উম্মতগণকে আল্লাহ পাকের মহান বাণী পৌঁছিয়ে ছিলেন।

তফসীরকার আতা (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে যে সাক্ষীগণের উল্লেখ রয়েছে, তারা হলেন আমলের বিবরণ লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাগণ। আর কেয়ামতের ময়দানে ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে ফয়সালা করা হবে, কারো প্রতি এতটুকু জুলুম করা হবে না।

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ

'প্রত্যেককেই তার কৃতকর্মের পূর্ণ ফল দেয়া হবে, তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ পাক সবিশেষ অবগত'।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক নিজেই সব কিছু দেখেন, সব কিছু জানেন, কারো খবর দেয়ার বা সাক্ষী রাখারও কোন প্রয়োজন নেই।

আতা (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ পাক বন্দাদের যাবতীয় কর্মকান্ড সম্পর্কে স্বয়ং সম্পূর্ণ অবগত। তাঁর জন্যে কোন লেখক বা সাক্ষীর আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। আমলনামা বা সাক্ষী কাফেরদের অপরাধ প্রমাণিত করার জন্যেই থাকবে।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-২০৪

কোন কোন তফসীরকার এ পর্যায়ে বলেছেন, মহান আল্লাহ পাকের আদালতে কারো সওয়াব কম হওয়া অথবা শাস্তি বেশী হওয়া সম্ভবই নয়; কেননা তিনি মহাজ্ঞানী, সকলের অবস্থা সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবগত এবং তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর ইচ্ছাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে এমন কেউ নেই কাজেই তিনি প্রত্যেককে তার প্রাপ্য দান করবেন, তাতে এতটুকু কম করা হবেনা।[১]

আর প্রত্যেকের সকল আমলের পূর্ণ এবং যোগ্য পুরস্কার প্রদান করা হবে। আর আল্লাহ পাক প্রত্যেকের ভাল-মন্দ আমল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত, কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই। পৃথিবীতে যে নেক আমল করে, তার পুরস্কার অবশ্যই সে পাবে আর মন্দ কাজের পরিণতি মন্দই হবে, তবে যাকে আল্লাহ পাক দয়া করে ক্ষমা করেন, তা হবে মহান দাতার দান।

وَسِيْقَ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ
اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ
يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ
هٰذَا ؕ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧١﴾
قِيْلَ ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى
الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٧٢﴾ وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ؕ
حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا
سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ﴿٧٣﴾ وَقَالُوا
الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ
نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ ۚ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿٧٤﴾

১। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৯৩৩

তরজমা

(৭১) আর কাফেরদেরকে দলে দলে দোযখের দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে, অবশেষে যখন তারা দোযখের নিকট উপস্থিত হবে তখন তার প্রবেশদ্বার খুলে দেয়া হবে এবং দোযখের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হতে কোন রসূল আগমন করেননি? যাঁরা তোমাদের সম্মুখে তোমাদের প্রতিপালকের আয়াত সমূহ পাঠ করতেন এবং এ দিনের সাক্ষাত সম্পর্কে সাবধান করতেন। তারা বলবে, হ্যাঁ, অবশ্যই আগমন করেছিলেন, কিন্তু আসলে কাফেরদের উপর শাস্তির কথা বাস্তবায়িত হয়েছে।

(৭২) তাদেরকে হুকুম করা হবে, দোযখের দ্বারে প্রবেশ কর, চিরকাল এখানেই থাকতে হবে, কত নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাসস্থল।

(৭৩) আর যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করতো, তাদেরকে বেহেশতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, অবশেষে যখন তারা বেহেশতের নিকট উপস্থিত হবে এবং বেহেশতের দ্বার খুলে দেয়া হবে এবং তাদেরকে বেহেশতের দ্বার রক্ষীরা বলবেন, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাক, জান্নাতে প্রবেশ কর চিরদিনের জন্যে।

(৭৪) এবং তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ পাকের জন্যে যিনি তাঁর কথা সত্যে পরিণত করেছেন এবং আমাদেরকে এ ধরণীর উত্তরাধিকারী করেছেন। আমরা জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা বসবাস করবো, নেককারদের পুরস্কার কত উত্তম!

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে কেয়ামতের দিনের অবস্থা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে, আর একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, প্রত্যেককে তার আমল অনুযায়ী বিনিময় প্রদান করা হবে। এ আয়াত থেকে প্রথমে কাফেরদের অবস্থা বর্ণিত হচ্ছে, এরপর নেককার মোমেনদের অবস্থা বর্ণিত হবে। পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে প্রত্যেকটি মানুষকে পরকালীন জীবন সম্পর্কে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কেননা কেয়ামত অবশ্যই আসবে, আমলের হিসাব অবশ্যই হবে, আল্লাহ পাকের মহান দরবারে কোন কিছুই গোপন নেই, তিনি প্রত্যেকটি মানুষের যাবতীয় কর্মকান্ড সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। তাই নাফরমানদেরকে শাস্তি দেয়া হবে এবং ঈমানদার ও নেককারগণকে পুরস্কৃত করা হবে। এ পর্যায়ে আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ؕ

'আর কাফেরদেরকে দলে দলে দোযখের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে'।

কাফেরদের ভয়াবহ পরিণতি

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতে সত্য-দ্রোহী, দূরাত্মা, ভাগ্যাহত কাফের মুশরেকদের ভয়াবহ পরিণতি ঘোষণা করা হয়েছে যে, যখন বিচার শেষ হবে তখন কাফেরদেরকে অত্যন্ত অপমানের সঙ্গে চতুঃষ্পদ জন্তুর মত দোযখের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। তারা তখন অত্যন্ত পিপাসাগ্রস্ত হবে। একটি বর্ণনায় রয়েছে তারা তখন মূক, বধির, অন্ধ থাকবে, তাদের স্থায়ী ঠিকানা হবে দোযখ। যখন দোযখের অগ্নি অপেক্ষাকৃত কম হবে তখন তা বাড়িয়ে দেয়া হবে।[১]

زمرا

অর্থাৎ দোজখীদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দোযখের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। পৃথিবীতে কাফেরদের মধ্যে প্রকারভেদ রয়েছে যেমন কেউ অগ্নিপূজক, কেউ মূর্তিপূজক, কেউ নাস্তিক, কেউ মুনাফেক, কেউ মুরতাদ। এ প্রকারভেদের কারণে কেয়ামতের দিনও তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হবে, আর প্রত্যেক প্রকার কাফেরের এক একটি দল হবে আর এভাবে প্রত্যেক দলকে হাঁকিয়ে দোযখে পৌঁছানো হবে, যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا

'কাফেরদের প্রত্যেক দল থেকে আমরা সে সব লোককে বেছে নেব যারা কুফরী ও নাফরমানীতে ছিল অত্যন্ত কঠোর'।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, বড় বড় কাফেরদের এক দল হবে, আর ছোটদের ভিন্ন দল হবে।

حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ؕ

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৪ পৃষ্ঠা-২০

'অবশেষে যখন তারা দোযখের নিকট উপস্থিত হবে তখন তার প্রবেশ দ্বার খুলে দেয়া হবে এবং দোযখের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হতে কোন রসূল আগমন করেননি? যারা তোমাদের সম্মুখে তোমাদের প্রতিপালকের আয়াত সমূহ পাঠ করতেন এবং এদিনের সাক্ষাত সম্পর্কে সাবধান করতেন'।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, দোযখের সাতটি প্রবেশ দ্বারই রুদ্ধ থাকবে, কাফেররা দোযখের কাছাকাছি হলে তাদের জন্যে তা খুলে দেয়া হবে।

দ্বিতীয়তঃ তাদের লজ্জা এবং অনুতাপ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে দোযখের রক্ষীরা তাদেরকে ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করবে যে, আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ ক্রমে তাঁর প্রেরিত কোন নবী রসূল কি তোমাদেরকে এদিন সম্পর্কে সাবধান করেননি?

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত দ্বারা একথা জানা যায় যে, দোযখের রক্ষীরা তাদেরকে ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের নিকট তো আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে নবী রসূল পৌঁছেছিলেন, তাঁরা আল্লাহ্ পাকের কালাম তোমাদেরকে শুনিয়েছিলেন, তবুও কেন শেরক বর্জন করনি? কেননা আল্লাহ্ পাকের বিধানের উপর আমল করার জন্যে আল্লাহ্ পাকের বিধান সম্পর্কে জ্ঞান থাকা একান্ত জরুরী, কিন্তু আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে বিবেক বুদ্ধিই যথেষ্ট, উপরন্তু আল্লাহ্ পাক নবী রসূলগণকেও প্রেরণ করেছেন, আসমানী গ্রন্থ সমূহ নাযিল করেছেন এবং সত্যকে সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছেন, এরপর শেরক ও কুফরের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকার কোন যুক্তি থাকেনা।

قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ

'তারা বলবে, হ্যাঁ, অবশ্যই আগমন করেছিলেন নবী রসূলগণ, কিন্তু আসলে কাফেরদের উপর শাস্তির কথা বাস্তবায়িত হয়েছে'।

অর্থাৎ তারা বলবে, পথ-প্রদর্শক নবী রসূলগণ আগমন করেছিলেন কিন্তু আমাদের কপাল মন্দ, আমরা তাঁদের কথা শুনেছি, মেনে চলিনি, তাই কাফেরদের ক্ষেত্রে আজাবের বিধান অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

قِيْلَ ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ

'তাদেকে হুকুম করা হবে, দোযখের দ্বারে প্রবেশ কর, চিরকাল তোমাদেরকে এখানেই থাকতে হবে, কত নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাসস্থল'!

অর্থাৎ যখন কাফেররা দোযখের প্রবেশ দ্বারে হাযির হবে, তখন তাদের প্রতি নির্দেশ হবে, তোমরা দোযখে প্রবশে কর। যারা অহংকারী, তাদের শাস্তি কত ভয়াবহ এবং তাদের ঠিকানা কত মন্দ!

এখানে একথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে, অথচ এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে অহংকারীদের আবাসস্থল কত মন্দ! এর তাৎপর্য হলো, কুফরী ও নাফরমানীর কারণেই দোযখের শাস্তি হবে আর কুফরী ও নাফরমানীর কারণের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে, কুফরী করা হয়েছে তাদের অহংকারের কারণে। কেননা এই কাফেররা তাদের অর্ন্তনিহিত দম্ভের কারণে নবী রসূলগণের আহবানে সাড়া দেয়নি, তাঁদের প্রতি ঈমান আনেনি এজন্যে তাদেরকে অপমানিত অবস্থায় দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। সেদিন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা দুনিয়ার জীবনে দম্ভ ও অহমিকা প্রকাশ করেছিলে, আল্লাহ্ পাকের বিধান অমান্য করেছিলে, তাঁর প্রেরিত নবী রসূলগণকে মিথ্যাজ্ঞান করেছিলে, আর তারই পরিণতি স্বরূপ চিরদিন দোযখের আযাব ভোগ করতে থাক।

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ط حَتّٰى اِذَا جَآءُوْهَا وَفُتِحَتْ
اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ

'আর যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করতো, তাদেরকে দলে দলে বেহেশতের দিকে নিয়ে আসা হবে। যখন তারা বেহেশতের নিকট উপস্থিত হবে এবং বেহেশতের দ্বার খুলে দেয়া হবে এবং তাদেরকে বেহেশতের দ্বার রক্ষীগণ বলবেন, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাক, জান্নাতে প্রবেশ কর চিরদিনের জন্যে'।

পূর্ববর্তী আয়াতে কেয়ামতের দিন দোযখীদের যে অবস্থা হবে তা বর্ণিত হয়েছে আর এ আয়াতে বেহেশতবাসীগণের অবস্থার বিবরণ স্থান পেয়েছে, যারা সেদিন ভাগ্যবান হবেন তাদেরও বহু দল হবে। আল্লাহ পাকের মহান দরবারে বিশেষভাবে নৈকট্য-ধন্য ভাগ্যবানদের দলকে সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে জান্নাতের প্রবেশ দ্বারে পৌছানো হবে, এরপর যাদের মর্তবা অপেক্ষাকৃত কম, তাদেরকে আনা হবে। নবীগণ এবং তাঁদের সাথীগণকে আনা হবে, সিদ্দিক এবং শহীদগণকে আনা হবে, ওলামায়ে কেরাম এবং তাঁদের সাথীগণকে আনা হবে। এভাবে একের পর এক জান্নাতী লোকদের দলকে পৌছানো হবে। জান্নাতের দ্বার প্রান্তে তাঁরা অপেক্ষা করবেন। এ মর্মে যে, সর্ব প্রথম কাকে অনুমতি দেয়া হয়?

মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমিই সর্ব প্রথম বেহেশতের দ্বারে করাঘাত করবো।

মসনদে আহমদে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমি যখন জান্নাতের দ্বারে করাঘাত করবো তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, আপনি কে? আমি বলবো, মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)। তখন সে বলবে, আমার প্রতি হুকুম হয়েছে আপনার আগমনের পূর্বে কারো জন্যে যেন আমি জান্নাতের দ্বার না খুলি।

মসনদে আহমদে সংকলিত হাদীসে আরো রয়েছে, সর্বপ্রথম যে দলটি জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা চৌদ্দ তারিখের চাঁদের ন্যায় হবে। তাদের থুথু, নাকের পানি, প্রস্রাব-পায়খানা কিছুই থাকবেনা, তাদের খাবার ও পান পাত্র এবং অন্যান্য আসবাবপত্র স্বর্ণ রোপ্যের হবে। তাদের ঘাম হবে কস্তুরীর। (আল হাদীস)

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমার উম্মতের একটি দল, যাদের সংখ্যা হবে ৭০ হাজার, প্রথমে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের চেহারা চৌদ্দ তারিখের চন্দ্রের ন্যায় চমকদার হবে।

একথা শ্রবণ করে হযরত আক্কাশা এবনে মোহসেন (রাঃ) আরজী পেশ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করুন যেন আল্লাহ পাক আমাকে এ দলের অন্তর্ভুক্ত করেন। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! তাকে এ দলের অন্তর্ভুক্ত কর। এরপর একজন আনসারী সাহাবী অনুরূপ দোয়া করার জন্যে আরজী পেশ করলেন। তখন তিনি এরশাদ করলেন, আক্কাশা তোমার পূর্বে সুযোগ নিয়ে ফেলেছে। এ ৭০ হাজার লোককে বিনা হিসাবে জান্নাতে যাওয়ার কথা আরো বহু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমার উম্মতের মধ্যে ৭০ হাজার অথবা ৭০০শ' একসঙ্গে জান্নাতে যাবে। একজন আরেকজনের হাত ধরে রাখবে, সকলে এক সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের চেহারা চৌদ্দ তারিখের চন্দ্রের ন্যায় হবে।

এবনে আবি শায়বায় রয়েছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমার প্রতিপালক এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, আমার উম্মতের মধ্যে ৭০ হাজার ব্যক্তি জান্নাতে যাবে। আর প্রত্যেক হাজারের সঙ্গে আরো ৭০ হাজার ব্যক্তি

জান্নাতে যাবে। তাদের নিকট থেকে কোন হিসাব নেয়া হবেনা এবং তাদের কোন শাস্তিও হবেনা।[১]

মসনদে আহমদে সংকলিত অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, যে ব্যক্তি তার ধন-সম্পদের জোড়া আল্লাহর রাহে ব্যয় করে (অর্থাৎ একই বস্তু দু'টি দান করবে) তাকে জান্নাতের সকল দ্বার থেকে ডাকা হবে। জান্নাতের কয়েকটি দ্বার রয়েছে, নামাজীকে 'বাবুস সালাত' থেকে এবং দানবীর ব্যক্তিকে 'বাবুস সদাকাত' থেকে, মুজাহেদ ব্যক্তিকে 'বাবুল জেহাদ' থেকে আর রোজাদারকে 'বাবুর রাইয়ান' থেকে ডাকা হবে। একথা শ্রবণ করে হযরত আবু বকর (রাঃ) প্রশ্ন করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! যদিও প্রয়োজন নেই যে, প্রত্যেক দ্বার থেকে কাউকে ডাকা হোক কিন্তু এমন কেউ কি থাকবে, যাকে প্রত্যেক দ্বার থেকে ডাকা হবে। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন হ্যা, (তা হবে) আর আমি আশা করি যে আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত।[২]

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত আরেকখানি হাদীসে রয়েছে, জান্নাতের আটটি দ্বার থাকবে, তন্মধ্যে একটির নাম হলো 'বাবুর রাইয়ান' তাতে শুধু রোজাদাররাই থাকবে।

মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সঠিকভাবে অজু করে পাঠ করবে, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মোহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু, তার জন্যে বেহেশতের আটটি দ্বার খুলে যাবে, যে দ্বার দিয়ে ইচ্ছা সে প্রবেশ করতে পারবে।[৩]

হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, যখন জান্নাতবাসীগণকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, জান্নাতের প্রবেশ দ্বারের কাছে তারা একটি বৃক্ষ দেখতে পাবে, যার নীচ থেকে দু'টি ঝর্ণা প্রবাহিত হবে। একটি ঝর্ণায় মোমেন ব্যক্তি গোসল করবে, ফলে তার দেহের বর্হিভাগ পবিত্র হয়ে যাবে, আর দ্বিতীয় ঝর্ণার পানি সে পান করবে ফলে সে অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা লাভ করবে। ফেরেশতাগণ জান্নাতের দ্বার প্রান্তে তাদের সম্বর্ধনা জানিয়ে বলবে,

سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২৪, পৃষ্ঠা-২২
২। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৬ পৃষ্ঠা-১০৭
৩। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৪ পৃষ্ঠা-২২

'তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাক, জান্নাতে প্রবেশ কর চিরদিনের জন্যে'।

জুযাজ (রঃ) বলেছেন, طبتم শব্দটির অর্থ হলো, তোমরা দুনিয়াতে শেরক এবং পাপাচার থেকে পবিত্র ছিলে, তাই এ পবিত্র স্থানেও তোমরা আনন্দিত থাক।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, তোমাদের এ স্থানটি পবিত্র।

فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ

'অতএব, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর'।

অর্থাৎ যেহেতু তোমরা শেরক, কুফর এবং যাবতীয় নাফরমানী থেকে নিজেকে পবিত্র রেখেছ অতএব, পবিত্রতম স্থান জান্নাতে প্রবেশ কর, আর জান্নাতে তোমাদের অবস্থান সাময়িক নয়; বরং চিরস্থায়ী হবে। অতএব, এ বাক্য দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, নাফরমানী ও পাপাচার থেকে পবিত্রতা অর্জনই জান্নাতে প্রবেশের চাবিকাঠি হবে।

এ পর্যায়ে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর একটি উক্তির উল্লেখও অপ্রাসঙ্গিক হবেনা যার মর্ম হলো, যেহেতু জান্নাত পবিত্র স্থান তাই জান্নাতবাসীগণের আবাসস্থল হিসেবে তা নির্বাচিত হয়েছে যেমন কাফেরদের কুফরী ও নাফরমানীর অপবিত্রতার জন্যে তারা দোযখে অবস্থানের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে।

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ ج

'এবং তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ পাকের জন্যে, যিনি তাঁর কথা সত্যে পরিণত করেছেন এবং আমাদের এই ধরণীর (বেহেশতের) উত্তরাধিকারী করেছেন, আমরা জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা বসবাস করবো'।

অর্থাৎ জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে প্রবেশ করার পর আল্লাহ পাকের মহান দরবারে শোকর আদায় করে বলবেন যে, তিনি তাঁর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিকে অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত করেছেন, আমাদেরকে জান্নাত-ভূমির অধিকারী করেছেন, আমরা যেখানে ইচ্ছা বসবাস করতে পারি, অর্থাৎ আমাদের জন্যে জান্নাতে এমন বিশাল বিস্তৃত স্থান দান করা হয়েছে যে, আমরা যেখানে ইচ্ছা সেখানে বসবাস করতে পারি। নবী রসূলগণের সঙ্গে মোলাকাত করার আকাঙ্ক্ষা হলে তারও ব্যবস্থা হতে পারে।

তেবরানী, আবু নায়ীম হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, এক ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে আরজ করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আপনি আমার পরিবারবর্গ এমনকি, আমার প্রাণের চেয়েও বেশী প্রিয়, আমি যখন বাড়ীতে থাকি, তখন আপনার কথা আমার মনে হয়, আমি আপনার খেদমতে হাযির হই, যতক্ষণ আপনার দীদার নসীব না হয় ততক্ষণ আমি শান্তি পাইনা, কিন্তু যখন আমার মৃত্যু এবং আপনার ওফাতের কথা মনে হয়, আর একথা সর্বজন-বিদিত যে, আপনি জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থান করবেন, তখন যদি জান্নাতে আপনার দীদার নসীব না হয়, তখন আমার অবস্থা কী হবে? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন নীরব রইলেন, একটু পরই জীব্রাঈল (আঃ) নিম্নোক্ত আয়াত নিয়ে অবতরণ করলেনঃ

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ

'আর যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি অনুগত হবে, তাদের হাশর হবে সে সব লোকদের সঙ্গে, যাদের প্রতি আল্লাহ পাক নেয়ামত দান করেছেন, নবীগণ সিদ্দিকগণ এবং নেককারগণ আর তারা হবেন কত উত্তম সাথী'!

তফসীরকারগণ বলেছেন, যদিও জান্নাতীগণ যেখানে খুশী সেখানে বাস করতে পারবে, কিন্তু প্রত্যেকেই তার জন্যে নির্ধারিত স্থানে বাস করবে।

বস্তুতঃ জান্নাতে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে তার ঈমান, একীন, তাকওয়া-পরহেযগারী, এবাদত বন্দেগী এবং আল্লাহ পাকের সাথে তার নৈকট্যের ভিত্তিতে স্থান নির্ধারিত হবে আর প্রত্যেক ব্যক্তি তার অর্জিত নেয়ামতের জন্যে অত্যন্ত সুখী থাকবে।[১]

فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ

'নেককারগণের পুরস্কার কত উত্তম'।

অর্থাৎ যারা দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে কাজ করবে, আল্লাহ পাক তাদেরকে আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীকে অতি উত্তম পুরস্কার দান করবেন।

১। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৯৩৪

وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۚ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٥﴾

তরজমা

(৭৫) আর (হে রসূল!) আপনি ফেরেশতাদেরকে দেখবেন তারা আরশের চারদিকে চক্রাকারে অবস্থান করবে, স্বীয় প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করবে ও প্রশংসা করতে থাকবে এবং বন্দাগণের মধ্যে ন্যায্যভাবে ফয়সালা করে দেয়া হবে। আর একথা বলা হবে, সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্ পাকের জন্যে।

তফসীরুল কোরআন

কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক যখন বিচারের জন্যে আত্মপ্রকাশ করবেন, তখনকার অবস্থা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছে, হে নবী! আপনি দেখবেন, ফেরেশতারা তখন আরশের চারদিকে কাতারবন্দী হয়ে আল্লাহ্ পাকের পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকবে, তাঁর শানে হামদ পেশ করতে থাকবে, আল্লাহ্ পাক তখন বন্দাগণের মধ্যে ইনসাফ ভিত্তিক ফয়সালা করবেন। তখন চারদিক থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে রব উঠবে তা হলো "আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন"। অর্থাৎ বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্ পাকের জন্যেই সমস্ত প্রশংসা।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, ফেরেশতাগণ যে তসবীহ-তাহলীল করবেন তা এবাদতের জন্যে নয়; বরং তখন এবাদতের আদেশ উঠে যাবে। এ তসবীহ-তাহলীল দ্বারা ফেরেশতাগণ তখন আত্মিক স্বাদ লাভ করবেন।

وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

আল্লাহ্ পাক সেদিন সুবিচার কায়েম করবেন, অর্থাৎ মোমেনগণকে জান্নাতে এবং কাফেরদেরকে দোযখে প্রবেশ করার হুকুম দেয়া হবে। আর যখন মোমেনগণ বেহেশতে প্রবেশ করবে তখন তারা আল্লাহ্ পাকের শোকর আদায় করে পড়বে, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক রাত্রে সূরা বনী ইসরাঈল এবং সূরা যুমার পাঠ করতেন।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-২০৮-০৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

সূরা মোমেন

سُوْرَةُ الْمُؤْمِنِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ خَمْسٌ وَّثَمَانُوْنَ اٰيَةً وَّتِسْعُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○
حٰمٓ (١) تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ (٢) غَافِرِ الذَّنْبِ
وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ
اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ (٣) مَا يُجَادِلُ فِىْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا
يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِى الْبِلَادِ (٤) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّ
الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۪ وَهَمَّتْ كُلُّ اُمَّةٍۭ بِرَسُوْلِهِمْ
لِيَاْخُذُوْهُ وَجٰدَلُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ فَاَخَذْتُهُمْ
فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ (٥) وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ
كَفَرُوْٓا اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ (٦) اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ
حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ
لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ
لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ (٧)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় আল্লাহ্ পাকের নামে

তরজমা

(১) হা-মীম।

(২) এই মহান গ্রন্থ পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে নাযিল হয়েছে।

(৩) যিনি গুনাহ্ মাফ করেন, যিনি তওবা কবুল করেন, যিনি শাস্তি প্রদানে অত্যন্ত কঠিন, শক্তিশালী, তিনি ব্যতীত এবাদতের যোগ্য কেউ নেই, তাঁরই নিকট সকলকে ফিরে যেতে হবে।

(৪) শুধুমাত্র কাফেররাই আল্লাহ্ পাকের নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, অতএব (হে রসূল!) দেশ-বিদেশে তাদের অবাধ বিচরণ আপনাকে যেন ধোকায় না ফেলে।

(৫) এদের পূর্বে নূহের জাতি এবং তাদের পর আরও অনেক সম্প্রদায় সত্যকে মিথ্যাজ্ঞান করেছিল, প্রত্যেক উম্মতই তাদের নিকট প্রেরিত রসূলকে আবদ্ধ করার চক্রান্ত করেছিল এবং তারা মিথ্যা কলহে লিপ্ত হয়েছিল যেন সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়, এরপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম, কেমন হয়েছিল আমার শাস্তি!

(৬) আর এভাবে কাফেরদের ক্ষেত্রে (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালকের বাণী সত্য প্রমাণিত হল যে, নিশ্চয় তারা দোযখের অধিবাসী।

(৭) যারা আল্লাহর আরশ বহন করে এবং যারা তার চারিপার্শ্বে রয়েছে, তারা সকলেই তাদের প্রতিপালকের পবিত্র মহিমা ঘোষণা করে থাকে এবং তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখে, আর তারা মোমেনদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার রহমত এবং তোমার জ্ঞান সব কিছুতেই বিস্তৃত রয়েছে অতএব, যারা তওবা করে এবং যারা তোমার পথে চলে তাদেরকে মাগফেরাত দান করো এবং তাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করো'।

সূরা মোমেন প্রসঙ্গে

এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত ঃ ৮৫, রুকু-৯, বাক্য ১১৯৯, অক্ষর ঃ ৪৯৬০।

নামকরণ

এ সূরাকে 'সূরা গাফের' এবং 'সূরাতুত তাওল'ও বলা হয়। ইমাম কুরতুবী (রঃ) লিখেছেন, এ সূরা সম্পূর্ণ মক্কা শরীফেই নাযিল হয়েছে। আর তফসীরকার আতা ও একরামা (রঃ)-ও এ মতই পোষণ করেছেন। আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) বায়হাকীর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, সাতটি সূরা 'হা-মীম' শব্দ দ্বারা শুরু করা হয়েছে এর প্রত্যেকটি মক্কায় নাযিল হয়েছে।

এ সূরার ফজিলত

বায়হাকী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি এরশাদ করেছেন, আলে হামীম (অর্থাৎ যে সূরা সমূহ হা-মীম শব্দ দ্বারা শুরু করা হয়েছে) সাতটি আর দোযখের দরজাও সাতটি, যারা এ হা-মীম বিশিষ্ট সূরা তেলাওয়াত করবে, এর প্রত্যেকটি দোযখের দরজা থেকে হা-মীম তাকে রক্ষাকারীর ভূমিকা পালন করবে।[১]

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, প্রত্যেক জিনিষেরই মগজ থাকে, পবিত্র কোরআনের মগজ হলো হা-মীম বিশিষ্ট সূরা সমূহ।

আর হাকেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, হা-সীম বিশিষ্ট সূরা গুলো পবিত্র কোরআনের সৌন্দর্য।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, হা-মীম আল্লাহ পাকের নাম সমূহের অন্যতম।[২]

ইমাম তবরী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে হা-মীম হল আল্লাহ পাকের অন্যতম মোবারক নাম, আল্লাহ পাক এর দ্বারা শপথ করেছেন। সুদ্দী (রঃ)-ও একথাই বলেছেন আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এটি হল পবিত্র কোরআনের অন্যতম নাম। ইমাম কাতাদা (রঃ)-ও একথাই বলেছেন।[৩]

১। তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা-৩৯২
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৭৮
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৬ পৃষ্ঠা-১০৯
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৪ পৃষ্ঠা-২৪
৩। তফসীরে তাবারী পারা-২৪, পৃষ্ঠা-২৬

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরা যুমারের প্রারম্ভে ওহীর সত্যতা তথা পবিত্র কোরআনের সত্যতার বর্ণনা ছিল। আর সূরা যুমারের পরিসমাপ্তিতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাক তাঁর বন্দাদের মধ্যে কেয়ামতের দিন ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে ফয়সালা করবেন। এভাবে আল্লাহ্ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম এবং গুণাবলী পূর্ববর্তী সূরার শেষাংশে বর্ণিত হয়েছে আর এ সূরায়ও আল্লাহ্ পাকের এমনি গুণাবলীর বর্ণনা দ্বারা শুরু করা হয়েছে। যেমন তিনি عزيز (পরাক্রমশালী), তিনি عليم (মহাজ্ঞানী), তিনি غَافِرِ الذَّنْبِ (তিনি মানুষের গুনাহ্ মাফ করেন), তিনি তওবা কবুল করেন, তিনি অবাধ্য বিদ্রোহীদের কঠিন কঠোর শাস্তি প্রদান করেন, তিনি অনন্ত অসীম ক্ষমতাবান, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই, তিনি একমাত্র উপাস্য, সমগ্র মানব জাতিকে অবশেষে তাঁর নিকটই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

তফসীরুল কোরআন

حٰمٓ

হা-মীম। এগুলো 'হরফে মোকাত্তায়াতে'র অন্তর্ভুক্ত (এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে)। হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) 'হা-মীমে'র তিনটি ব্যাখ্যা করেছেন (১) এটি আল্লাহ্ পাকের এসমে আজম। (২) এটি শপথের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (৩) 'আর রহমান' শব্দকে সংক্ষিপ্ত করে 'হা-মীম' বলা হয়েছে। অভিধাণ বিশেষজ্ঞ জুযাজও এ মতই পোষণ করতেন।

তফসীরকার সায়ীদ এবনে যোবায়ের (রঃ) এবং আতা খোরাসানী (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ পাকের পবিত্র নাম সমূহ হাকীম, হামীদ, হাইয়্যুন, হান্নান থেকে 'হা' গ্রহণ করা হয়েছে। আর মালিক, মজীদ এবং মান্নান এই পবিত্র নাম সমূহ থেকে 'মীম' গ্রহণ করা হয়েছে এবং এভাবে 'হা-মীম' হয়েছে।

ইমাম কেসায়ী (রঃ) বলেছেন, হা-মীম অর্থ হলো যা কিছু হবার তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। তাঁর মতে, হা-মীম অর্থ হলো 'হোম্মা'।[১]

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ

১। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৯৩৫
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-২১০

এ মহান গ্রন্থ পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী আল্লাহ পাকের তরফ থেকে নাযিল হয়েছে।

অর্থাৎ পবিত্র কোরআন কোন মানব রচিত গ্রন্থ নয়; বরং একমাত্র সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, মহাজ্ঞানী আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ গ্রন্থ। এতে কোন সৃষ্টির হাত নেই, এর সব কিছুই মহান স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকেরই, এজন্যে তিনি এর হেফাজত করছেন, যুগের আবর্তন-বিবর্তনে তাতে কোন পরিবর্তন হয়না।

الْعَزِيْزِ

যিনি পরাক্রমশালী, যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তাঁর তরফ থেকে পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

الْعَلِيْمِ

যিনি মহাজ্ঞানী, যাঁর নিকট কোন কিছু গোপন নেই।

غَافِرِ الذَّنْبِ

যিনি ভুল-ত্রুটি এবং গুনাহ মাফ করেন।

وَقَابِلِ التَّوْبِ

যিনি তওবা কবুল করেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ বাক্যগুলোর তফসীরে বলেছেন, যে ব্যক্তি কলেমায়ে তৈয়্যেবা পাঠ করে এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে, আল্লাহ পাক তার গুনাহ মাফ করে দেন। এমনিভাবে কলেমায়ে তৈয়্যেবায় বিশ্বাস স্থাপনকারীর তওবা কবুল করেন। আল্লাহ পাকের এ দু'টি বৈশিষ্ট্যের জন্যে বিশেষ কোন যুগ নির্দিষ্ট নেই, যে বা যারা, যখন যেখানে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তওবা করে, সঠিক তওবা হলে আল্লাহ পাক তা কবুল করেন। এটি মহান আল্লাহ পাকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কেউ কেউ মনে করে, গুনাহ মাফ করা এবং তওবা কবুল করা একই বস্তু, প্রকৃতপক্ষে তা নয়; বরং দু'টি বিষয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। যে ব্যক্তি মোমেন হওয়া সত্ত্বেও কৃত গুনাহের জন্যে তওবা না করে আর এ অবস্থায় তার মৃত্যু হয় তবে আল্লাহ পাক তার জন্যে غَافِرِ الذَّنْبِ। অর্থাৎ আল্লাহ পাক তার গুনাহ সমূহ মাফ করে দেবেন, কেননা আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন তার গুনাহ সমূহের উপর পর্দা রেখে দেবেন। ঐ ব্যক্তির গুনাহ সমূহ মানুষের দৃষ্টির আড়ালে রাখবেন। আর غفر শব্দটির আভিধাণিক অর্থ হলো পর্দায় ঢেকে রাখা, কোন কিছু গোপন রাখা। আর যে তওবা

করলো, আল্লাহ পাক তার তওবা কবুল করবেন আর যে গুনাহ থেকে তওবা করে সে নিঃস্পাপ নিঃস্কলংক হয়ে যায়।

এবনে মাজায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। এবনে নাজ্জার হযরত আলীর (রাঃ) সূত্রে আর এবনে আসাকের এবং বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ এনে আব্বাস (রাঃ) থেকে এই হাদীস সংকলন করেছেন।

পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার প্রতিক্রিয়া

এজিদ এবনে আসেম বর্ণনা করেন, হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফত কালে সিরিয়াবাসী এক ব্যক্তি বড় বীরপুরুষ ছিল। তাঁর বীরত্বের কারণে হযরত ওমর (রাঃ) তাঁকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। কিছু দিন পর লোকটি নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর সম্পর্কে লোকজনকে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁকে বলা হলো, লোকটি মন্দকাজে লিপ্ত হয়েছে এমনকি, মদ্যপায়ী হয়ে গেছে। তখন হযরত ওমর (রাঃ) তাঁকে একটি চিঠি লিখলেন এভাবে, ওমর এবনে খাত্তাবের (রাঃ) তরফ থেকে অমুকের নামেঃ

'আমি তোমার সম্মুখে আল্লাহ পাকের হামদ বর্ণনা করি, যিনি ব্যতীত কেউ এবাদতের যোগ্য নেই'। এরপর আলোচ্য আয়াত লিখে দিলেনঃ

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ ط لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

(যিনি গুনাহ মাফ করেন, যিনি তওবা কবুল করেন, যিনি (অবাধ্য লোকদেরকে) কঠোর শাস্তি প্রদান করেন, যিনি পরম শক্তিশালী, এক আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, তাঁর নিকটই সকলকে ফিরে যেতে হবে।)

এরপর হযরত ওমর (রাঃ) ঐ ব্যক্তির হেদায়েতের জন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করেন এবং অন্যদেরকেও দোয়া করতে বলেন, আল্লাহ পাক যেন তাঁকে তওবার তৌফিক দান করেন আর তাঁর তওবা যেন আল্লাহ পাক কবুল করেন।

যথাসময়ে হযরত ওমর (রাঃ)–এর চিঠি তাঁর নিকট পৌঁছে এবং সে এভাবে চিঠি পাঠ করতে থাকে, غَافِرِ الذَّنْبِ। আল্লাহ পাক আমাকে কথা দিয়েছেন যে, তিনি আমাকে মাফ করবেন, قَابِلِ التَّوْبِ। আর তিনি আমার তওবা কবুল করবেন। شَدِيْدِ الْعِقَابِ। আল্লাহ পাক আমাকে তাঁর আযাবের ভয় প্রদর্শন করেছেন, ذى الطول। তিনি

পরম শক্তিশালী, তাঁর ইচ্ছাকে কেউ বাধা দিতে পারেনা আর অবশেষে সকলকে তাঁর নিকটই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তিনি চিঠিটি বারংবার পাঠ করেন এবং ক্রন্দণ করেন, অবশেষে তিনি তওবা করেন।

ঐ ব্যক্তির তওবা করার সংবাদ যখন হযরত ওমর (রাঃ)-কে দেয়া হলো তখন তিনি বললেন, তোমরাও তাই কর অর্থাৎ তওবা কর, আর যখন দেখ কেউ সঠিক পথ থেকে সরে যাচ্ছে তখন তাকে সঠিক পথে রাখার চেষ্টা কর, তাকে বিনম্র ভাষায় বোঝাও আর আল্লাহ পাকের মহান দরবারে দোয়া কর, যেন আল্লাহ পাক তাকে তওবা করার তওফিক দান করেন এবং কোন অবস্থাতেই তোমরা শয়তানের সাহায্যকারী হয়োনা।

কাতাদা (রঃ) বলেছেন, মদীনা মোনাওয়্যারায় একজন যুবক ছিল অত্যন্ত এবাদত গুজার। হযরত ওমর (রাঃ) তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। ঘটনাক্রমে কিছুদিন পর সে মিশর চলে যায়। সেখানে গিয়ে তার অবস্থার পরিবর্তন হয়, সে মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। হযরত ওমর (রাঃ) তার সম্পর্কে খোঁজ নিলে তাঁকে বলা হয়, সে এখন মন্দ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। হযরত ওমর (রাঃ) তার নিকট একটি পত্র প্রেরণ করলেন এভাবে, ওমরের তরফ থেকে অমুক ব্যক্তির নামে। এরপর আলোচ্য আয়াত লিখে দিলেন। ঐ যুবক পত্র পেয়ে বারে বারে তা পাঠ করলো, অবশেষে সে তওবা করলো।[১]

شَدِيْدِ الْعِقَابِ

অর্থাৎ যারা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস করেনা, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতকে অস্বীকার করে আল্লাহ পাক তাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদানকারী।

বস্তুতঃ আল্লাহ পাকের নেয়ামত যেমন অনন্ত অসীম ঠিক তেমনি তাঁর ক্ষমতাও অনন্ত অসীম, আর যারা তাঁর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়ে জীবন যাপন করে তাদের শাস্তিও হবে অত্যন্ত কঠিন কঠোর এবং সকলকে অবশেষে তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে, জীবনের যাবতীয় কৃতকর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-২১২
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৪ পৃষ্ঠা-২৭

অতএব, সময় থাকতে সতর্ক হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ এবং জীবন থাকতেই মৃত্যু-পরবর্তী সময়ের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করা কর্তব্য, তথা দুনিয়ায় থাকতে আখেরাতের সম্বল সংগ্রহ করা বাস্তববাদী মানুষের একান্ত করণীয়।

مَا يُجَادِلُ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

'শুধুমাত্র কাফেররাই আল্লাহ্ পাকের আয়াত সমূহ সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়। অতএব, (হে রসূল!) দেশ বিদেশে তাদের অবাধ বিচরণ আপনাকে যেন ধোকায় না ফেলে'।

সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হবার পর তা অমান্য করা বা তাতে ত্রুটি-বিচ্যুতির অনুসন্ধান করা কাফেরদেরই কাজ। আল্লাহ্ পাকের কোন কথায় বা কোন নির্দেশের ক্ষেত্রে কোন প্রকার বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার আদৌ কোন অবকাশ নেই শুধু কাফেররাই এমন ধৃষ্টতা দেখায়, তাই এরশাদ হয়েছে ঃ

مَا يُجَادِلُ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহকে মিথ্যা জ্ঞান করা, তাকে প্রতিরোধ করা অথবা আল্লাহ্ পাকের আয়াত সমূহে কোন প্রকার ত্রুটির অনুসন্ধান করা এবং আয়াত সমূহ সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া সম্পূর্ণ গর্হিত কাজ। কেবল কাফেররাই এমন গর্হিত কাজ করে থাকে।

আমর এবনে শোয়ায়েবের পিতামহ থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কিছু লোককে বিতর্কে লিপ্ত দেখলেন তখন তিনি এরশাদ করেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা এজন্যে ধ্বংস হয়েছে যে তারা আল্লাহর কিতাবের কিছু অংশকে অন্য অংশের বিরোধিতায় ব্যবহার করতো অথচ পবিত্র কোরআনের এক অংশ আরেক অংশের সত্যায়ন করে। অতএব, তোমরা আল্লাহর কালামের এক অংশ দ্বারা অন্য অংশকে মিথ্যাজ্ঞান করোনা, যদি তোমরা কিছু জান তবে বল আর যদি না জান তবে যে জানে তার উপর দায়িত্ব দাও।

মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে ওমর (রাঃ) একদিন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে দুপুর বেলায় হাযির হলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম লক্ষ্য করলেন, দু' ব্যক্তি একটি আয়াতের ব্যাখ্যা নিয়ে মতবিরোধ করছে তখন তিনি আমাদের দিকে তশরিফ আনলেন, চেহারা মোবারকে তখন ক্রোধের ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল। তিনি এরশাদ করলেনঃ তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা আসমানী কিতাব সম্পর্কে মতবিরোধ করায় ধ্বংস হয়েছে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কোরআনে করীমের ব্যাপারে ঝগড়া করা কুফর। বায়হাকী 'শোয়াবুল ঈমানে' এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ এবং হাকেমও হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত এই হাদীস সংকলন করেছেন।

আল্লামা বয়যাভী (রঃ) লিখেছেন, আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, পবিত্র কোরআন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, এরপর কোরআনে করীমের ব্যাপারে বিতর্ক করার অর্থ হলো, সত্যকে বাতিলের মাধ্যমে দুর্বল করা আর যারা সত্যকে পরাজিত করে বাতিলকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তাদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকেনা। এজন্যে এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছেঃ

مَا يُجَادِلُ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

'কাফের ব্যতীত আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহ সম্পর্কে কেউ ঝগড়া করেনা'।

فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِى الْبِلَادِ

'অতএব, (হে রসূল!) দেশ-বিদেশে কাফেরদের অবাধ বিচরণ আপনাকে যেন ধোকায় না ফেলে'।

অর্থাৎ যারা কাফের যারা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস করেনা, তাঁর প্রেরিত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মানেনা, তারা আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ এমনকি, অভিশপ্ত তবুও তাদের জাগতিক উন্নতি অব্যাহত রয়েছে, তারা দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করছে, আর্থিক উন্নতি অগ্রগতি লাভ করছে যেমন তখন মক্কার কাফেররা সিরিয়া এবং ইয়ামনে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করতো আর এ অবস্থা সকল যুগেই দেখা যায় যে, আল্লাহর নাফরমানরা সম্পদ এবং শক্তি অর্জন করে থাকে, যারা আল্লাহর বিধান মেনে চলে অনেক ক্ষেত্রেই তাদেরকে দারিদ্র-প্রপীড়িত অবস্থায় দেখা যায় তাই আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে মোমেনগণকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, (হে রসূল!) কাফেরদের দেশ-বিদেশে বিচরণ যেন আপনাকে ধোকায় না ফেলে, কেননা অদূর ভবিষ্যতে তাদের শাস্তি অবশ্যই হবে।

এবনে আবি হাতেম সুদ্দী (রঃ)-এর সূত্রে আবু মালেক (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ আয়াত নাযিল হয়েছে হারেস এবনে কায়েস সাহমী সম্পর্কে। কাফেরদের ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য দেখে কারো যেন ভুল ধারণা না হয়, আল্লাহ্ পাকের অপ্রিয় ব্যক্তিরাই যে তাঁর নেয়ামত ভোগ করছে, প্রকৃত অবস্থা হলো এ ক্ষণস্থায়ী জগতের কয়েকটি দিনই তারা এ নেয়ামত ভোগ করছে, তারা আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়ে চিরকালীন শাস্তি ভোগ করার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে আর মোমেনগণ জীবনের সামান্য কয়েকটি দিন কষ্ট করছে কিন্তু চিরদিন তারা আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত লাভে ধন্য হবে। পূর্বের কাফেরদের মত এ যুগের কাফেরদেরও শাস্তি হবে তাই পরবর্তী আয়াতে পূর্ববর্তী যুগের কাফেরদের অবস্থা এবং শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছেঃ

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَّالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُوْلِهِمْ لِيَأْخُذُوْهُ وَجَادَلُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ

'এদের পূর্বে নূহের জাতি এবং তাদের পর আরো অনেক সম্প্রদায় সত্যকে মিথ্যাজ্ঞান করেছিল, প্রত্যেক উম্মতই তাদের নিকট প্রেরিত রসূলকে আবদ্ধ করার চক্রান্ত করেছিল এবং তারা মিথ্যা কলহে লিপ্ত হয়েছিল যেন সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়, এরপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম, কেমন হয়েছিল আমার শাস্তি'!

প্রিয়নবী (দঃ)-কে সান্ত্বনা

এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ হে নবী! মক্কার কাফেররা আপনার সঙ্গে যে অন্যায় আচরণ করছে তা নতুন কিছু নয়, ইতিপূর্বে যে নবী রসূলগণ প্রেরিত হয়েছিলেন তাঁদের উম্মতেরা তাঁদের সঙ্গে অনুরূপ অন্যায় আচরণ করেছে, তাঁদেরকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে তাঁদেরকে বন্দী করার এমনকি, হত্যা করার চক্রান্ত করেছে কিন্তু অবশেষে তাদের সকল অপচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, আল্লাহ্ পাক তাদেরকে পাকড়াও করেছেন এবং তাদের মূলোৎপাটন করেছেন, অতএব লক্ষ্য কর আল্লাহ্ পাকের শাস্তি কত কঠিন হয়েছিল! আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য হওয়ার এবং তাঁর প্রেরিত নবীর বিরোধিতা করার পরিণতি কত ভয়াবহ হয়েছিল!!

وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ

'আর এভাবে কাফেরদের ক্ষেত্রে (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালকের বাণী সত্য প্রমাণিত হল যে, নিশ্চয় তারা দোযখের অধিবাসী'।

এ আয়াতের দু'টি অর্থ হতে পারে (এক) যেভাবে দুনিয়াতে কাফেরদেরকে ধ্বংস করা একান্ত জরুরী ছিল ঠিক তেমনি আখেরাতে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা হওয়াও একান্ত জরুরী। (দুই) যেভাবে পূর্ববর্তী উম্মতদের কাফেরদের শাস্তি কার্যকর হয়েছে ঠিক তেমনি (হে রসূল!) আপনার উম্মতের কাফেরদের শাস্তিও অবশ্যই হবে।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ)-এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, যারা ইতোপূর্বে নবী রসূলগণকে কষ্ট দিয়েছে, যেভাবে যথাসময়ে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হয়েছে ঠিক তেমনি (হে রসূল!) আপনার উম্মতের যে সব লোক আপনার বিরোধিতা করে, তাদের প্রতিও কঠিন-কঠোর আযাব আসন্ন, যদিও তারা অন্য নবীকে মানে কিন্তু যতক্ষণ আপনার নবুওয়্যতের প্রতি ঈমান না আনে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের ঈমান গ্রহণযোগ্য নয় এবং তারা শাস্তির যোগ্য অপরাধী বলে বিবেচিত।[২]

অতএব, পূর্ববর্তী উম্মতগুলোর পরিণাম দেখে শিক্ষা গ্রহণ করা এ উম্মতের লোকদের একান্ত কর্তব্য, কেননা আল্লাহ পাকের চিরাচরিত নিয়মানুসারেই বন্দাদের পরিণতি নির্ধারিত হয়। অতীতে যে সব উম্মত আল্লাহ পাকের নবী রসূলগণের বিরোধিতা করেছে পরিণতিতে তাদের উপর চরম শাস্তি আপতিত হয়েছে। দুনিয়াতে যেমন তারা শাস্তি পেয়েছে আখেরাতের শাস্তিও তাদের জন্যে অনিবার্য হয়েছে। যেভাবে অতীতের কাফেরদের ব্যাপারে আল্লাহ পাকের শাস্তির ঘোষণা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে এবং তাদের ধ্বংসাবশেষ আজো পৃথিবীতে বিদ্যমান রয়েছে, ঠিক এভাবে এ উম্মতের কাফেরদের ব্যাপারেও ঐ শাস্তিই অবধারিত, কেননা তারা সকলে একই অপরাধে অপরাধী যা অমার্জনীয়।

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-২১৬
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৪ পৃষ্ঠা-২৯

'যারা আল্লাহ পাকের আরশ বহন করে এবং যারা তার চারপাশে রয়েছে, তারা সকলেই তাদের প্রতিপালকের পবিত্রতার মহিমা ঘোষণা করে থাকে এবং তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখে এবং তারা মোমেনদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার রহমত এবং তোমার জ্ঞান সবকিছুতেই বিস্তৃত। অতএব, যারা তওবা করে এবং যারা তোমার পথে চলে, তাদেরকে মাগফেরাত দান করো এবং তাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করো'।

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে, আর এ আয়াতে মোমেন, মোত্তাকী, পরহেযগার লোকদের শুভ পরিণতি ঘোষণা করা হয়েছে, যারা আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসল্লামের প্রতি বিশ্বাস করে তাঁর অনুসরণ করে তাদের মর্তবা এত বেশী যে, আল্লাহ পাকের আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ পর্যন্ত তাদের জন্যে দোয়া করতে থাকেন যেন আল্লাহ পাক তাদেরকে মাগফেরাত দান করেন। যেমন একখানি হাদীসে এরশাদ হয়েছেঃ আল্লাহ পাক তাঁর আরশ বহনকারী ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দান করেন, তোমাদের নিজস্ব এবাদত মূলতবী রাখ এবং রোজাদারদের দোয়ার সময় আমীন বলতে থাক। অন্য একখানি আয়াতেও ফেরেশতাদের সম্পর্কে এ ঘোষণা করা হয়েছে যে, وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ (ফেরেশতাদের প্রতি যে আদেশ হয়, তাই তারা করেন)।

এতে একথা প্রমাণিত হয়, মোমেনদের জন্যে দোয়া করার আদেশ আল্লাহ পাকই তাদেরকে দিয়েছেন। অতএব, আল্লাহর আরশ বহনকারী এবং তার চারিপার্শ্বের ফেরেশতাদের দোয়া অবশ্যই দরবারে এলাহীতে কবুল হবে, এ সৌভাগ্য নেককার মোমেনদেরই।

মোমেনদের জন্যে আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণের দোয়া

পবিত্র কোরআনের একাধিক আয়াতে নেককার মোমেনদের গুণাবলী এবং তাদের শুভ পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে কিন্তু আলোচ্য আয়াতে মোমেনদের জন্যে আল্লাহ পাকের একটি বিশেষ নেয়ামতের উল্লেখ রয়েছে, আর সে নেয়ামত হলো আল্লাহ পাকের বিশেষ নৈকট্য-ধন্য, তাঁর আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ যাঁরা সর্বদা আল্লাহ পাকের হামদ পাঠে এবং তাঁর তসবীহ-তাহলীলে মশগুল থাকেন, তারা নেককার মোমেনদের জন্যে দোয়া করতে থাকেন তাঁরা এ দোয়াও করেন যেন মোমেনদেরকে আল্লাহ পাক দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করেন।

আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণের অবস্থা

আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেন, আল্লাহর আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ এবং তাদের চারিপার্শ্বে অবস্থানকারী ফেরেশতাগণকে 'কাররোবিন' বলা হয়। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহ্ পাকের আরশ বহনকারী ফেরেশতা হলেন চারজন, তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনাতীত, এমনকি কল্পনাতীত।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের টাখনুর নীচ থেকে পায়ের তালু পর্যন্ত পাঁচশত বছরের দূরত্ব। আর একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁদের পা পাতালে রয়েছে আর আসমান তাদের কোমর পর্যন্ত হয় আর তাঁরা সর্বদা আল্লাহ্ পাকের মহিমা পাঠ করেন।

سبحان ذى العزة والجبروت سبحان ذى الملك والملكوت سبحان الحى الذى لايموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح

এ ফেরেশতাগণ আল্লাহ্ পাকের দরবারে ভীত-সন্ত্রস্ত এবং বিনীত অবস্থায় থাকেন, সর্বদা নীচের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে, কখনো উপরের দিকে তাকান না। সপ্তম আসমানে যারা রয়েছেন, তাদের থেকেও অধিকতর ভীত থাকেন আল্লাহর আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ।

মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, ফেরেশতা এবং আরশের মধ্যে সত্তরটি নূরের পর্দা রয়েছে, বিখ্যাত মোহাদ্দেস মোহাম্মদ এবনে মোন্কাদের (রঃ) হযরত যাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসল্লাম এরশাদ করেছেন, আমাকে অনুমতি দেয়া হয়েছে যে, আরশ বহনকারী একজন ফেরেশতার অবস্থা বর্ণনা করি আর তা হলো তার কানের লতি থেকে বাহু পর্যন্ত ৭০০শ' বছরের সমান দূরত্ব রয়েছে। (আবু দাউদ)

হযরত জা'ফর এবনে মোহাম্মদ তাঁর পিতার সূত্রে তাঁর পিতামহের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, মহান আরশের একটি খুঁটি থেকে আরেকটি খুঁটির দূরত্ব হলো একটি উড়ন্ত পাখি তিন হাজার বছর উড়ে যতখানি স্থান অতিক্রম করবে, তার সমান।

আল্লাহ্ পাকের আরশের নূরের দিকে কেউ তাকাতে পারেনা। তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, সপ্ত আসমান আর আরশের মধ্যে ৭০ হাজার পর্দা রয়েছে।

ওয়াহাব এবনে মোনাব্বেহ (রঃ) বলেছেন, আরশের চারিপার্শ্বে ফেরেশতাদের ৭০ হাজার কাতার রয়েছে। একের পর এক কাতার দন্ডায়মান। সকলেই মহান আরশের তওয়াফে রত রয়েছেন। তারা যখন একে অন্যের মুখোমুখি হন তখন

একজন বলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আর দ্বিতীয়জন বলেন, আল্লাহু আকবার। যখন প্রথম কাতারের ফেরেশতাগণের তকবীর পাঠের আওয়াজ পেছনের কাতারের ফেরেশতাগণ শ্রবণ করেন, তখন তারা (পেছনের কাতারে) উচ্চস্বরে বলেন,

سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ مَا اَعْظَمَكَ وَاَجَلَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ غَيْرُكَ اَنْتَ الْاَكْبَرُ اَلْخَلْقُ كُلُّهُمْ رَاجِعُوْنَ اِلَيْكَ-

ফেরেশতাগণ কাতারবন্দী অবস্থায় দন্ডায়মান থাকেন, তাদের হাত কাঁধের উপর থাকে, তাদের ৭০ হাজার কাতার রয়েছে, তাঁরা হাত বেধে দন্ডায়মান রয়েছেন। বাম হাতের উপর ডান হাত রয়েছে, তাঁরা তসবীহ পাঠে মশগুল রয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকের দু' বাহুর মধ্যে তিনশ' বছরের দূরত্ব রয়েছে আর তাঁদের কানের লতি থেকে বাহু পর্যন্ত চারশ বছরের দূরত্ব রয়েছে। তাদের মধ্যে এবং আল্লাহ পাকের মধ্যে ৭০টি পর্দা রয়েছে আগুনের, ৭০টি পর্দা রয়েছে অন্ধকারের, ৭০টি পর্দা রয়েছে নূরের, ৭০টি পর্দা রয়েছে সাদা মুক্তার, ৭০টি পর্দা রয়েছে লাল বর্ণের ইয়াকুত পাথরের। ৭০টি পর্দা রয়েছে সবুজ জমরুদ পাথরের। এতদ্ব্যতীত আরো কিছু রয়েছে যা আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ জানেনা।

وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ

অর্থাৎ তারা নিশ্চিতভাবে জানে এবং মানে যে, আল্লাহ পাক সর্বদা বিরাজমান, সর্বদা থাকবেন, তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা, তিনি এক, অদ্বিতীয়, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, তাঁর কোন পিতাও নেই পুত্রও নেই, তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বীও নেই, তাঁর কোন দৃষ্টান্তও নেই।

এ আয়াতে আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের ফজিলত, মাহাত্ম এবং শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনায় একথাও এরশাদ করেছেন যে, তাঁরা আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসী। একথা দ্বারা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ঈমান এবং একীন এবং দরবারে এলাহীতে বিনীত থাকার ব্যাপারে ফেরেশতাগণ অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায়ই। ঈমান ও একীনের ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই আর আল্লাহ পাকের কোন সন্তান-সন্ততি নেই, এতে প্রতিবাদ রয়েছে সে কাফেরদের, যারা এ ভ্রান্ত ধারণা করে যে ফেরেশতাগণ হলো আল্লাহ পাকের কন্যা (নাউজুবিল্লাহ---)।

শাহর এবনে হাওসাব বলেছেন, আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণের সংখ্যা আটজন তন্মধ্যে চারজন বলেন,

سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك-

(হে আল্লাহ! আমরা তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি, আমরা তোমার শানে হামদ পেশ করি, হাম্‌দ বা প্রশংসার তুমিই যোগ্য, এজন্যে যে বন্দাদের আমল সম্পর্কে তুমি সম্পূর্ণ অবগত, এতদসত্ত্বেও তুমি ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দাও।)

আর অবশিষ্ট চারজন বলেন,

سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك-

'পবিত্র তুমি হে আল্লাহ! তুমিই প্রশংসার যোগ্য, কেননা শাস্তি দেয়ার শক্তি থাকা সত্ত্বেও তুমি ক্ষমা কর'।

শহর এবনে হাওসাব আরো বলেছেন, ফেরেশতাগণ মানুষের পাপাচার দেখতে থাকে, আর সব কিছুই আল্লাহ পাকের নখদর্পণে রয়েছে কিন্তু আল্লাহ পাক মানুষকে তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি দেননা এজন্যে ফেরেশতাগণ আল্লাহ পাকের ধৈর্য ও সহনশীলতা এবং ক্ষমা ও ঔদার্য্যের প্রশংসা করেন।

وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

অর্থাৎ ফেরেশতাগণ মোমেনদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে যদিও মানুষ ও ফেরেশতার মধ্যে সৃষ্টিগত দিক থেকে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে কিন্তু আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমানের ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে গভীর সম্পর্কও রয়েছে। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ

'মোমেনগণ পরস্পর ভাই ভাই', তাই ফেরেশতাগণ মোমেনদের সার্বিক কল্যাণের জন্যে দোয়া করতে থাকেন।

ফেরেশতাগণ এভাবে দোয়া করেনঃ

فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ

'হে আল্লাহ! যারা তওবা করে এবং যারা তোমার পথে চলে, তাদেরকে মাফ করে দিও আর দোযখের শাস্তি থেকে তাদেরকে রক্ষা করো'।

رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ الَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ
مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ
الْحَكِيْمُ ۝٨ وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ ۚ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَئِذٍ
فَقَدْ رَحِمْتَهٗ ۚ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝٩ اِنَّ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللّٰهِ اَكْبَرُ مِنْ مَّقْتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ
اِذْ تُدْعَوْنَ اِلَى الْاِيْمَانِ فَتَكْفُرُوْنَ ۝١٠

তরজমা

(৮) হে আমাদের পরওয়ারদেগার! যাদেরকে তুমি জান্নাতে প্রবেশের প্রতিশ্রুতি দান করেছ তাদেরকে স্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করার সুযোগ দান কর এবং তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততীদের মধ্যে যারা (ঈমানদার অবস্থায়) নেক আমল করেছে তাদেরকেও। নিশ্চয় তুমি অত্যন্ত পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

(৯) এবং তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা কর আর সেদিন (কেয়ামতের দিন) যাকে তুমি শাস্তি থেকে রক্ষা করবে তাকে তো অনুগ্রহই করবে। এটিই তো বিরাট সাফল্য।

(১০) নিশ্চয় যারা কাফের তাদেরকে উচ্চকণ্ঠে ডেকে বলা হবে, তোমরা নিজেদের প্রতি যেমন অসন্তুষ্ট হয়েছ, আল্লাহ পাক এর চেয়ে বেশী তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হতেন যখন তোমাদেরকে ঈমানের প্রতি আহবান জানানো হতো আর তোমরা অস্বীকার করতে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে ফেরেশতাগণের দোয়ার উল্লেখ রয়েছে যা তারা মোমেনদের পক্ষে করেছে, এ আয়াতেও নেককার মোমেনদের পক্ষে ফেরেশতাগণের আরো দোয়ার উল্লেখ রয়েছে, এরশাদ হয়েছেঃ

رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ ِالَّتِىْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ ط

'হে আমাদের পরওয়ারদেগার! যাদেরকে তুমি জান্নাতে প্রবেশের প্রতিশ্রুতি দান করেছ তাদেরকে স্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করার সুযোগ দান কর এবং তাদের পিতা-মাতা, পতী-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা (ঈমানদার অবস্থায়) নেক আমল করেছে, তাদেরকেও (প্রবেশাধিকার দাও)'।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ঈমান ও নেক আমলের নিরীখেই প্রত্যেকটি মানুষকে বিচার করা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ দান করা হবে, আর এখলাসের ভিত্তিতেই জান্নাতে মর্তবার পার্থক্য হবে, আত্মীয়-স্বজন বা আপনজন কেউ এ ব্যাপারে কোন প্রকার সাহায্য করতে পারবেনা, কিন্তু আল্লাহ পাকের মর্জি হলে আত্মীয়-স্বজন প্রিয়জনদের দ্বারাও উপকৃত হওয়া সম্ভব হবে যেমন এ আয়াতে আল্লাহ পাকের নৈকট-ধন্য ফেরেশতাগণ নেককার মুসলমানদের পক্ষে দোয়া করবেন বলে ঘোষণা করা হয়েছে, শুধু তাই নয়; বরং তাদের পিতা-মাতাসহ সকল ঈমানদার আত্মীয়-স্বজনকেও জান্নাতে স্থান দেয়ার জন্যে ফেরেশতাগণ দোয়া করবেন। সূরা তূরে এ মর্মে একখানি আয়াত রয়েছেঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ الايه

(আয়াতঃ ২১)

'যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তান-সন্ততিরাও ঈমানের সাথে তাদের অনুসরণ করেছে আমি তাদের সন্তান-সন্ততিকেও তাদের সঙ্গে মিলিত করবো অথচ এতে তাদের কর্মফল কিছুমাত্রও কম করবোনা, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ কৃতকর্মের জন্যে দায়ী'।

জান্নাতীগণের আপনজনদেরকে একত্রিত করা হবে

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত সায়ীদ এবনে যোবায়ের (রঃ) বর্ণনা করেছেন, মোমেন যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন সে জিজ্ঞাসা করবে, আমার পিতা-মাতা কোথায়? আমার সন্তান-সন্ততিরা কোথায়? আমার স্ত্রী কোথায়? তখন ফেরেশতাগণ জবাব দেবেন, তারা আপনার ন্যায় আমল করেনি (তাই এখানে পৌঁছতে পারেনি)। মোমেন বলবে, আমি যে আমল করতাম তা তো আমার জন্যেও

করতাম এবং তাদের জন্যেও করতাম। তখন আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে হুকুম হবে, তাদেরকেও জান্নাতে প্রবেশ করাও অর্থাৎ জান্নাতী ব্যক্তির আপনজনদেরকেও যেন তার সাথে একত্রিত করা হয় যাতে করে উভয় পক্ষের নয়ন-মনের তৃপ্তি হয় আর এ একত্রিত করার জন্যে উচ্চ পর্যায়ের জান্নাতীকে নিম্ন পর্যায়ভুক্ত করা হবে না; বরং নিম্ন স্তরে অবস্থানকারীদের মর্তবা উন্নীত করে আল্লাহ্ পাকের বিশেষ দয়ায় উচ্চ মর্তবায় পৌছানো হবে, এভাবে তাদেরকে আপনজনদের সাথে একত্রিত করা হবে। এরপর সায়ীদ এবনে যোবায়ের (রঃ) আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন।

হযরত মোতরাফ এবনে আবদুল্লাহ্ বর্ণনা করেন, ফেরেশতাগণ মোমেনদের কল্যাণ কামনা করেন, এ আয়াতই একথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

তফসীরকারগণ বলেছেন, وَمَنْ صَلَحَ এর অর্থ হলো আর যে ঈমান এনেছে, কেননা ঈমান ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।[১]

আর এ শব্দটির তাৎপর্য হলো, যার মধ্যে জান্নাতে প্রবেশের যোগ্যতা থাকবে সে-ই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। ফেরেশতাগণের সুপারিশক্রমে জান্নাতে মোমেনদের মর্তবা উন্নীত হবে। মোমেনদের আত্মীয়-স্বজনদের ব্যাপারে তাদের সুপারিশ শুধু সে সব লোকদের ব্যাপারেই উপকারী হবে যাদের মধ্যে ঈমান থাকবে, অতএব বংশ মর্যাদা আখেরাতে উপকারী হবেনা; বরং উপকারী হবে ঈমানী সম্পর্ক।

اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

'নিশ্চয় তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়'।

যেহেতু তুমি অতীব শক্তিশালী, পরাক্রমশালী তাই তোমার ইচ্ছার বাস্তবায়নে কেউ বাধা দিতে পারেনা আর যেহেতু তুমি প্রজ্ঞাময় বা হাকীম তাই তোমার প্রতিটি সিদ্ধান্ত হয় হেকমতপূর্ণ, তাৎপর্যবহ।

ইতোপূর্বে মোমেনদের জন্যে ফেরেশতাগণের যে দোয়ার উল্লেখ করা হয়েছে তার উপসংহারে তারা যা বলেছেন তা এ আয়াতে রয়েছে, এরশাদ হয়েছেঃ

وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ ط

হে পরওয়ারদেগার! তাদেরকে শাস্তি থেকে (সর্ব প্রকার কষ্ট থেকে) রক্ষা কর, কবর, হাশর, পুলসেরাত, হিসাব নিকাশ প্রভৃতির কষ্ট থেকে তাদেরকে রক্ষা কর।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-২১৯
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৪ পৃষ্ঠা-৩১
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৬ পৃষ্ঠা-১১৫

وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهٗ ط وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

'হে পরওয়ারদেগার! সেদিন (কেয়ামতের দিন) যাকে তুমি শাস্তি থেকে রক্ষা করবে তাকে তো অনুগ্রহই করবে, এটিই তো বিরাট সাফল্য'।

ফেরেশতাগণের এ দোয়া মোমেনদেরকে এ শিক্ষা দেয় যে, তারা যেন জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত সতর্কতার সাথে অতিবাহিত করে থাকে এবং আল্লাহ পাকের যাবতীয় অপছন্দনীয় কাজ থেকে বিরত থাকে, কথা ও কাজে আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে সচেষ্ট হয়, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করে এবং আল্লাহ পাকের নেয়ামত সমূহ লাভের জন্যে আকাঙ্ক্ষা করতে থাকে। এ আকাঙ্ক্ষাই জীবন-সাধনায় সার্থকতা লাভে সহায়ক হবে, কেননা মানুষ যখন কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করে তখন তা পূরণ করার জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টাও করে, তাই আখেরাতের নেয়ামত লাভের আকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি তার জন্যে সাধনাও অব্যাহত রাখবে। (হে আল্লাহ! আমাদের সকলকে তৌফিক দান কর)।

এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো, এ পার্থিব জীবনে যত সাফল্যই লাভ হোক না কেন তা প্রকৃত সাফল্য নয়; বরং প্রকৃত সাফল্য হলো আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সাফল্য। পবিত্র কোরআনের এ আয়াত মুসলমানদেরকে সে মহান সাফল্য লাভের জন্যে অনুপ্রাণিত করে, কেননা দুনিয়ার জীবনের সাফল্য তা যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন, নিতান্ত সামান্য আর আখেরাতের সাফল্য স্থায়ী এবং উত্তম।

ইমাম রাজী (রঃ) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, ফেরেশতাগণ সর্বপ্রথম মোমেনদের জন্যে এ দোয়া করেছেনঃ

وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ

(হে পরওয়ারদেগার! মোমেনদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর।)

এরপর দোয়া করেছেন,

وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ

(হে পরওয়ারদেগার! মোমেনদেরকে জান্নাত নসীব কর।)

এরপর আলোচ্য আয়াতে এ দোয়া করেছেন, হে পরওয়ারদেগার! মোমেনদেরকে বাতিল আকীদা এবং অন্যায় কাজ থেকে রক্ষা কর। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ

অর্থাৎ মোমেনদেরকে বাতিল আকীদা, মন্দ পথ ও মত থেকে, মন্দ কাজ থেকে রক্ষা কর, কেননা মন্দ কাজের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি মন্দই হয় যা পরকালীন জিন্দেগীর সাফল্যকে ব্যর্থ করে দেয়।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللّٰهِ اَكْبَرُ مِنْ مَّقْتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ اِذْ تُدْعَوْنَ اِلَى الْاِيْمَانِ فَتَكْفُرُوْنَ

'নিশ্চয় যারা কাফের তাদেরকে উচ্চকণ্ঠে ডেকে বলা হবে, তোমরা নিজেদের প্রতি যেমন অসন্তুষ্ট হয়েছ, আল্লাহ পাক এর চেয়ে বেশী তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হতেন যখন তোমাদেরকে ঈমানের প্রতি আহবান জানানো হতো আর তোমরা অস্বীকার করতে'।

আলোচ্য আয়াতের একথাটি তখনকার জন্যে, যখন কাফেররা দোযখে প্রবেশ করে নিজেদের উপর আক্ষেপ করতে থাকবে এবং নিজেদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে বলবে, আমরা কেন এত পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম!

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, কেয়ামতের দিন যখন কাফেরদেরকে অগ্নি গর্ভে নিক্ষেপ করা হবে এবং দোযখের সমস্ত আযাব তারা প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা আক্ষেপ করে বলবে, আমাদেরকে তো ইসলাম গ্রহণের আহবান জানানো হয়েছিল কিন্তু আমরা সে আহবানে সাড়া দেইনি। এভাবে তারা তাদের চিরস্থায়ী দুঃখী জীবনের জন্যে আক্ষেপ করবে, দুনিয়ার জীবনের সকল অন্যায়-অনাচারের জন্যে তারা পরিতাপ করবে এবং তাদের অসন্তুষ্টির কথা প্রকাশ করতে থাকবে। তখন তাদেরকে বলা হবে, আজ তোমরা তোমাদের দুর্গতি দেখে যেভাবে নিজেদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছ, ইতোপূর্বে দুনিয়াতে যখন তোমরা আল্লাহ পাকের নাফরমানী করতে তখন আল্লাহ পাক এর চেয়ে অধিক অসন্তুষ্ট হতেন, এ সত্য তোমরা ভুলে যেওনা।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে পবিত্র কোরআনের সত্যতা ঘোষণা করা হয়েছে এবং ইসলামের দুশমনদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি নেককারদের উচ্চ মর্যাদা এবং তাদের পক্ষে মহান আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণের দোয়া এবং এস্তেগফারের উল্লেখ ছিল। এরপর আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে,

কেয়ামতের দিন কাফেররা অপমানিত এবং লাঞ্ছিত হবে এবং নিজেরাই স্বীকার করবে যে, আমরা অন্যায় করেছি তবে যদি আমাদেরকে দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে যেতে দেয়া হয় তবে আমরা আল্লাহ্ পাকের অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত হবো। তখন তাদেরকে ডাক দিয়ে বলা হবে, আজ তোমরা যেভাবে নিজেদের প্রতি ঘৃণা এবং অসন্তোষ প্রকাশ করছো ইতিপূর্বে দুনিয়াতে যখন তোমরা কুফরী ও নাফরমানীতে লিপ্ত হতে তখন আল্লাহ্ পাক তোমাদের প্রতি এর চেয়ে বেশী অসন্তুষ্ট হতেন, আর এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাফেরদেরকে উচ্চকণ্ঠে ডাক দিয়ে একথাটি বলা হবে, এর তাৎপর্য হলো, এভাবে ডাক দেয়ার কারণে তাদের অপমান এবং লাঞ্ছনা আরো বৃদ্ধি পাবে।

আয়াতের মর্মকথা

কাফেরদেরকে যখন দোযখে নিক্ষেপ করা হবে তখন তাদের দুঃখ ক্ষোভ এবং আক্ষেপের সীমা থাকবেনা, তাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই নিজেদের ক্ষোভ হবে, তারা নিজেরাই নিজেদেরকে ঘৃণা করবে, নিজের প্রতিই তারা হবে অসন্তুষ্ট, দোযখের আযাব দেখে তারা আক্ষেপ করে বলবে, কেন কুফরী নাফরমানী করেছিলাম? কেন নবী রসূলের বিরোধিতা করেছিলাম? যেমন কোরআনে করীমেই রয়েছে তাদের আক্ষেপের কথাঃ

يَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِىْ كُنْتُ تُرَابًا

'কাফের বলবে, হায়! আক্ষেপ, যদি মাটি মাটিই থাকতাম, মানব রূপ ধারণ না করতাম, তবে আজ এত বড় বিপদের সম্মুখীন হতাম না'। চরম হতাশা, দুঃখ-বেদনার এ মনোভাব কাফেররা কেয়ামতের দিন প্রকাশ করবে তখন তাদেরকে আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে বলা হবে, আজ তোমরা দোযখের আযাব দেখে যতখানি অসন্তুষ্ট এবং ব্যথিত হয়েছ, দুনিয়াতে যখন তোমরা কুফর ও শেরক করতে এবং ঈমানের আহবানকে প্রত্যাখ্যান করতে তখন আল্লাহ্ পাক এর চেয়ে বেশী অসন্তুষ্ট হতেন।

অতএব, সময় থাকতেই আল্লাহ্ পাককে সন্তুষ্ট করা অর্থাৎ তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করা এবং আনুগত্য প্রকাশ করা একান্ত কর্তব্য। যদি দুনিয়ার জীবনে কেউ এ কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয় তবে আখেরাতে দুঃখ প্রকাশ করা ব্যতীত আর কোনই গত্যন্তর থাকবেনা।

قَالُوْا رَبَّنَآ اَمَتَّنَا
اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا فَهَلْ اِلٰى
خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ ﴿١١﴾ ذٰلِكُمْ بِاَنَّهٗٓ اِذَا دُعِىَ اللّٰهُ وَحْدَهٗ
كَفَرْتُمْ ۚ وَاِنْ يُّشْرَكْ بِهٖ تُؤْمِنُوْا ۭ فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ ﴿١٢﴾
هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاۗءِ رِزْقًا ۭ
وَمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَنْ يُّنِيْبُ ﴿١٣﴾ فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ
الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿١٤﴾ رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ ذُو الْعَرْشِ ۚ
يُلْقِي الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰي مَنْ يَّشَاۗءُ مِنْ عِبَادِهٖ لِيُنْذِرَ
يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿١٥﴾ يَوْمَ هُمْ بٰرِزُوْنَ ۚ لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ
مِنْهُمْ شَيْءٌ ۭ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۭ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿١٦﴾

তরজমা

(১১) কাফেররা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে দু'বার মৃত্যু দিয়েছ এবং দু'বার জীবনও দিয়েছ, আমরা এখন আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি এমন অবস্থায় নিষ্ক্রমণের কোন পথ আছে কি'?

(১২) (না কোন পথ নেই) এর কারণ এই যে কেউ যখন শুধুমাত্র এক, অদ্বিতীয় আল্লাহ পাককে ডাকতো তখন তোমরা তা অস্বীকার করতে, আর যখন আল্লাহ পাকের সাথে কোন কিছুকে শরীক করা হতো তখন তোমরা তার উপর বিশ্বাস করতে কিন্তু (জেনে রেখ) হুকুম একমাত্র আল্লাহ পাকের যিনি সবার উপরে, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ।

(১৩) তিনিই তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শন সমূহ দেখিয়ে থাকেন আর তিনিই আসমান থেকে তোমাদের জীবিকার জন্যে পানি অবতরণ করেন, আর যে কেউ আল্লাহর দিকে ফিরে আসে সে-ই উপদেশ গ্রহণ করে।

(১৪) অতএব, আল্লাহ্ পাকের আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁকে ডাকতে থাক যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।

(১৫) তিনি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, তিনি মহান আরশের অধিপতি, তিনি তাঁর বন্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা ওহী প্রেরণ করেন যাতে করে সে কেয়ামতের দিন সম্পর্কে সতর্ক করতে পারে।

(১৬) যেদিন মানুষ (আল্লাহ্ পাকের দরবারে) উপস্থিত হবে সেদিন আল্লাহ্ পাকের নিকট তাদের কোন কিছুই গোপন থাকবে না, সেদিনের রাজত্ব কার? প্রবল প্রতাপান্বিত এক, অদ্বিতীয় আল্লাহ্ পাকের।

তফসীরুল কোরআন

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ কাফেররা দোযখের আযাবের মুখোমুখি হয়ে আল্লাহ্ পাকের দরবারে ফরিয়াদ করবে যে, হে পরওয়ারদেগার! তুমি সর্বশক্তিমান, আমরা প্রাণহীণ ছিলাম, আমাদের কোন অস্তিত্বই ছিলনা, তুমি আমাদেরকে দু'বার জীবন দিয়েছ আর দু'বার মৃত্যু দিয়েছ, আমরা দুনিয়ার জীবনে অপরাধ করেছি, তোমার বিধি-নিষেধ পালন করিনি; তোমার রসূলগণকে অবিশ্বাস করেছি, তোমার একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করিনি, আমরা স্বীকার করি যে এভাবে আমরা চরম অন্যায় করেছি, নিজেদের প্রতিই আমরা জুলুম করেছি, যখন ইতোপূর্বে দু' বার জীবন দিয়েছ তখন আরেকবার পৃথিবীতে ফিরে যেতে আমাদেরকে সুযোগ দান কর তাহলে আমরা অনেক নেক আমল করে তোমার দরবারে ফিরে আসব।

আলোচ্য আয়াতে 'দু' বার জীবন' ও 'দু' বার মৃত্যু'র যে কথা রয়েছে সে সম্পর্কে তফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, এ পর্যায়ে হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে মাসউদ (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার মুহূর্তে এক জীবন আর কেয়ামতের দিন যখন পুনরুত্থান হবে তখন আরেকটি জীবন লাভ করবে। অতএব, পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বের অবস্থাকে একটি মৃত্যু বলা হয়েছে, আর দুনিয়া থেকে বিদায়ের সময়ের অবস্থাকে আরেকটি মৃত্যু বলা হয়েছে। এভাবে দু'টি জীবন ও মৃত্যু হয়েছে যেমন কোরআনে করীমের 'সূরা বাকারা'য় আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

'তোমরা কিভাবে আল্লাহ পাকের নাফরমানী কর অথচ তোমরা ছিলে মৃত (প্রাণহীন, নির্জীব), এরপর আল্লাহ পাক তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন, পুনরায় তিনি তোমাদেরকে মৃত্যুমুখে পতিত করবেন (যখন জীবনের নির্দিষ্ট সময় শেষ হবে) এরপর তিনি তোমাদেরকে পুনরায় জীবন দান করবেন (কেয়ামতের দিন), এরপর তোমরা আল্লাহ পাকের দরবারে প্রত্যাবর্তন করবে'।

فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا فَهَلْ اِلٰى خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ

'আমরা এখন আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি এমন অবস্থায় নিষ্ক্রমণের কোন পথ আছে কি'?

অর্থাৎ কাফেররা যখন দোযখের শাস্তি দেখবে তখন জীবনের কৃত অপরাধের কথা স্বীকার করবে এবং আল্লাহ পাকের অন্তহীন কুদরত ও ক্ষমতার কথা বর্ণনা করে এভাবে আরজী পেশ করবে, হে পরওয়ারদেগার! আমাদের কোন অস্তিত্বই ছিলনা তুমিই দয়া করে আমাদেরকে জীবন দান করেছ, এরপর নির্দিষ্ট সময়ে আমাদেরকে মৃত্যুমুখে পতিত করেছ, এরপর পুনরায় আমাদেরকে জীবন দান করেছ, তুমি যে সর্বশক্তিমান তুমি যা ইচ্ছা তা কর, আমরা স্বীকার করি যে দুনিয়ার জীবনে অনেক অন্যায় করেছি অনেক জুলুম করেছি এবং এজন্যে আমরা ক্ষমা প্রার্থী, ইতোপূর্বে দু' বার যখন আমাদেরকে জীবন দান করেছ এমনিভাবে যদি আরেকবার আমাদেরকে পৃথিবীতে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হয় তবে আমরা পূর্বের ন্যায় আর অন্যায় করবো না, পার্থিব জীবনের ন্যায় পরকালীন জীবন যে ধ্রুব সত্য একথা পূর্বে উপলব্ধি করতে পারিনি কিন্তু এখন যখন মর্মে মর্মে অনুভব করছি যে, আমরা চরম অন্যায় করেছি অতএব, আমাদেরকে দোযখ থেকে বের হওয়ার এবং দুনিয়াতে আরেকবার ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেয়া হোক।

ذٰلِكُمْ بِاَنَّهٗٓ اِذَا دُعِىَ اللّٰهُ وَحْدَهٗ كَفَرْتُمْ ۚ وَاِنْ يُّشْرَكْ بِهٖ تُؤْمِنُوْا

আল্লাহ পাকের তরফ থেকে কাফেরদের এ অসময়োচিত অন্যায় আবদারের জবাবে ঘোষণা করা হবে, কখনও তোমাদেরকে দোযখ থেকে বের হওয়ার ব্যবস্থা হবেনা, কেননা এ শাস্তি তোমাদের কৃতকর্মেরই অনিবার্য পরিণাম। স্মরণ আছে কি, যখনই পৃথিবীতে তোমাদেরকে এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নের আহবান জানানো হতো তখন তোমরা প্রত্যাখ্যান করতে। শত চেষ্টাতেও তোমাদেরকে সঠিক পথে আনা যায়নি, সত্য বিরোধিতায় তোমরা ছিলে অত্যন্ত তৎপর। নবী রসূলগণকে

তাঁদের অনুসারীদেরকে কষ্ট দেয়ার ব্যাপারেও তোমরা ছিলে খড়গহস্ত। যখন কেউ আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস করতে তোমাদেরকে ডাকতো তখন তোমরা তাতে অস্বীকৃতি জানাতে আর যখন কেউ শেরকের মত জঘন্য অন্যায়ের আহবান করতো তখন তোমরা তাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করতে। সত্যকে তোমরা সর্বদা পরিহার করে চলেছ এবং অসত্যকে সর্বক্ষণ সাগ্রহে আঁকড়ে ধরে রেখেছ অতএব, তোমাদের শাস্তি অবধারিত, তোমরা আবার দুনিয়াতে ফিরে যেতে চাও, একবার নয় শতবার পাঠালেও তোমরা পাপাচারেই লিপ্ত হবে তাই দোযখের আযাব ভোগ করতে থাক, এটিই তোমাদের প্রাপ্য।

فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيْرِ

'(জেনে রাখ) হুকুম একমাত্র আল্লাহ পাকেরই, যিনি সবার উপরে, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ'।

দুনিয়ার জীবনে তোমরা আল্লাহ পাকের হুকুম অমান্য করেছ, তাঁর একত্ববাদে বিশ্বাস করোনি, তাঁর রহমতের আশা করোনি এবং তাঁর আযাবের ভয় করোনি তাই আজ আর কোন কথা নেই, আজ কারো কোন কর্তৃত্ব নেই, সর্বময় ক্ষমতা সকল কর্তৃত্ব এবং প্রভূত্ব একমাত্র আল্লাহ পাকের, অতএব তোমরা দোযখের কারাগারে শাস্তি ভোগ করতে থাক পরিত্রাণের কোন পথ নেই, আর যদি দোযখ থেকে তাদেরকে বের করাও হয় তবুও কোন উপকার হবেনা, কেননা অদৃশ্য বিষয়ের উপর ঈমান আনাই ছিল কর্তব্য যা তারা পালন করেনি, এখন তো সবই দৃশ্যমান, পরকালীন জীবনের সব কিছু তারা দেখে ফেলেছে, এখন ঈমান আনয়নের আর কোন উপকারিতা নেই, এজন্যেই তো আল্লাহ পাকের কুদরতের নিদর্শন সমূহ দেখানো হয়েছে তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

هُوَ الَّذِىْ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا ط

'তিনিই তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শন সমূহ দেখিয়ে থাকেন, আর তিনিই আসমান থেকে তোমাদের জীবিকার জন্যে পানি অবতরণ করেন'।

বস্তুতঃ মানুষের জীবন ধারণের জন্যে আল্লাহ পাক তার জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন, এ বিস্ময়কর ব্যবস্থাটিই কি আল্লাহ পাকের অসীম কুদরতের অন্যতম নিদর্শন নয়, কেননা আল্লাহ পাকই আসমান থেকে বারি বর্ষণ করেন ফলে পৃথিবী সজীব হয়, ফল-ফসল উৎপন্ন হয়, আবহমান কাল থেকে আল্লাহ পাকের কুদরতের নিদর্শন মানুষ দেখতে থাকে কিন্তু তবুও তাঁর প্রতি ঈমান আনেনা এবং তাঁর নেয়ামতের শোকর আদায় করেনা।

وَمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَنْ يُّنِيْبُ

'যে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে শুধু সে-ই উপদেশ গ্রহণ করে'।

অর্থাৎ যে আল্লাহ পাকের দিকে মনোনিবেশ করে, সৃষ্টিকে দেখে যে স্রষ্টার কথা মনে করে সে-ই উপদেশ গ্রহণ করে আর যে গাফলতের আবর্তে নিপতিত থাকে বা যে দেখেও দেখেনা শুনেও শোনেনা বুঝেও বোঝেনা, সে আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়েই জীবন যাপন করে আর এমন লোকদের শাস্তি অনিবার্য।

فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ

'অতএব, আল্লাহ পাকের আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁকে ডাকতে থাক যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।

চির সাফল্য লাভের পথ

যারা বিবেকবান, বুদ্ধিমান, বাস্তববাদী, পরিণামদর্শী তাদের কর্তব্য হলো এক, অদ্বিতীয় আল্লাহ পাকের বন্দেগী করা, একনিষ্ঠভাবে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের সাধনায় রত হওয়া-এটিই মর্দে মোমেনের কর্তব্য। যারা মুশরেক, মুরতাদ যারা সত্যের দুশমন, তারা হয়তো এ নীতি অপছন্দ করবে, এর বিরোধিতা করবে কিন্তু প্রকৃত মুসলমান তাদের পরোয়া করবেনা, নিঃশঙ্ক চিত্তে এক আল্লাহর বন্দেগী করে যাবে, তাঁর দ্বীনের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করবে, জীবনকে জীবনের মালিকের সন্তুষ্টি লাভের অন্বেষণে অতিবাহিত করবে, এটিই চির সাফল্য লাভের পথ।

رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِى الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ

'তিনি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, তিনি মহান আরশের অধিপতি, তাঁর বন্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা তিনি নিগুঢ় তত্ত্ব পরিবেশন করেন, যাতে করে সে মহা সাক্ষাতের দিন (কেয়ামতের দিন) সম্পর্কে সতর্ক করে'।

এ আয়াতে আল্লাহ পাক তাঁর উচ্চ মর্তবা এবং শান ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা ঘোষণা করেছেন।

رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ

অর্থাৎ তাঁর মর্তবা অতি উচ্চে যে মর্তবায় কেউ পৌঁছতে পারেনা।

কোন কোন তফসীরকার এ বাক্যাংশের এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, আল্লাহ পাক জান্নাতে তাঁর নবী রসূল এবং ওলীগণের মর্তবা উচ্চ করবেন, তাঁদের মর্তবা অনুযায়ী তাঁদেরকে স্থান দেয়া হবে।

يُلْقِى الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ

অর্থাৎ তাঁর বন্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা তিনি ওহী নাযিল করেন, নিগুঢ় তত্ত্ব পরিবেশন করেন।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের امره। শব্দটি 'দান' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ যাঁর প্রতি ওহী নাযিল করেন, তা তাঁর দানেই করেন।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক তাঁর তিনটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন যার প্রত্যেকটি তাঁর তৌহীদের প্রকৃত প্রমাণ।

لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ

যাদের প্রতি ওহী নাযিল করা হয় তাদের কর্তব্য হলো মানুষকে কেয়ামতের দিন সম্পর্কে সতর্ক করা। কেয়ামতের দিনকে يوم التلاق বা 'মোলাকাতের দিন' বলা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এটিও কেয়ামতের দিনের একটি নাম, এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদেরকে সতর্ক করেছেন।

'মোলাকাতের দিনে'র তাৎপর্য

কেয়ামতের দিনকে 'মোলাকাতের দিন' বলে আখ্যায়িত করার তাৎপর্য হলো, সেদিন হযরত আদম (আঃ)-এর সঙ্গে তাঁর সর্বশেষ সন্তানের মোলাকাত হবে অর্থাৎ পৃথিবীতে সর্বশেষ যে ভূমিষ্ঠ হবে, আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)-এর সঙ্গে তারও মোলাকাত হবে।

এবনে যায়েদ (রঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিনকে 'মোলাকাতের দিন' এজন্যে বলা হয়েছে যে, সেদিন বন্দাগণ আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযির হবে, তাঁর সঙ্গে মোলাকাত করার অপূর্ব সুযোগ লাভ করবে।

হযরত কাতাদা (রঃ) বলেছেন, সেদিন আসমানের অধিবাসীগণ এবং জমীনের অধিবাসীগণ একত্রিত হবে। স্রষ্টা ও সৃষ্টির, জালেম ও মজলুমের মোলাকাত হবে। কেয়ামতের দিন সকলেই আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হবে সেখানে কেউ আত্মগোপন করে থাকতে পারবেনা এমনকি, ছায়াও থাকবেনা সেদিন সকলেই আল্লাহ পাকের সম্মুখে থাকবে। সেদিন আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করবেন, আজ রাজত্ব কার? কিন্তু কেউ এর জবাব দেয়ার মত থাকবেনা তখন আল্লাহ পাক স্বয়ং জবাব দেবেন, 'আজ ক্ষমতা প্রবল প্রতাপান্বিত এক, অদ্বিতীয় আল্লাহ পাকের'।

হাকেম, এবনে জরীর, এবনে আবি হাতেম, এবনে আবিদ্দুনিয়া হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, তিনি বলেছেনঃ কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক একটি ময়দানে সমগ্র সৃষ্টিজগৎকে একত্রিত করবেন, জ্বীন, মানুষ, পক্ষীকূল সকলকেই একত্রিত করা হবে। এরপর সর্বনিম্ন আসমান ফেটে যাবে, এ আসমানের অধিবাসীগণ অবতরণ করবে, তাদের সংখ্যা জ্বীন ও মানুষ থেকে অধিকতর হবে।

সুদীর্ঘ এ হাদীসে সাতটি আসমান ভেঙ্গে পড়া এবং প্রত্যেক আসমানের অধিবাসীদের একের পর এক অবতরণ এবং অবশেষে স্বয়ং আল্লাহ পাকের আত্মপ্রকাশ করার কথা বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য আল্লাহ পাকের আত্মপ্রকাশ করার অবস্থা কী হবে তা মানুষের বোধ শক্তির উর্দ্ধে আর সেদিন কবর থেকে যখন মানুষ বের হয়ে আসবে তখন সকলেই সম্মুখে থাকবে, কোন কিছুরই আড়াল থাকবেনা।

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ط لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

সমগ্র সৃষ্টিজগৎ লয়ঃপ্রাপ্ত হবার পর পুনরায় সৃষ্টি করার পূর্বে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এ প্রশ্ন করা হবে, আজ রাজত্ব কার? জবাব দেবার জন্যে সেদিন কেউ থাকবেনা তখন আল্লাহ পাক নিজেই এরশাদ করবেনঃ

لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

এক, অদ্বিতীয়, প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ পাকের যিনি পবিত্র, যাঁর কোন শরীক নেই।

الْقَهَّارِ

যিনি পরাক্রমশালী, সমগ্র সৃষ্টি জগৎকে লয় করার ক্ষমতা তিনি রাখেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত সুদীর্ঘ হাদীসে একথাটির উল্লেখ রয়েছে যে, সেদিন আল্লাহ পাক এ প্রশ্নটি করবেন।

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস আবু দাউদ শরীফে সংকলিত হয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ একজন ঘোষক উচ্চস্বরে ঘোষণা করবে যে, হে লোক সকল! তোমাদের প্রতি সে সময় এসে গেছে, এ ঘোষণার আওয়াজ এত সুদীর্ঘ হবে যে জীবিত ও মৃত সকলেই তা শুনতে পারবে আর আল্লাহ পাক দুনিয়ার আসমানে আগমন করবেন তখন একজন ফেরেশতা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত ঘোষণা করবে।

বায়হাকী হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন যার মর্ম হলো এই, তিনজন ফেরেশতা সংজ্ঞাহীন হবেন না তারা হলেন জীব্রাঈল (আঃ), মিকাইল (আঃ) এবং আজরাঈল (আঃ)। এরপর আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, যদিও তিনি সবই জানেন তবুও জিজ্ঞাসা করবেন, হে মৃত্যুর ফেরেশতা! আর কে বাকী রয়েছে ? মালাকুল মওত আরজ করবে, হে আল্লাহ! তোমার পবিত্র সত্ত্বা এবং তোমার বন্দা জীব্রাঈল, মিকাঈল এবং মালাকুল মওত। আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, মিকাঈলের রুহ কবজ করে নাও। এরপর আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করবেন, আর কে বাকী রয়েছে? মালাকুল মওত আরজ করবে, হে আল্লাহ! তোমার পবিত্র সত্ত্বা এবং তোমার বন্দা জীব্রাঈল ও মালাকুল মওত। আদেশ হবে, জিব্রাঈলের রুহ কবজ করে নাও, তখন এ আদেশ কার্যকর হবে। এরপর আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করবেন, এখন কে রয়েছে? তখন আজরাঈল (আঃ) বলবেন, শুধু তোমার পবিত্র সত্ত্বা এবং মালাকুল মওত। আদেশ হবে তুমিও মৃত্যু বরণ কর, তখন মালাকুল মওতের মৃত্যু হবে। আল্লাহ পাক তখন ঘোষণা করবেন, আমিই সর্বপ্রথম সমগ্র মাখলুককে সৃষ্টি করেছি, পুনরায় আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করবো, আজ অহংকারী জালেমরা কোথায়? আজ ক্ষমতা কার? কিন্তু তখন কেউ জবাব দেয়ার মত থাকবেনা তখন আল্লাহ পাক নিজেই এরশাদ করবেনঃ

لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

'(আজ ক্ষমতা) এক অদ্বিতীয় আল্লাহ পাকেরই, যিনি পরাক্রমশালী। এরপর দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে তখন সঙ্গে সঙ্গে সকলেই দাঁড়িয়ে যাবে'।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-২২৫
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৪ পৃষ্ঠা-৩৪

اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ؕ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ
سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٧﴾ وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاٰزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى
الْحَنَاجِرِ كٰظِمِيْنَ ؕ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ
يُّطَاعُ ﴿١٨﴾ يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ ﴿١٩﴾
وَاللّٰهُ يَقْضِىْ بِالْحَقِّ ؕ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا
يَقْضُوْنَ بِشَىْءٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿٢٠﴾

তরজমা

(১৭) আজ প্রত্যেককে তার কর্মফল দেয়া হবে, আজ কারো প্রতি কোন প্রকার জুলুম করা হবেনা, নিশ্চয় আল্লাহ পাক দ্রুত হিসাব গ্রহণ করবেন।

(১৮) (হে রসূল!) তাদেরকে আসন্ন দিন সম্পর্কে সাবধান করুন, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে তারা তা সংযত রাখতে থাকবে। সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্যে কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই এবং কোন সুপারিশকারীও নেই যার কথা গ্রহণ করা হবে।

(১৯) আল্লাহ পাক জানেন মানুষের গোপন দৃষ্টি এবং যা অন্তরে গোপন থাকে।

(২০) আল্লাহ পাক সঠিকভাবে বিচার করেন, আল্লাহ পাকের স্থলে তারা যাদেরকে ডাকে তারা কোন কিছুরই ফয়সালা করতে পারেনা। নিশ্চয় আল্লাহ পাক সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে কেয়ামতের দিনের ভয়াবহ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে আর এ আয়াতেও কেয়ামতের দিনের কথাই এরশাদ হয়েছে।

اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ط لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ط

কর্মফল ভোগ করতে হবে প্রত্যেককে

আজকের দিনে প্রত্যেককে তার কর্মফল দেয়া হবে অর্থাৎ কেয়ামতের দিন প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করবে, সেদিন কোন প্রকার জুলুম হবেনা কারো প্রতি কোন অবিচার করা হবেনা, কারো নেক আমলের সওয়াব কম করা হবেনা আর কারো পাপকার্যের শাস্তি অধিক পরিমাণে দেয়া হবেনা, আল্লাহ পাক যেমন ওয়াদা করেছেন ঠিক তেমনি প্রত্যেককে তার কর্মের বিনিময় দেয়া হবে। সেদিন ক্ষমতা থাকবে একমাত্র আল্লাহ পাকের, আর আল্লাহ পাকের ক্ষমতায় জুলুম সম্পূর্ণ অচিন্তনীয়।

মূলতঃ ক্ষমতা নিঃসন্দেহে আজও আল্লাহ পাকেরই হাতে তবে দুনিয়াতে আল্লাহ পাক মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি দান করেছেন; মানুষ আল্লাহ পাকের খলীফা বা প্রতিনিধি হয়ে ক্ষমতা পরিচালনা করে, কিন্তু কেয়ামতের দিন নিরঙ্কুশ ক্ষমতা থাকবে একমাত্র আল্লাহ পাকের হাতে।

وَمَآ اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ

'আর আমি বন্দাদের জন্যে আদৌ জালেম নই'।

বস্তুতঃ আল্লাহ পাক অনন্ত অসীম দয়াবান, তিনি পরম দয়ালু, তিনি কখনো কারো প্রতি জুলুম করেন না, তিনি একথাও ঘোষণা করেছেনঃ

غلبت رحمتى على غضبى

'আমার রহমত গজবের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে', তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ করেছেঃ

لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ

আজকের দিনে কারো প্রতি কোন প্রকার জুলুম হবেনা যার যা প্রাপ্য সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে সে তাই পাবে।

আবদ এবনে হোমায়েদ হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, গুনাহ তিন প্রকার (১) যে গুনাহ মাফ করা হবে (২) যে গুনাহ মাফ করা হবেনা (৩) যে গুনাহ থেকে কোন কিছুই ছেড়ে দেয়া হবেনা। যে গুণাহ মাফ করা হবে তা হলো এমন গুনাহ যা করার পর বন্দা আল্লাহ

পাকের দরবারে তওবা এস্তেগফার করে আর যে গুনাহ মাফ করা হবেনা তা হলো শেরক আর যে গুনাহ এতটুকু ছেড়ে দেয়া হবেনা তা হলো মানুষের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের জুলুম। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) একথা বলার পর আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন।[১]

কারো প্রতি জুলুম করোনা

মুসলিম শরীফে সংকলিত একখানি হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের মহান বাণীর উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ হে আমার বন্দাগণ! আমি জুলুম করা আমার উপর হারাম করে নিয়েছি আর তোমাদের উপরও জুলুম করা হারাম করে দিয়েছি অতএব, তোমাদের মধ্যে কেউ যেন কারো প্রতি জুলুম না করে। আরো এরশাদ হয়েছেঃ হে আমার বন্দাগণ! এ হলো তোমাদের আমল সমূহ, আমি এসবের বিনিময় অবশ্যই দান করবো, অতএব যে কল্যাণ লাভ করে সে যেন আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করে আর যে এতদ্ব্যতীত অন্য কিছু পায় সে যেন নিজেকেই তিরস্কার করে।[২]

إِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ

'নিশ্চয় আল্লাহ পাক অতি সত্বর হিসাব গ্রহণকারী'।

অতএব, কারোরই নিজের আমলের হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে গাফেল হওয়া উচিৎ নয় যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ

'মানুষের জন্যে তার হিসাবের সময় নিকটবর্তী হয়েছে অথচ তারা গাফলতের আবর্তে নিপতিত এবং বিমুখ'।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক অতি সত্বর হিসাব গ্রহণের কথা ঘোষণা করেছেন আর অন্য আয়াতে বিষয়টিকে এভাবে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ

অর্থাৎ তোমাদের সৃষ্টি করা এবং তোমাদের মৃত্যুর পর পুনর্জীবন দান করা আমার নিকট এক ব্যক্তিকে সৃষ্টি করে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবন দান করার ন্যায়ই, কেননা আল্লাহ পাকের হুকুম হবার সঙ্গে সঙ্গেই অনতিবিলম্বে তা কার্যকর হয়।

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৮০
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-১৪ পৃষ্ঠা-৩৫

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ ط

'(হে রসূল!) তাদেরকে আসন্ন কেয়ামতের দিন সম্পর্কে সাবধান করুন যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে, তারা তা সংযত রাখতে থাকবে, জালেমদের (কাফেরদের) জন্যে কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই এবং এমন কোন সুপারিশকারীও নেই যার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে'।

কেয়ামত অতি নিকটবর্তী

আলোচ্য আয়াতে কেয়ামতের দিনের ভয়াবহ অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন অতি নিকটবর্তী, সেদিন এত ভয়াবহ হবে যে ভয়ে আতঙ্কে আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ লোকদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে, মহাবিপদের পরিস্থিতি দেখে তাদের প্রাণবায়ু বের হবার উপক্রম হবে আর সেই বিপদের সময় তাদের এমন কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধব থাকবেনা যারা তাদেরকে সাহায্য করতে পারে, এমন কোন সুপারিশকারীও থাকবেনা যাদের সুপারিশ তাদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে।

তফসীরকারগণ বলেছেন, একথা এজন্যে ঘোষণা করা হয়েছে যে কোন কোন কাফেরের এ বিশ্বাস ছিল তাদের বাতিল উপাস্যরা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তাদের পক্ষে সুপারিশ করবে কিন্তু একথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, কাফেরদের পক্ষে সুপারিশ করার অধিকার কারোই থাকবেনা, কাউকেই এর অনুমতি দেয়া হবেনা আর অনুমতি ব্যতীত কেউ সেদিন কোন কথা বলতে পারবেনা, সকলেই নিজ নিজ ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তিত, বিপদগ্রস্ত এবং ক্রন্দণরত থাকবে। যারা দুনিয়াতে আল্লাহ পাকের নাফরমানী করে নিজেদের প্রতি চরম জুলুম করেছে তারা হবে সেদিন সর্বাধিক অসহায়। তাদের কোন বন্ধুও থাকবেনা এবং তাদের পক্ষে সুপারিশকারীও থাকবেনা।

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

'আল্লাহ পাক জানেন মানুষের গোপন দৃষ্টি এবং তাদের অন্তরের গোপনতম প্রকোষ্ঠে যে ভাবনার উদয় হয় তা-ও তিনি জানেন'।

কোন কিছুই আল্লাহ পাকের অজানা নয়

বস্তুতঃ আল্লাহ পাক বিশ্বসৃষ্টির সবকিছুই জানেন, সবই তাঁর নখদর্পণে, কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই এমনকি, কারো অলক্ষ্যে যদি তার প্রতি কেউ দৃষ্টিপাত করে আড়চোখে কাউকে দেখে, সে গোপন দৃষ্টিও আল্লাহ পাক দেখেন আর তখন ঐ

ব্যক্তির মনের গহনে যে ভাবনার অবতারণা হয় তা-ও আল্লাহ পাকের অজানা থাকেনা। উম্মে মা'বাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ দোয়া করতে শুনেছিঃ

اللهم طهرقلبى من النفاق وعملى من الرياء ولسانى من الكذب وعينى من الخيانة فانك تعلم خيانة الاعين وما تخفى الصدور

'হে আল্লাহ! মুনাফেকী থেকে পবিত্র রাখ আমার অন্তরকে এবং আমার আমলকে রিয়া থেকে এবং আমার রসনাকে মিথ্যাবাদীতা থেকে এবং আমার চক্ষুকে খেয়ানত থেকে, কেননা তুমি চক্ষুগুলোর খেয়ানতও জান এবং অন্তর সমূহে যে সব ভাবনা গোপন থাকে তা-ও তুমি জান'।[১]

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, কোন ব্যক্তি কারো বাড়ীতে গমন করলো অথবা অন্য কোথাও কোন স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করলো যা তার জন্যে হারাম, যাকে দেখল সে হয়তো তা দেখেনি আল্লাহ পাক তা দেখেছেন শুধু তাই নয়; তখন তার মনে যে ভাবনার উদয় হয় সে সম্পর্কেও আল্লাহ পাক অবগত থাকেন এক কথায় পৃথিবীর কোন কিছুই আল্লাহ পাকের অজানা নেই, তাই সঠিক বিচার করা একমাত্র আল্লাহ পাকের পক্ষেই সম্ভব। সঠিক জ্ঞান না থাকলে সঠিক বিচার করা যায়না আর ক্ষমতা না থাকলে বিচারের বাস্তবায়নও করা সম্ভব হয়না, আল্লাহ পাক সর্বজ্ঞ, কোন কিছুই তাঁর অবিদিত নয় আর তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী অতএব, তাঁর বিচার কার্যকর হতেও কোন বাধা থাকেনা তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَاللّٰهُ يَقْضِىْ بِالْحَقِّ ط

আর আল্লাহ পাক সঠিকভাবে বিচার করেন, কেননা তিনি মহাজ্ঞানী, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি গোপন ও প্রকাশ্য সব বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত আর এজন্যেই তাঁর বিচার হয় সঠিক এবং নির্ভুল, হেকমতপূর্ণ, তাৎপর্য মন্ডিত।

وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَقْضُوْنَ بِشَىْءٍ ط

'আল্লাহ পাকের স্থলে তারা যাদেরকে ডাকে তারা কোন কিছুরই ফয়সালা করতে পারেনা'।

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৮৪

অর্থাৎ কাফেররা আল্লাহ্ পাকের স্থলে যাদেরকে ডাকে যেমন মূর্তি, শয়তান প্রভৃতিকে তারা ডাকে তারা কোন বিষয়ের ফয়সালা করতে পারেনা, কেননা ফয়সালা করার কোন শক্তিই তাদের মধ্যে নেই। সঠিক ফয়সালা করার জন্যে যে এলম দরকার তা তাদের নেই এবং ফয়সালা কার্যকর করতে যে শক্তি দরকার তা-ও তাদের নেই।

إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

'নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা'।

যেহেতু আল্লাহ্ পাক সব কিছু দেখেন, সব কিছু শোনেন তাই কারো চক্ষুর চুরিও তাঁর অগোচরে থাকেনা। এতে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে সে সব লোকের উদ্দেশ্যে যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুকে উপাস্য মনে করে এবং ডাকে আর তাদের সমলোচনাও রয়েছে এ মর্মে যে, যা কিছু দেখেও না, শোনেও না এমন জড় পদার্থকে কাফেররা উপাস্য মনে করে, এর চেয়ে বড় নির্বুদ্ধিতা আর কিছুই হতে পারেনা।

সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাককে অমান্য করা এবং তাঁর স্থলে জড় পদার্থকে ঠাকুর দেবতা বানিয়ে তার সম্মুখে মাথানত করা শুধু যে নির্বুদ্ধিতা তাই নয়; বরং মানবতার চরম অবমাননা এবং চূড়ান্ত অধঃপতন।

أَوَلَمْ
يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ
كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي
الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۖ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ
مِن وَاقٍ ﴿٢١﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ
فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ ۖ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ
أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٢٣﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَ
هَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ﴿٢٤﴾ فَلَمَّا جَاءَهُم
بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ
وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ ۚ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿٢٥﴾

তরজমা

(২১) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনা? (যদি করতো) তবে দেখত যে তাদের পূর্ববর্তী লোকদের (কাফেরদের) পরিণাম কী হয়েছিল, পৃথিবীতে তারা ছিল এদের চেয়ে শক্তিতে এবং কীর্তিতে অধিকতর প্রবল। অবশেষে আল্লাহ পাক তাদেরকে তাদের পাপাচারের জন্যে পাকড়াও করেছিলেন আর আল্লাহ পাকের শাস্তি থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে পারে এমন কেউ ছিলনা।

(২২) তা এজন্যে যে তাদের নিকট তাদের নবী রসূলগণ নিদর্শন সহ এসেছিলেন কিন্তু তারা তাঁদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, পরিণামে আল্লাহ পাক তাদেরকে পাকড়াও করেন (শাস্তি দেন)। নিশ্চয় তিনি তো শক্তিশালী, শাস্তি প্রদানে কঠোর।

(২৩) আর নিশ্চয় আমি আমার নিদর্শন সমূহ ও প্রকাশ্য প্রমাণ সহ মূসাকে প্রেরণ করেছিলাম-

(২৪) ফেরাউন, হামান এবং কারুণের নিকট, তখন তারা বলে এ-তো এক যাদুকর, অত্যন্ত বড় মিথ্যাবাদী।

(২৫) এরপর মূসা যখন তাদের নিকট আমার তরফ থেকে সত্য কথা নিয়ে উপস্থিত হন তখন তারা বলে, মূসার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা কর এবং তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখ। আর কাফেরদের চক্রান্ত ব্যর্থ হবেই।

তফসীরুল কোরআন

এ আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে এরশাদ করেছেনঃ (হে রসূল!) যে কাফেররা আপনার বিরোধিতা করে, আপনাকে মিথ্যাজ্ঞান করে, মুসলমানদের প্রতি জুলুম অত্যাচার করে, তারা যদি পৃথিবীতে ভ্রমণ করতো, পৃথিবীর অতীত ইতিহাস জানার চেষ্টা করতো এবং যদি তাদের সামান্য জ্ঞান-বুদ্ধিও থাকতো তবে তারা পৃথিবীর অতীত ও বর্তমান ঘটনাবলী লক্ষ্য করে দেখত, ইতোপূর্বেও পৃথিবীতে বহু জাতি তাদেরই ন্যায় আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়েছিল, আল্লাহ পাক তাদের হেদায়েতের জন্যে নবী রসূল প্রেরণ করেছিলেন কিন্তু তারা তাঁদের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছিল, পরিণামে তাদের উপর নেমে এসেছিল ধ্বংস, তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ.....

'তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনা? (যদি করতো) তবে দেখত যে তাদের পূর্ববর্তী (কাফেরদের) পরিণাম কী হয়েছিল'।

কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের তফসীরে বলেছেন, মক্কাবাসী যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মিথ্যাজ্ঞান করে ও তাঁকে এবং তাঁর সাহাবাগণের প্রতি অকথ্য নির্যাতন করে তখন আলোচ্য আয়াতে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ এ কাফেররা কি দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করেনা? যদি তারা ভ্রমণ করতো তবে দেখত যে, ইতোপূর্বে পৃথিবীতে বহু জাতির আগমন হয়েছিল যারা ছিল মক্কার কাফেরদের চেয়ে অধিকতর শক্তি সামর্থ্যের অধিকারী, পৃথিবীতে অনেক কীর্তি তারা রেখে গেছে যা তাদের স্মারণিক হিসেবে আজো বিদ্যমান রয়েছে কিন্তু যখন তাদের নিকট আল্লাহ পাকের

তরফ থেকে নবী রসূলগণ উপস্থিত হন তখন তারা তাঁদেরকে মিথ্যাজ্ঞান করে, আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়। পরিণামে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে পাকড়াও করেন, তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করা হয় যেমন আদ, সামুদ এবং নূহ (আঃ)-এর জাতি প্রভৃতি। যদি মক্কাবাসী সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীকে মিথ্যাজ্ঞান করে তবে তারাও নিস্কৃতি পাবেনা। হে মক্কাবাসী! যদি তোমাদের বর্তমান আচরণ অব্যাহত থাকে তবে তোমাদের শাস্তিও অবধরিত এবং তোমাদের ধ্বংসও অনিবার্য, কেননা সত্যের বিজয় সুনিশ্চিত এবং আল্লাহ্ পাকের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের প্রাধান্য অবশ্যম্ভাবী।

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ

'আর আল্লাহ্ পাকের শাস্তি থেকে তাদেরকে রক্ষা করতে পারে এমন কেউ ছিলনা'।

আল্লাহ্ পাকের কঠিন-কঠোর শাস্তি থেকে কে তাদেরকে রক্ষা করতে পারে? তাই তারা রক্ষা পায়নি; রক্ষা করলে একমাত্র আল্লাহ্ পাকই রক্ষা করতে পারতেন যদি তারা তাঁর নিকট তওবা এস্তেগফার করে হাযির হতো, কিন্তু তা তারা করেনি তাই তারা রক্ষাও পায়নি। পরবর্তী আয়াতে এ কোপগ্রস্ত জাতিগুলোর ধ্বংসের কারণ বর্ণিত হয়েছে আরো বিস্তারিতভাবে, এরশাদ হয়েছেঃ

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَكَفَرُوْا فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ ط

'তা এজন্যে যে তাদের নিকট আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে নবী রসূলগণ নিদর্শন সহ এসেছিলেন কিন্তু তারা তাঁদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, পরিণামে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে পাকড়াও করেন এবং তারা কোপগ্রস্ত হয়'।

اِنَّهٗ قَوِىٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত শক্তিশালী, অবাধ্য অকৃতজ্ঞ নাফরমানদের শাস্তি বিধানে তিনি অত্যন্ত কঠোর। তিনি যা ইচ্ছা তা করতে পারেন, তাঁর ইচ্ছা সর্বত্র কার্যকর হয়, তাঁর ইচ্ছা কার্যকর হতে কোন বাধা আসতে পারেনা, তিনি যেভাবে পরম করুণাময়, ঠিক তেমনি আযাব প্রদানেও কঠিন, কঠোর। যারা তাঁর অনন্ত অসীম নেয়ামত ভোগ করেও তাঁর অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হয়, তাদের জন্যে শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে তাই এ আয়াতে কাফেরদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছেঃ

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۞ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْا سٰحِرٌ كَذَّابٌ

'আর নিশ্চয় আমি আমার নিদর্শন সমূহ ও প্রকাশ্য প্রমাণ সহ মূসা (আঃ)-কে প্রেরণ করেছিলাম ফেরাউন, হামান এবং কারুণের নিকট, কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যাজ্ঞান করে, তারা বলে এ-তো এক যাদুকর, অত্যন্ত বড় মিথ্যাবাদী'।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা

এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এই বলে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, ইতোপূর্বে ফেরাউন, হামান আর কারুণের নিকট হযরত মূসা (আঃ)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং তিনি অনেক মোজেযা এবং সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করেছিলেন কিন্তু এতদসত্বেও তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি; বরং আল্লাহর প্রেরিত নবী রসূলগণের উপর তারা জুলুম-অত্যাচার করেছে। মূসা (আঃ)-কে আল্লাহ পাক এক বিস্ময়কর লাঠি দিয়েছিলেন, এমনিভাবে আরো বহু মোজেযা তাঁকে দেয়া হয়েছিল কিন্তু এ মোজেযা সমূহ দেখে ঈমান আনয়ন তো দূরের কথা, বরং তারা তাঁকে যাদুকর ও মিথ্যাবাদী বলেছিল।

অতএব, (হে রসূল!) যদি মক্কার কাফেররা আপনাকে মিথ্যাজ্ঞান করে তবে তা নতুন কিছু নয়; বরং যারাই কাফের মুশরেকদেরকে সরল পথের দিকে আহবান করেছেন তাদেরকেই মিথ্যাজ্ঞান করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ যারাই আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবী রসূলগণের সঙ্গে মন্দ আচরণ করেছে তারাই ধ্বংস হয়েছে যেমন ফেরাউন এবং তার দলবল লোহিত সাগরে নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংস হয়েছে আর কারুণকে ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দেয়া হয়। পরবর্তী আয়াত সমূহে আল্লাহ পাক এ ঘটনাটিকে আরো বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেনঃ

فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوْٓا اَبْنَآءَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ وَاسْتَحْيُوْا نِسَآءَهُمْ ط

'এরপর মূসা (আঃ) যখন তাদের নিকট আমার তরফ থেকে সত্য কথা নিয়ে উপস্থিত হন তখন তারা বলে, মূসার (আঃ) সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা কর এবং তাদের নারীদের জীবিত রাখ'।

কাফেরদের চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েই থাকে

হযরত মূসা (আঃ) যখন আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে সত্য দ্বীন নিয়ে তাঁর জাতির নিকট উপস্থিত হন তখন ফেরাউনের পরামর্শদাতারা বললো যে, মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে যারা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত, তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করা হোক আর তাদের কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত রাখা হোক যেন নারীদেরকে পরিচারিকা হিসেবে ব্যবহার করা যায়। ফেরাউন এ পন্থা হযরত মূসা (আঃ)-এর জন্মের পূর্বেও গ্রহণ করেছিল যাতে করে মুসা (আঃ)-কে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করা হয়। ফেরাউন তখন বনী ইসরাঈলের ৯০ হাজার নবজাতককে হত্যা করেছিল।[১]

কিন্তু আল্লাহ্ পাকের হুকুম যখন হয় তখন তিনি হযরত মূসা (আঃ)-কে পয়দা করেন এবং তাঁর হেফাজত করেন এমনকি, জালেম ফেরাউনের বাড়ীতে রেখেই তাঁর লালন-পালন করেন। তখন ফেরাউনের চক্রান্ত সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। আর যখন হযরত মূসা (আঃ) সত্য দ্বীন নিয়ে আগমন করলেন তখন ফেরাউনের তরফ থেকে নতুন করে পুরনো কর্মসূচী গ্রহণ করা হলো যে, বনী ইসরাঈলের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা এবং কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত রাখা হোক। এবারের কর্মসূচীর কয়েকটি লক্ষ্য হলঃ

(১) বনী ইসরাঈলের জনসংখ্যা যাতে হ্রাস পায় এবং তারা কখনো বিদ্রোহী হতে সক্ষম না হয়, (২) এভাবে বনী ইসরাঈলের উপর নির্যাতনের মাধ্যমে তাদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়া যায়, (৩) বনী ইসরাঈলের মধ্যে যেন এ ধারণা জন্মে যে মূসা (আঃ)-এর কারণেই আমাদের যত দুঃখ দুর্দশা-এ ধারণার কারণে বনী ইসরাঈল জাতি মূসা (আঃ)-এর সঙ্গ ত্যাগ করবে, ফলে মূসা(আঃ) দুর্বল এবং অসহায় হয়ে পড়বেন।

কিন্তু আল্লাহ্ পাক কাফেরদের সমস্ত অপচেষ্টা ব্যর্থ করে দেন, ফেরাউন ও তার দলবলের সলিল সমাধি ঘটে এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর অনুসারীরা মিশরের রাজত্বের অধিকারী হয়, তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ

'আর কাফেরদের চক্রান্ত ব্যর্থ হবেই'।

১। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন, তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-১, ২৯৬-৩০২

এতেও রয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে সান্ত্বনা, যেভাবে হযরত মূসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে ফেরাউনের চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে ঠিক তেমনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে মক্কার কাফেরদের চক্রান্তও অবশেষে ব্যর্থ হবে, কেননা কাফেরদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েই থাকে।[১]

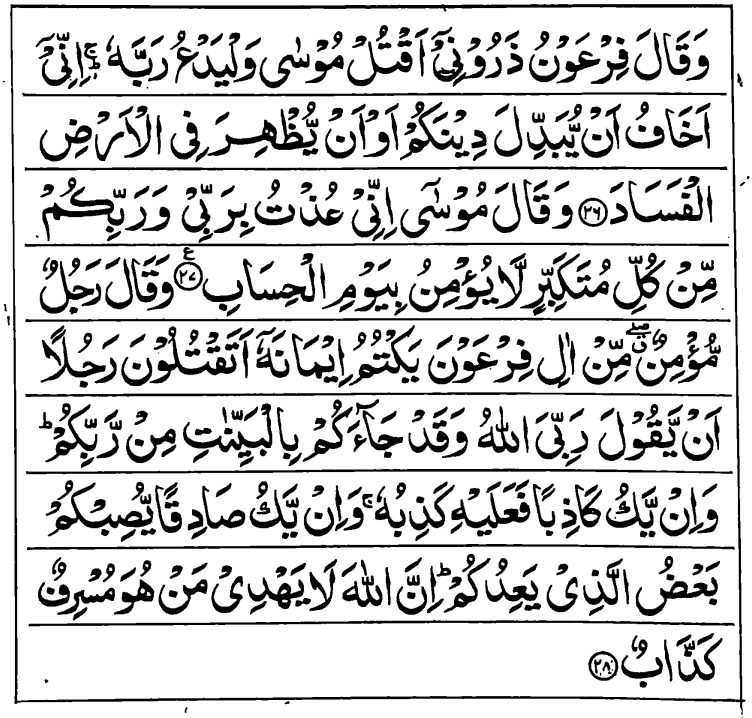

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيْٓ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ ۚ اِنِّيْٓ
اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُّظْهِرَ فِى الْاَرْضِ
الْفَسَادَ ﴿٢٦﴾ وَقَالَ مُوْسٰٓى اِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ
مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٢٧﴾ وَقَالَ رَجُلٌ
مُّؤْمِنٌ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗٓ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا
اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّيَ اللّٰهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ ؕ
وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ ۚ وَاِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ
بَعْضُ الَّذِيْ يَعِدُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ
كَذَّابٌ ﴿٢٨﴾

তরজমা

(২৬) আর ফেরাউন বললো, আমাকে ছেড়ে দাও আমি মূসাকে হত্যা করবো, সে তার প্রতিপালককে ডাকতে থাকুক। আমি আশঙ্কা করি যে, সে তোমাদের ধর্মে পরিবর্তন ঘটাবে অথবা সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করবে।

১ তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৪ পৃষ্ঠা-৩৮
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-২২৯
রুহুল মাআনী খন্ড-২৪, পৃষ্ঠা-৬২

(২৭) আর মূসা (আঃ) বললেন, যারা বিচারের দিনে বিশ্বাস করেনা সে সব অহংকারী লোক থেকে আমি আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের পানাহ চাই।

(২৮) আর ফেরাউন বংশের এক ব্যক্তি যে মোমেন ছিল সে তার ঈমানকে গোপন রাখছিল। বললো, তোমরা কি শুধু এজন্যেই এক ব্যক্তিকে মেরে ফেলতে চাও যে বলে, আল্লাহ পাকই আমার প্রতিপালক, অথচ সে তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ সহ তোমাদের নিকট এসেছে, যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে তার মিথ্যাবাদীতার জন্যে সে নিজেই দায়ী হবে আর যদি সে সত্যবাদী হয় তবে সে তোমাদেরকে যে শাস্তির কথা বলে তার কিছু তো তোমাদের উপর আপতিত হবেই। (মনে রেখ) নিশ্চয় আল্লাহ পাক সীমালঙ্ঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে হেদায়েত করেন না।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, হযরত মূসা (আঃ) যখন আল্লাহ পাকের নির্দেশক্রমে সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ নিয়ে ফেরাউনের নিকট উপস্থিত হলেন এবং ফেরাউন ও তার দলবলকে তৌহীদে বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানালেন তখন ফেরাউন তাঁর প্রতি ঈমান আনা তো দূরের কথা; বরং সে হযরত মূসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত হয়, আল্লাহ পাক ঘোষণা করলেন এ চক্রান্ত অবশ্যই ব্যর্থ হবে।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ ফেরাউন তার পারিষদবর্গকে বললো, তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও অর্থাৎ তোমরা আমাকে বাধা দিওনা, আমি মূসা (আঃ)-কে হত্যা করতে চাই, সে তার প্রতিপালককে ডাকুক, দেখি তার প্রতিপালক কী করতে পারে, মূসা (আঃ)-কে আর এমন স্বাধীনতা দেয়া যায়না, যদি এমন স্বাধীনতা সে ভোগ করতে থাকে তবে আমার আশঙ্কা হয় যে, সে তোমাদের ধর্ম বিশ্বাসে ফাটল ধরিয়ে দেবে। এতদ্ব্যতীত তার অবাধ স্বাধীনতার কারণে সে দেশে অশান্তি সৃষ্টি করবে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হবেনা, অতএব, তাকে আর ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করার সুযোগ দেয়া যায়না, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِىٓ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ

'আর ফেরাউন বললো, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসা (আঃ)-কে হত্যা করবো, সে তার প্রতিপালককে ডাকতে থাকুক'।

অর্থাৎ ফেরাউন তার পারিষদবর্গকে বললো, তোমরা আমাকে অনুমতি দাও আমি মূসাকে হত্যা করতে চাই, সে তার সাহায্যের জন্যে তার প্রতিপালককে ডাকুক। ফেরাউনের বর্ণনা-ভঙ্গী দ্বারা একথা প্রতীয়মান হয় যে, তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা হযরত মূসা (আঃ)-এর মোজেযা দেখে এবং তাঁর সারগর্ভ ভাষণ শ্রবণ করে বেশ প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল এবং মূসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করলে তাঁর প্রতিপালক তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারেন বলে তারা ভয় করছিল, তাই ফেরাউন একথা বলেছে, 'তোমরা আমাকে বাধা দিওনা, আমি মূসাকে চিরদিনের জন্যে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দেই'।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ ফেরাউন একথাটি এজন্যে বলেছে যে, তার পারিষদবর্গের মধ্যে কিছু লোক মূসা (আঃ)-কে হত্যা করার ব্যাপারে তাকে বাধা দিচ্ছিল, কেননা তাদের ধারণা ছিল মূসা (আঃ)-কে হত্যা করা হলে তাদের ধ্বংস হবে অনিবার্য, তারা ফেরাউনকে বলতো, যদি আপনি মূসা (আঃ)-কে হত্যা করেন তবে লোকেরা ধারণা করবে যে, আপনি মূসা (আঃ)-কে মোকাবেলা করতে অক্ষম এজন্যে তাকে হত্যা করেছেন, এতে জনগণের মধ্যে আপনার দুর্বলতা প্রকাশ পাবে।

আল্লামা বয়যাভী (রঃ) লিখেছেনঃ ফেরাউনের উক্তি দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, ফেরাউনের অন্তরে মূসা (আঃ)-এর নবুওয়্যতের প্রতি একীন ছিল, এজন্যে সে মূসা (আঃ)-কে হত্যা করতে ভয় করতো অথবা সে মনে করতো, মূসা (আঃ)-কে হত্যা করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়, যদি সে মূসা (আঃ)-কে হত্যার ইচ্ছাও করে এবং তার চেষ্টাও করে তবে হয়তো তার চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। এজন্যে সে কথাটি এভাবে বলেছে, 'তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মুসাকে হত্যা করি', তার এ উক্তি ছিল প্রতারণামূলক, সে দেখাতে চেয়েছিল যে, সে যে কোন সময় তাকে হত্যা করতে পারে কিন্তু তার পারিষদবর্গ তাকে বাধা দিচ্ছিল অথচ প্রকৃত অবস্থা এই যে, তাকে যে বিষয়টি হযরত মূসা (আঃ)-কে হত্যা করতে বাধা দিয়েছিল তা ছিল হযরত মূসা (আঃ)-এর লাঠির প্রতি তার ভয়, কেননা এ লাঠিটিকে সে বিশালকায় অজগরে পরিণত হতে দেখেছিল।

إِنِّيٓ أَخَافُ أَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ أَوْ أَنْ يُّظْهِرَ فِى الْأَرْضِ الْفَسَادَ

'আমি আশঙ্কা করি যে সে তোমাদের ধর্মে পরিবর্তন ঘটাবে অথবা সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করবে'।

অর্থাৎ যদি আমি তাকে হত্যা না করি তবে তোমরা যে ধর্ম বিশ্বাসে রয়েছ তাতে সে পরিবর্তন ঘটাবে অথবা সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করবে, নিজেদের ধর্ম বিশ্বাস রক্ষা-কল্পে দেশ ও জাতির স্বার্থে তাকে হত্যা করা একান্ত জরুরী।

শান্তি লাভের পন্থা

আল্লামা কান্দলভী (রঃ) লিখেছেন, এটি অত্যন্ত বিস্ময়কর বিষয় যে, বাতিলপন্থীরা আল্লাহর নবীর হেদায়েতকে 'ফাসাদ' বা অশান্তি বলে আখ্যায়িত করেছে অথচ আল্লাহর নবীর হেদায়েত মেনে চললে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে শান্তি লাভ করা যায়, শান্তি লাভের একমাত্র পন্থাই হলো বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা এবং তাঁর প্রেরিত রসূলের পরিপূর্ণ অনুসরণ করা, এটিই শান্তি লাভের পন্থা কিন্তু যারা পথভ্রষ্ট, যারা আদর্শচ্যুত, যারা দিশেহারা তারা শান্তির পথকেই অশান্তি বলে বেড়ায় আর এ অবস্থা শুধু সে যুগের ফেরাউনদেরই নয়; বরং সকল যুগের ফেরাউনদেরও এই একই চিন্তাধারা।[১]

আল্লামা কান্দলভী (রঃ) একথাও লিখেছেনঃ হযরত মূসা (আঃ) তাঁর নবুওয়্যতের যে সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করেছিলেন তা মেনে নিতে ফেরাউনের দলবল যে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল, তার কারণ হলো ফেরাউনের দম্ভ ও অহংকার এবং ক্ষমতাহারা হবার আশঙ্কা। ফেরাউন হযরত মূসা (আঃ)-এর মোজেযা দেখে ভীত হয়েছিল এবং তাঁকে হত্যা করতে ভয় করছিল কিন্তু তা না বলে পারিষদবর্গের বাধা দানের কথা বলেছিল।

বস্তুতঃ যুগে যুগে এ সত্যই প্রমাণিত হয়েছে যে, যখনই এবং যারাই সত্য দ্বীনকে বাধা দিয়েছে তা হয় তাদের অহংকারের কারণে অথবা ক্ষমতাচ্যুত হবার আশঙ্কায়। বদরের যুদ্ধের দিন রণাঙ্গনে উমাইয়া এবনে খালফ আবু জেহেলকে এ প্রশ্নটিই করেছিল যে, তোমার ভ্রাতঃস্পুত্র নবুওয়তের দাবীদার মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে তোমার অন্তরের কথাটি কি? এখানে আমি ব্যতীত আর কেউ নেই, অতএব তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে তোমার অন্তরের কথাটি বলতে পার। তখন আবু জেহেল বলেছিল, 'আমার কোন সন্দেহ নেই যে, মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) সত্য কথাই বলে', তখন উমাইয়া এবনে খালফ বললো, 'তবে তা মেনে নিতে বাধা কোথায়'? আবু জেহেল বলেছিল, 'যদি তাকে মেনে নেই তবে আমাদের নেতৃত্ব থাকে কোথায়'? আর এই একই অবস্থা হয়েছিল ফেরাউনের।

বস্তুতঃ পৃথিবীতে সত্য-বিরোধিতা, কলহ-দ্বন্দ্ব এমনকি, যুদ্ধ-বিগ্রহ হয় মানুষের অর্থ লোভ, ক্ষমতার লিপ্সা ও অহংকারের কারণে, এজন্যে পরবর্তী আয়াতে হযরত

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৪, পৃষ্ঠা-৬২
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-২২৯-৩০
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৬ পৃষ্ঠা-১২৪

মূসা (আঃ)-এর কথার বর্ণনা রয়েছে, তিনি ফেরাউনের কথা শুনে বলেছিলেন, আমি সকল অহংকারীর অকল্যাণ থেকে আল্লাহ পাকের পানাহ চাই, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَقَالَ مُوْسٰٓى اِنِّىْ عُذْتُ بِرَبِّىْ وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ

'আর মূসা (আঃ) বললেন, যারা বিচারের দিনে বিশ্বাস করেনা সে সব অহংকারী লোক থেকে আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের পানাহ চাই'।

বস্তুতঃ আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ এবং আখেরাতে অবিশ্বাসী অহংকারী লোকদের অকল্যাণ থেকে আত্মরক্ষার একমাত্র পথ হলো বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করা। তিনি আশ্রয় দিলে কেউ ক্ষতি করতে সমর্থ হবেনা আর তিনি আশ্রয় না দিলে কেউ রক্ষাও করতে পারবেনা। হযরত মূসা (আঃ) ফেরাউনের জুলুম-অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার্থে আল্লাহ পাকের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন কিন্তু এ দোয়ায় ফেরাউনের নাম উচ্চারণ করেননি; বরং সাধারণভাবে বলেছেন, যে অহংকারী এবং যে আখেরাতে বিশ্বাস করেনা তার অকল্যাণ থেকে আল্লাহ পাকের আশ্রয় চাই, এতে ফেরাউন এসে গেছে এবং এছাড়া যত অহংকারীও আখেরাতে অবিশ্বাসী রয়েছে তাদের থেকেও আল্লাহ পাকের আশ্রয় কামনা করা হয়েছে। এতে একথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, ফেরাউনের অন্যায় অনাচারের মূল উৎস হলো দম্ভ, অহংকার এবং আখেরাতের প্রতি অবিশ্বাস। ফেরাউনের দম্ভোক্তিতেই একথার প্রমাণ রয়েছে আর এজন্যেই হযরত মূসা (আঃ) অত্যন্ত নির্ভীক চিত্তে একথা ঘোষণা করেন যে, ফেরাউন যত শক্তিশালীই হোক সে আমার কোন ক্ষতিই করতে পারবেনা, কেননা আমার ও তোমাদের সকলের প্রতিপালক সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের আশ্রয় নিয়েছি আর আল্লাহ পাক আমাকে এবং আমার ভাইকে ফেরাউনের নিকট প্রেরণের সময় বলেছিলেন, لَا تَخَافَآ اِنَّنِىْ مَعَكُمَآ اَسْمَعُ وَاَرٰى

'তোমরা ভয় করোনা আমি তোমাদের সঙ্গে রয়েছি, সব কিছু শ্রবণ করছি এবং দেখছি'।

মহান আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যাকে এমন অভয় বাণী শোনানো হয় তাঁর কোন অহংকারীর হুংকারে ভীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗٓ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ ۚ وَاِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِىْ يَعِدُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ

'আর ফেরাউনের বংশের এক ব্যক্তি যে মোমেন ছিল সে তার ঈমানকে গোপন রাখছিল বললো, তোমরা কি শুধু এজন্যেই এক ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাও, যে বলে আল্লাহ পাকই আমার প্রতিপালক অথচ সে তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ সহ তোমাদের নিকট এসেছে, সে যদি মিথ্যাবাদী হয় তবে তার মিথ্যাবাদীতার জন্যে সে নিজেই দায়ী হবে, আর যদি সে সত্যবাদী হয় তবে সে তোমাদেরকে যে শাস্তির কথা বলে তার কিছু তো তোমাদের উপর আপতিত হবেই। (মনে রেখ) নিশ্চয় আল্লাহ পাক সীমালঙ্ঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে হেদায়েত করেননা'।

পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত মূসা (আঃ)-এর উল্লেখ ছিল যে, তিনি ফেরাউনের নিকট সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ নিয়ে উপস্থিত হন ফলে হক্ব ও বাতিলের পার্থক্য প্রকাশিত হয়। ফেরাউন ও তার দলবল তখন আশঙ্কা করে যে হয়তো লোকে হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমান এনে ফেলবে আর তার পরিণতি হবে ফেরাউনের পতন তাই সে হযরত মূসা (আঃ)-কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো, প্রকাশ্যে সে একথা ঘোষণাও করলো, সে মজলিশে ছিল ফেরাউনের স্বজাতি এক মোমেন ব্যক্তি যে তার ঈমানকে গোপন রেখেছিল, সে বললো, হে ফেরাউন! তুমি কি একজন লোককে শুধু এজন্যে হত্যা করবে, যে আল্লাহ পাককে একমাত্র প্রতিপালক মনে করে আর এটিই কি তাঁর একমাত্র অপরাধ? অথচ সে তার বক্তব্যের স্বপক্ষে সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করেছে আর এখানে এ বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে তার শাস্তি তাকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে। পক্ষান্তরে, যদি সে সত্যবাদী হয় তবে তার বর্ণিত শাস্তির কিছু অংশ তো অবশ্যই তোমাদের উপর আপতিত হবে তখন তোমাদের কী অবস্থা হবে?

তফসীরকারগণ বলেছেন, যে ব্যক্তি ফেরাউনকে এ সত্য কথাটি বলেছিল সুদ্দী (রঃ)-এর মতে, সে ছিল ফেরাউনের চাচাত ভাই। বর্ণিত আছে যে, সে হযরত মূস। (আঃ)-এর সঙ্গে নাজাত পেয়েছিল।

ইমাম এবনে জরীরও এ মতই পছন্দ করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যদি এ ব্যক্তি বনী ইসরাঈলের হতো তবে ফেরাউন তার বক্তব্য শুনে ধৈর্যের পরিচয় দিতনা; বরং তার প্রতি জুলুম অত্যাচার করতো।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) আরো বলেছেন, ফেরাউনের বংশে এই এক ব্যক্তি ঈমানদার ছিল এবং ফেরাউনের স্ত্রী দ্বিতীয় ঈমানদার ছিল। তৃতীয় হলো সে ব্যক্তি যে হযরত মূসা (আঃ)-কে তাঁর হত্যার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত করেছিল। ফেরাউনের বংশে এ তিনজনই মোমেন ছিল।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ মোমেন ব্যক্তি ছিল কিবতী, আর এ ব্যক্তি সম্পর্কেই 'সূরা কাসাসে' এরশাদ হয়েছেঃ

وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ يَسْعٰى

বর্ণিত আছে যে, তার নাম ছিল হাবিব। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ ব্যক্তি বনী ইসরাঈলী ছিল, তার নাম ছিল জাঝইল। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম এ মতই পোষণ করতেন। এবনে এসহাক বলেছেন, তার নাম ছিল খাবুর।

আয়াতের মর্মকথা

ঐ ব্যক্তি তার ঈমানকে গোপন রেখেছিল তাই সে ফেরাউন ও তার দলবলকে উপদেশ দিয়েছিল যে, তোমরা কি এমন লোককে হত্যা করতে চাও যে বলে আমার প্রতিপালক শুধু এক আল্লাহ পাক, আর যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, লালন-পালন করেছেন তাঁর তরফ থেকে সে অনেক মোজেযা অনেক দলিল-প্রমাণ সহ উপস্থিত হয়েছে। সে আল্লাহ পাকের রসূল হওয়ার দাবী করে, তোমাদের ধারণায় যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে ঐ মিথ্যাবাদীতার পরিণতি শুধু তাকেই ভোগ করতে হবে। এতে তোমাদের কোন ক্ষতি হবেনা, অতএব তাকে হত্যা করার কোন যুক্তিই নেই, আর যদি সে তার দাবীতে সত্য হয় যা তার মোজেযা এবং দলিল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয় আর তোমরা তাকে মিথ্যাজ্ঞান কর এমন অবস্থায় তোমাদের প্রতি সে আযাব আপতিত হবে যে সম্পর্কে তোমাদেরকে সে ভয় প্রদর্শন করছে।

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক সীমালঙ্ঘনকারী, মিথ্যাবাদীকে হেদায়েত করেন না"।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৪ পৃষ্ঠা-৩৯

অর্থাৎ যদি মূসা (আঃ) মিথ্যাবাদী হতেন তবে আল্লাহ পাক তাঁকে মোজেযা প্রদর্শনের শক্তি দিতেন না এমনকি মোজেযা সম্পর্কে তিনি কিছুই জানতেন না, যদি তিনি সীমালঙ্ঘনকারী, মিথ্যাবাদী হতেন তবে আল্লাহ পাক তাঁকে কোন প্রকার সাহায্য করতেন না, বরং তাকে ধ্বংস করতেন, তাঁকে তোমাদের হত্যা করার কোন প্রয়োজনই হতো না।

ওরওয়া এবনে যোবায়ের বর্ণনা করেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ এবনে আমর এবনুল আস (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে আপনি আমাকে বলুন, মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে সবচেয়ে মন্দ ব্যবহার কোন্‌টি করেছিল। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেন, একদিন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কা'বা শরীফ প্রাঙ্গণে নামাজ পড়ছিলেন। এমন সময় আকাবা এবনে মুয়ীত সেখানে এসেছিল। সে তাঁর চাদরটি তাঁর গর্দান মোবারকে পেঁচিয়ে নিল এবং জোরে টানতে লাগলো এবং তাঁর শ্বাসরুদ্ধ হবার উপক্রম হল। ঠিক এমন সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) আসলেন এবং সজোরে আকাবা এবনে আবি মুয়ীতের গর্দান ধরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে সরিয়ে দিলেন এবং বললেন,

أَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا أَنْ يَّقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ

(তোমরা কি এমন ব্যক্তিকে হত্যা কর, যিনি বলেন আমার প্রতিপালক এক আল্লাহ পাকই।)

একদিন হযরত আলী (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, সবচেয়ে বড় বীর পুরুষ কে? উপস্থিত লোকেরা বললো, আমরা জানিনা। হযরত আলী (রাঃ) বললেন, সবচেয়ে বড় বীর পুরুষ হলেন হযরত আবুবকর (রাঃ)। আমি নিজে দেখেছি মক্কার কয়েক জন কাফের হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অত্যন্ত জোরে টেনে নিচ্ছিল এবং বলছিল, তুমি কি আমাদের সকল মা'বুদকে এক করে দিয়েছ? অর্থাৎ সকল মাবুদকে বর্জন করে এক মা'বুদকে অবলম্বন করেছ? তখন আমরা কেউ তাঁর নিকট যাইনি। হযরত আবুবকর (রাঃ) একা গিয়েছেন। এক কাফেরকে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন, আর দ্বিতীয়টিকে ধরে সরিয়ে দিয়েছেন, এরপর আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেছেনঃ

أَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا أَنْ يَّقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ

এ ঘটনা বর্ণনা করার পর হযরত আলী (রাঃ) অনেকক্ষণ ক্রন্দন করলেন, তাঁর অশ্রুতে দাঁড়িগুলো ভিজে যায়। এরপর বললেন, আমি তোমাদেরকে শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি ফেরাউনের বংশের ঐ ব্যক্তি উত্তম ছিল? না আবুবকর? সমস্ত লোক তখন নীরব ছিল। তখন হযরত আলী (রাঃ) বললেন, তোমরা জবাব কেন দাওনা? আল্লাহর শপথ! হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর একটি ঘন্টা ফেরাউন বংশীয় মোমেনের সারা জীবনের চেয়ে উত্তম, কেননা সে তো তাঁর ঈমান গোপন রেখেছিল, হযরত আবুবকর (রাঃ) তাঁর ঈমানের কথা ঘোষণা করেছিলেন।[১]

يٰقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظٰهِرِيْنَ فِي الْاَرْضِ
فَمَنْ يَّنْصُرُنَا مِنْۢ بَاْسِ اللّٰهِ اِنْ جَآءَنَا ؕ قَالَ فِرْعَوْنُ
مَآ اُرِيْكُمْ اِلَّا مَآ اَرٰى وَمَآ اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ ﴿٢٩﴾
وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ
يَوْمِ الْاَحْزَابِ ﴿٣٠﴾ مِثْلَ دَاْبِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ
وَالَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ؕ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ﴿٣١﴾
وَيٰقَوْمِ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿٣٢﴾

তরজমা

(২৯) হে আমার জাতি! আজ রাজত্ব তোমাদের, দেশের মধ্যে তোমরাই প্রবল কিন্তু যদি আমাদের উপর আল্লাহ পাকের শাস্তি এসে পড়ে তবে কে আমাদেরকে সাহায্য করবে? ফেরাউন বললো, আমি যা ভাল মনে করি তোমাদেরকে তাই বলছি, এবং আমি তোমাদেরকে শুধুমাত্র কল্যাণ-পথই দেখিয়ে থাকি।

(৩০) মোমেন ব্যক্তি বললো, হে আমার জাতি! আমি তোমাদের জন্যে পূর্ববর্তী জাতিগুলোর শাস্তির দিনের অনুরূপ দুর্দিনের আশঙ্কা করছি।

[১] তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-২২৩

(৩১) নূহ, আদ, সামুদ এবং তাদের পূর্ববর্তীদের ক্ষেত্রে যেমন ঘটেছিল, আর আল্লাহ পাক কারো প্রতিই জুলুম করেন না।

(৩২) হে আমার জাতি! নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্যে আশঙ্কা করি কেয়ামতের দিনের।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে ফেরাউনের স্ব-জাতি একজন মোমেন ব্যক্তির উক্তির উল্লেখ ছিল যে তার ঈমানকে গোপন রেখেছিল এবং ফেরাউনকে উপদেশ দিয়েছিল যেন সে হযরত মূসা (আঃ)-কে হত্যা করার চক্রান্তে লিপ্ত না হয়। এ আয়াতেও ফেরাউনের আত্মীয় সে মোমেন ব্যক্তির আরো কিছু উক্তির উল্লেখ রয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

يٰقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظٰهِرِيْنَ فِى الْاَرْضِ

হে আমার জাতি! আজ রাজত্ব তোমাদের, দেশের মধ্যে তোমরাই প্রবল কিন্তু যদি (তোমাদের অন্যায়-অনাচারের পরিণামে) আমাদের উপর আল্লাহ পাকের শাস্তি এসে পড়ে তবে কে আমাদেরকে সাহায্য করবে? অতএব, তোমাদের পরিণামদর্শী হওয়া উচিত, যে কাজে চরম বিপদের আশঙ্কা রয়েছে এমন কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত।

فَمَنْ يَّنْصُرُنَا مِنْۢ بَاْسِ اللّٰهِ اِنْ جَآءَنَا ؕ

এ মোমেন ব্যক্তি যদিও ফেরাউনের আত্মীয় ছিল এবং নিজের ঈমানকে গোপন রেখেছিল, সে উপদেশ প্রদানের সময় নিজেকে তাদের অন্তর্ভুক্ত বলেই প্রকাশ করছিল, তাই ينصرنا শব্দটি ব্যবহার করেছে যার অর্থ হলো আল্লাহর আযাবের মোকাবেলায় কে আমাদেরকে সাহায্য করবে? অর্থাৎ যদি অবশেষে আল্লাহর আযাব আপতিত হয় তখন তা সামগ্রিক ভাবে সকলের উপর আসবে। সে আযাব থেকে কেউ আমাদেরকে রক্ষা করতে পারবেনা। অতএব, আল্লাহর নবী মূসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে কোন প্রকার চক্রান্ত করা আদৌ সমীচিন হবেনা।

قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ اُرِيْكُمْ اِلَّا مَآ اَرٰى وَمَآ اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ

'ফেরাউন বললো, আমি যা ভাল মনে করি তাই তোমাদের বলছি এবং আমি তোমাদেরকে শুধুমাত্র কল্যাণ-পথই দেখিয়ে থাকি'।

অর্থাৎ আমি তোমাদের বক্তব্য শুনে তোমাদের মনোভাব সম্পর্কে অবগত হলাম কিন্তু আমার সিদ্ধান্তে আমি অটল, তোমাদের স্বার্থে আমি যা ভাল মনে করি এবং যে পথে তোমাদের কল্যাণ রয়েছে বলে বুঝি তাই আমি তোমাদেরকে বলি। অতএব, আমার মতে, মূসা (আঃ)-কে হত্যা করাই যুক্তিসঙ্গত।

سَبِيْلَ الرَّشَادِ অর্থাৎ এটিই সঠিক পথ।

وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ ۝ مِثْلَ دَاْبِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۭ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ

'মোমেন ব্যক্তি বললো, 'হে আমার জাতি! আমি তোমাদের জন্যে পূর্ববর্তী জাতিগুলোর অনুরূপ দুর্দিনের আশঙ্কা করছি যেমন নূহ, আদ, সামুদ এবং তাদের পূর্ববর্তীদের ক্ষেত্রে ঘটেছিল আর মনে রেখ আল্লাহ পাক কারো প্রতিই জুলুম করেন না'।

একথার তাৎপর্য হলো, তোমরা যেভাবে মূসা (আঃ)-এর বিরোধিতা করছো, এভাবে নূহ, আদ সামুদ জাতিও তাদের নিকট প্রেরিত রসূলগণের বিরোধিতা করেছিল, পরিণামে তাদের প্রত্যেকের উপর আল্লাহ পাকের আযাব আপতিত হয়েছে, আল্লাহর অসন্তুষ্টি যাদের প্রতি চরম পর্যায়ে পৌঁছে তারাই শাস্তি ভোগ করে, আমি তোমাদের ব্যাপারেও এমনি শাস্তির আশঙ্কা করছি। পৃথিবীতে সকল যুগেই দূত হত্যা করাকে অমার্জনীয় অপরাধ বলে মনে করা হয়, তোমরা আল্লাহ পাকের দূতকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছো এমন অবস্থায় তোমাদের পরিণাম কত ভয়াবহ হবে তা সহজেই অনুমেয়। আর তোমাদেরকে চরমতম শাস্তি দেয়া হলেও তা জুলুম হবেনা। কেননা,

وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ

(আল্লাহ পাক কারো প্রতিই জুলুম করেন না)

যদি তোমাদেরকে ধ্বংস করা হয় তবে তা হবে তোমাদের অন্যায়-অনাচারের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। নূহ (আঃ)-এর জাতি, আদ এবং সামুদ জাতি এবং তাদের পর লূত (আঃ)-এর জাতি ও নমরুদ গয়রহ যখন আল্লাহ পাকের অবাধ্য হয়েছে, তাদের নিকট প্রেরিত নবী রসূলগণের বিরোধিতা করেছে তখনই তাদের প্রতি আযাব

এসেছে, তাই আল্লাহ পাক তাদের প্রতি জুলুম করেননি। যদি কোন অপরাধ ব্যতীত কাউকে শাস্তি দেয়া হয় অথবা কোন জালেমকে শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয় কিংবা কোন ব্যক্তির নেক আমলের সওয়াব কম দেয়া হয় বা কোন অপরাধীকে তার অপরাধের চেয়ে অধিক শাস্তি দেয়া হয় তবে তাকে জুলুম বলা হয়। আর আল্লাহ পাক কোনভাবেই বন্দার প্রতি জুলুম করেন না।

وَيٰقَوْمِ اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ

'হে আমার জাতি! নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্যে কেয়ামতের দিনের আশঙ্কা করি'।

কেয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশের জন্যে প্রত্যেকটি মানুষের ডাক পড়বে, প্রত্যেককে আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হতে হবে এবং জীবনের প্রতিটি কর্মকান্ডের জন্যে জবাবদেহী করতে হবে। ঈমান ও নেক আমল থাকলে পুরস্কার তথা চিরসুখ ও শান্তির কেন্দ্র জান্নাত লাভ হবে। পক্ষান্তরে, ঈমান না থাকলে চিরশাস্তি ও চিরদুঃখের কেন্দ্র দোযখ অবধারিত হবে। জান্নাতীগণ জান্নাতে প্রবেশের পর এবং দোযখীরা দোযখে নিক্ষিপ্ত হবার পর প্রত্যেককে ডাক দিয়ে বলা হবে, হে বেহেশতের অধিবাসীগণ! তোমরা চিরদিন বেহেশতে থাকবে, কখনো বেহেশতের সুখ-শান্তি থেকে তোমাদেরকে বঞ্চিত করা হবেনা, আর দোযখবাসীদেরকে বলা হবে, হে দোযখবাসীরা! তোমরা চিরদিন দোযখে থাকবে, তোমাদের মৃত্যু নেই এবং দোজখ থেকে কখনো রেহাই পাবেনা।

যেহেতু হিসাব গ্রহণের জন্যে কেয়ামতের দিন প্রত্যেকটি মানুষকে ডাক দেয়া হবে এবং বেহেশতবাসী ও দোযখীদেরকে ডাক দিয়ে উপরোক্ত কথাগুলো বলা হবে তাই কেয়ামতের দিনকে يوم التناد বলা হয়েছে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ কেয়ামতের দিনকে এজন্যে يوم التناد বলা হয়েছে যে, সেদিন প্রত্যেক দল লোককে তাদের নেতাসহ ডাকা হবে, আর এভাবে ডাকা হবে, হে অমুক অমুক পাপের পাপীষ্ঠরা! তখন যে পাপের উল্লেখ করা হবে সে পাপে দুনিয়াতে যারা লিপ্ত ছিল তাদেরকে একত্রিত করে দাঁড় করানো হবে। এমনিভাবে অন্য গুনাহর উল্লেখ করেও লোকদেরকে ডাকা হবে যারা সে গুনাহে লিপ্ত ছিল।

আবু নায়ীম বর্ণনা করেন, বিখ্যাত বুজুর্গ আবু হাজেম আ'রাজ (রঃ) নিজেকে সম্বোধন করে বলতেন, 'মনে হয় তুমি সব গুনাহগারদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে কেয়ামতের দিন দাঁড়াতে চাও'। অর্থাৎ সকল গুনাহ থেকে দূরে থাকাই হলো আত্মরক্ষা করার একমাত্র পথ।

এবনে আবি আসেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে আসেম (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ করেছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, 'হে আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বীরা! 'হে কাদরীয়া ফেরকার লোকেরা! যারা মানুষকে যাবতীয় কর্মের স্রষ্টা মনে করতো এভাবে যেন তারা মানুষকে আল্লাহ পাকের প্রতিদ্বন্দ্বী বানিয়ে নিত আর এ কারণেই কেয়ামতের দিনকে يوم التناد বা 'ডাক দেয়ার দিন' বলা হয়েছে। সেদিন জান্নাতীগণ দোযখীদেরকে এবং দোযখীরা জান্নাতীগণকে ডাকবে এবং মানুষের সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্যের কারণেও মানুষকে ডাকা হবে। যে তার ঈমান ও নেক আমলের কারণে জান্নাতী হবে তাকে ভাগ্যবান বলে ডাকা হবে আর যে ঈমান ও নেক আমলের অভাবে দোযখী হবে তাকে ভাগ্যাহত বা বদনসীব বলে ডাকা হবে। সেদিন যে খোশনসীব হবে সে আর কখনো বদনসীব হবেনা আর যে বদনসীব হবে সে আর কখনও খোশনসীব হবেনা।

বাজ্জার এবং বায়হাকী হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন মানুষকে পাল্লার মধ্যে দাঁড় করানো হবে এবং প্রত্যেকের আমল পরিমাপ করার জন্যে ফেরেশতা মোতায়েন করা হবে। যদি কোন ব্যক্তির নেক আমলের পাল্লা ভারী হয় তবে সে এত উচ্চ স্বরে চিৎকার দেবে যে সমগ্র সৃষ্টি তা শুনবে, ঐ ফেরেশতা বলবে, অমুক ব্যক্তি ভাগ্যবান হয়েছে সে আর কখনো বদনসীব হবেনা। আর যদি কারো নেক আমলের পাল্লা হাল্কা হয় (বদ আমলের পাল্লা ভারী হয়) তবে ঐ ফেরেশতা এত উচ্চস্বরে চিৎকার দেবে যে সকল সৃষ্টি তা শুনবে। সে বলবে, অমুক ব্যক্তি বদনসীব হয়েছে, তখন অন্য একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, আমি তোমার জন্যে একটি সম্পর্ক নির্দিষ্ট করেছিলাম আর তুমি নিজের জন্যে আরেকটি সম্পর্ক নির্ধারিত করেছ (অর্থাৎ আমি তোমার জন্যে তাকওয়া পরহেযগারী পছন্দ করেছিলাম আর তাই ছিল তোমার পরিচয়ের উৎস, কিন্তু তুমি আত্মীয়তার ভিত্তির পরিচয়ই রেখে দিয়েছ)।

তেবরানী হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক একজন ঘোষককে একথা ঘোষণা করার আদেশ দেবেন, আমি একটি সম্পর্ক নির্দিষ্ট করেছিলাম কিন্তু তুমি অন্য সম্পর্ক পছন্দ করেছ। যে সবচেয়ে বড়

পরহেযগার, আমি তাকে সবচেয়ে বড় সম্মানিত বলে ঘোষণা করেছি, কিন্তু তুমি তাকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছ। আর তুমি বলেছ অমুকের ছেলে অমুক উত্তম (অর্থাৎ তুমি বংশ পরিচয়কেই গুরুত্ব দিয়েছ)। আজ আমি আমার নির্ধারিত বংশধারাকে (পরহেযগারদেরকে) সুউচ্চ মর্তবা দান করবো, আর তোমাদের নির্দিষ্ট বংশকে নিম্ন স্তরে পৌছাবো। কোথায় তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বনকারীগণ! আর যখন মৃত্যুকে জবেহ করে দেয়া হবে তখনও ঘোষণা করা হবে, হে জান্নাতবাসীগণ! তোমরা চিরদিন এখানে থাকবে, কখনও মৃত্যু আসবেনা। হে দোযখীরা! চিরদিন তোমাদেরকে এখানেই থাকতে হবে কখনও মৃত্যু আসবেনা।[১]

يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ ۚ مَا لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ
اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوْسُفُ مِنْ قَبْلُ
بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّمَّا جَآءَكُمْ بِهٖ ۭ حَتّٰٓى اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ
لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا ۭ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ
مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ ۚ ﴿٣٤﴾ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ
اَتٰىهُمْ ۭ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۭ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ
اللّٰهُ عَلٰي كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٣٥﴾

তরজমা

(৩৩) যেদিন তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়নপর হবে সেদিন আল্লাহ পাকের শাস্তি থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করার কেউ থাকবেনা। আল্লাহ পাক যাকে ভুলের মধ্যে রাখেন তার জন্যে কোন পথ প্রদর্শক নেই।

(৩৪) ইতোপূর্বে তোমাদের নিকট ইউসুফ (আঃ) এসেছিলেন সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে, কিন্তু তোমরা সে বিষয়ে বারে বারে সন্দেহ পোষণ করতে যা নিয়ে তিনি

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-২৩৫

এসেছিলেন। অবশেষে যখন ইউসুফ (আঃ)-এর মৃত্যু হলো তখন তোমরা বলতে লাগলে, আল্লাহ্ পাক তাঁর পর আর কোন রসূল প্রেরণ করবেন না, এভাবে আল্লাহ্ পাক পথচ্যুত করেন সে সব লোককে যারা সীমালঙ্ঘনকারী এবং যারা সংশয়বাদী।

(৩৫) যারা নিজেদের নিকট কোন দলিল-প্রমাণ না থাকলেও আল্লাহ্ পাকের আয়াত সমূহ সম্পর্কে কলহ-দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় তাদের এ অপকর্ম আল্লাহ্ পাক এবং মোমেনদের দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণ্য। এভাবে আল্লাহ্ পাক প্রত্যেক অহংকারী ব্যক্তির অন্তরকে মোহরাঙ্কিত করে দেন।

তফসীরুল কোরআন

ইতোপূর্বে যে মোমেন ব্যক্তির উপদেশের উল্লেখ ছিল, আলোচ্য আয়াতে তার আরেকটি উপদেশের বর্ণনা স্থান পেয়েছে। তিনি তাঁর জাতিকে সম্বোধন করে বলেছেন, 'হে আমার জাতি! আমি তোমাদের ব্যাপারে সেদিন সম্পর্কে আশঙ্কা করছি, যেদিন তোমাদেরকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে পলায়নপর হতে হবে এবং দোযখের দিকে যেতে হবে। সেদিন আল্লাহ্ পাকের কঠিন আযাব থেকে কেউ তোমাদের রক্ষাকারী থাকবেনা অথচ আজো সময় আছে, ভাল-মন্দ, হক্ব-বাতিল, সত্য ও অসত্যের পার্থক্য করে তোমাদেরকে সত্য গ্রহণের আহবান জানানো হচ্ছে। যদি এরপরও তোমরা সত্য গ্রহণে প্রস্তুত না হও এবং দোযখের আযাব থেকে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা না কর তবে একথাই প্রমাণিত হবে যে তোমরা পথচ্যুত হয়ে পড়েছ আর যারা পথচ্যুত হয়, সঠিক পথে আসার আহবান জানানো সত্বেও সঠিক পথে না আসে, তাদের জন্যে কোন পথ-প্রদর্শক থাকেনা, কোন উপদেশ তাদের কাজে আসেনা।

يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ

তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, সেদিনকে ভয় কর যখন তোমরা দোযখের আযাব থেকে পলায়ন করবে, কিন্তু আত্মরক্ষা করতে পারবেনা।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, যখন শিংগায় ফুঁক শ্রবণ করে মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হবে, এরপর পুনরায় শিংগায় ফুঁক দেয়া হলে মানুষ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়বে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হবে। আলোচ্য আয়াতে তখনকার কথাই বলা হয়েছে।

এবনে জরীব, আবু ইয়ালা, বায়হাকী, আবুশ্ শেখ, আবদ এবনে হোমায়েদ নিজ নিজ সংকলনে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি

দিয়েছেন যাতে তিনবার শিংগায় ফুঁক দেয়ার উল্লেখ রয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক ইস্রাফীল (আঃ)-কে প্রথমবার শিংগায় ফুঁক দেয়ার আদেশ দিয়ে বলবেন, শিংগায় ফুঁক দাও, যাতে ভয়-ভীতি সৃষ্টি হয়। নির্দেশ মোতাবেক ইস্রাফীল (আঃ) শিংগায় ফুঁক দেবেন। আসমান জমীনের অধিবাসীগণ সে আওয়াজ শ্রবণ করে অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হবে তবে আল্লাহ পাক যার সম্পর্কে ইচ্ছা করবেন তাকে (ভয়-ভীতি থেকে) রক্ষা করবেন। ইস্রাফীল (আঃ) শিংগার ঐ ফুঁককে অব্যাহত রাখবেন, আওয়াজকে সুদীর্ঘ করবেন, মাঝখানে বিরতি দিয়ে দম নেবেন না। এর ফলে এমন ভীতি সৃষ্টি হবে যে দুগ্ধ পোষ্য শিশুদের কথাও তাদের মায়েরা ভুলে যাবে, অন্তসত্বা মহিলাদের গর্ভপাত হয়ে যাবে, চরম আতঙ্কের কারণে শিশুদের চুল পর্যন্ত সাদা হয়ে যাবে। শয়তান ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে এদিক সেদিক ছুটোছুটি শুরু করবে। পলায়নপর হয়ে যখন তারা পৃথিবীর কোন এক প্রান্তে পৌছবে তখন ফেরেশতাগণ তাদের চেহারায় প্রহার করে তাদেরকে সেখান থেকে ফিরিয়ে দেবে, লোকেরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করবে তখন পরস্পরের মধ্যে ডাকাডাকি হবে আর এটিই সেদিন যাকে আল্লাহ পাক يوم التناد বলে আখ্যায়িত করেছেন। সেদিন মানুষ পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে পলায়নপর হবে কিন্তু আল্লাহ পাকের আযাব থেকে কোন অবস্থাতেই রক্ষা পাবেনা।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং যাহ্যাক (রঃ) يوم التناد শব্দটিকে د এর উপর 'তশদীদ' দিয়ে পাঠ করেছেন। এর অর্থ পলায়ন এবং ছড়িয়ে পড়ার দিন। যেভাবে উষ্ট্র তার মালিকের নিকট থেকে পলায়ন করে ঠিক এভাবে কেয়ামতের দিন মানুষ পৃথিবীতে পলায়নপর হবে।

এবনে জরীর (রঃ) এবং এবনে মোবারক (রঃ) যাহ্যাক (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক সর্বনিম্ন আসমানকে ফেটে যাওয়ার আদেশ দেবেন। সঙ্গে সঙ্গে ঐ আসমান ফেটে যাবে এবং তাতে অবস্থানকারী ফেরেশতাগণ তার একপ্রান্তে থাকবেন। পুনরায় আল্লাহ পাকের হুকুম মোতাবেক তারা পৃথিবীতে অবতরণ করে দুনিয়াবাসীকে ঘেরাও করবে। এরপর দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্ত আসমানেরও একই অবস্থা হবে অর্থাৎ প্রত্যেকটি আসমান ফেটে যাবে এবং ফেরেশতাগণ কাতার বন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। এরপর আহকামুল হাকেমীন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন নাযিল হবেন। দোযখ তাঁর বা দিকে হবে এবং জান্নাত ডান দিকে। দোযখের ভয়াবহ দৃশ্য দেখে জমীনের অধিবাসীরা পলায়ন করতে থাকবে কিন্তু জমীনের যে প্রান্তেই পৌছবে সেখানেই

দেখবে ফেরেশতাগণের সাতটি কাতার বর্তমান রয়েছে তখন বাধ্য হয়ে লোকেরা যেখান থেকে পলায়ন করেছে সেখানেই ফিরে আসবে। আলোচ্য আয়াতে সে ভয়াবহ দিনের কথাই বলা হয়েছে।

এছাড়া সূরা ওয়াল ফাজরে এ সম্পর্কে এভাবে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

وَجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۞ وَجِاْئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى

'এবং যখন তোমার প্রতিপালক আগমন করবেন এবং ফেরেশতাগণও কাতারবন্দী হয়ে উপস্থিত হবেন, সেদিন দোযখকে আনা হবে এবং সেদিন মানুষ (সত্য) উপলব্ধি করবে, কিন্তু এ উপলব্ধি তার কী কাজে আসবে'?

এমনিভাবে সূরা আর রাহমানে সেদিনের ভয়াবহ অবস্থা এভাবে এরশাদ হয়েছেঃ

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ط لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ

'হে জ্বীন ও মানব জাতি! যদি তোমরা আসমান ও জমীনের সীমা অতিক্রম করতে পার তবে তা কর কিন্তু তোমরা তা কখনো করতে পারবেনা শক্তি ব্যতীত (আর সে শক্তি তোমাদের নেই)'।

অর্থাৎ আমার পৃথিবীতে থেকে আমার যাবতীয় নেয়ামত ভোগ করে আমার অবাধ্য অকৃতজ্ঞ থাকার কোন যুক্তি নেই। যদি তোমরা আমার বিধান অমান্য করতেই চাও তবে আসমানে ও জমীনের এ চৌহদ্দি থেকে বেরিয়ে যাও আর তা খনো তোমরা পারবেনা।

وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوْسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِىْ شَكٍّ مِّمَّا جَآءَكُمْ بِهٖ ط حَتّٰٓى اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا ط كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ ج

ইতোপূর্বে তোমাদের নিকট ইউসুফ (আঃ) এসেছিলেন সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে কিন্তু তোমরা সে বিষয়ে বারে বারে সন্দেহ পোষণ করতে যা নিয়ে তিনি

এসেছিলেন। অবশেষে যখন ইউসুফ (আঃ)-এর মৃত্যু হলো তখন তোমরা বলতে লাগলে, আল্লাহ পাক তাঁর পর আর কোন রসূল প্রেরণ করবেন না, এভাবে আল্লাহ পাক পথচ্যুত করেন সে সব লোককে যারা সীমা লঙ্ঘনকারী এবং যারা সংশয়বাদী"।

অর্থাৎ ইতোপূর্বে হযরত ইউসুফ (আঃ) তৌহীদ এবং নবুওয়্যতের সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ নিয়ে এসেছিলেন কিন্তু তোমরা তাঁর নবুওয়্যতে বিশ্বাস করোনি, তাঁকে মিথ্যাজ্ঞান করেছ, আজ আল্লাহ পাকের নবীর সাথে তোমরা যে আচরণ করছো, তাঁর সঙ্গেও অনুরূপ আচরণই করেছিলে, তাঁকেও মিথ্যাবাদী বলেছিলে কিন্তু যখন তাঁর ইন্তেকাল হলো তখন তোমরা বললে, ভালই হলো এখন আর কোন রসূল প্রেরিত হবেন না, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আর কোন রসূল এসে আমাদেরকে উপদেশ দেবেন না। বস্তুতঃ যারা সীমা লঙ্ঘনকারী, সংশয়বাদী আল্লাহ পাক তাদেরকে হেদায়েতের তৌফিক দান করেন না, কেননা তারা নবুওয়্যতের সূত্রকেই অস্বীকার করার ধৃষ্টতা দেখায় এবং কুফরী ও নাফরমানীতে অবিচল থাকে।

يُضِلُّ اللّٰهُ

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ বাক্যটির ব্যাখ্যা করেছেন, আল্লাহ পাক তাদেরকে পাপাচারে লিপ্ত থাকতে দেন।[১]

مسرف অর্থাৎ মুশরেক।

আল্লামা ওসমানী (রঃ) হযরত শাহ সাহেব (রঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, মিশরবাসী হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর জীবদ্দশায় তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর যখন মিশরের শাসন ব্যবস্থায় বিশৃংখলা দেখা দেয় তখন তারা বলে, হযরত ইউসুফ (আঃ) ছিলেন অত্যন্ত বরকতময় ব্যক্তিত্ব, ভবিষ্যতে এমন মোবারক সত্ত্বা হয়তো আর কখনো আসবেন না। জীবদ্দশায় তারা তাঁকে অবিশ্বাস করেছে আর এখন তাঁর জন্যে আক্ষেপ করছে অর্থাৎ যখন নেয়ামত তাদের কাছে ছিল তখন তারা তাঁর কদর করেনি।[২]

الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰهُمْ ط كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ط

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-২০৮
২। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-৬১০

'যারা নিজেদের নিকট কোন দলিল-প্রমাণ না থাকলেও আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহ সম্পর্কে কলহ-দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় তাদের এ অপকর্ম আল্লাহ পাকের দরবারে এবং মোমেনদের দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণ্য'।

অর্থাৎ যারা আল্লাহ পাকের মহান বাণী সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয় তারাই সত্যিকার দূরাত্মা, আল্লাহ পাকের দরবারে তারা অত্যন্ত ঘৃণ্য, আল্লাহ পাকের প্রতি যারা প্রকৃত ঈমান রাখে তারাও এসব লোকের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট।

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ

এভাবে আল্লাহ পাক প্রত্যেক অহংকারী ব্যক্তির অন্তরকে মোহরাঙ্কিত করে দেন, পরিণামে ঐ ব্যক্তির অন্তরে আর ঈমান প্রবেশ করতে পারেনা। যারা সত্যের অনুসারীদের সঙ্গে অযথা কলহ দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়, সত্য-সন্ধান থেকে বিরত থাকে, যারা অহংকারী, অহংকারের কারণেই সত্য গ্রহণের যোগ্যতা তারা হারিয়ে ফেলে, ফলে তারা আর সত্য গ্রহণ করেনা। একথাটিকেই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন যে, "তাদের অন্তরকে আল্লাহ পাক মোহরাঙ্কিত করে দেন"।

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامٰنُ ابْنِ
لِيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ ﴿٣٦﴾ اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاَطَّلِعَ
اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ كَاذِبًا ۭ وَكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْۗءُ
عَمَلِهٖ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ ۭ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِيْ تَبَابٍ ﴿٣٧﴾
وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ﴿٣٨﴾
يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ۡ وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ
الْقَرَارِ ﴿٣٩﴾ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ
عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰۗىِٕكَ
يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾

তরজমা

(৩৬) আর ফেরাউন বললো, হে হামান! আমার জন্যে তুমি একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর সম্ভবতঃ আমি পথ পর্যন্ত পৌঁছতে পারি–

(৩৭) আসমানের পথ, এরপর মূসার মা'বুদকে দেখতে পারি এবং আমার মনে হয় মূসা মিথ্যা কথাই বলেছে। আর এভাবেই ফেরাউনের নিকট তার কুকীর্তিকে শোভনীয় করা হয়েছিল এবং সরল পথ থেকে তাকে নিবৃত্ত করা হয়েছিল। আর ফেরাউনের চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছিল সম্পূর্ণভাবে।

(৩৮) আর ঈমানদার ব্যক্তিটি বললো, হে আমার জাতি! তোমরা আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করবো।

(৩৯) হে আমার জাতি! এ পার্থিব জীবন তো শুধু কিছুটা উপভোগের বস্তু মাত্র, প্রকৃতপক্ষে আখেরাতই হলো চিরস্থায়ী আবাস-স্থল।

(৪০) যে কেউ মন্দ কাজ করবে সে তার সমান প্রতিফল পাবে আর কী নারী, কী পুরুষ ঈমানদার অবস্থায় যে কেউ নেক আমল করবে, তারা বেহেশতে প্রবেশ করবে যেখানে তাদেরকে অগণিত রিয্ক প্রদান করা হবে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে একজন মর্দে মোমেনের উপদেশের উল্লেখ ছিল। এ উপদেশ ছিল অত্যন্ত হেকমতপূর্ণ, তাৎপর্যবহ। বুদ্ধিমান মাত্রেরই অন্তরে এসব উপদেশ দাগ কাটে। ফেরাউন ঐ মর্দে মোমেনের যুক্তিপূর্ণ কথার কোন প্রকার জবাব প্রদানে অক্ষম হয় তাই সে অসহায় হয়ে পড়ে, তখন সে তার ফেরাউনী মনোভাব প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী হামানকে একটি আকাশচুম্বী ইমারত নির্মাণের নির্দেশ দেয়। আলোচ্য আয়াতে ফেরাউনের এ নির্দেশেরই উল্লেখ রয়েছে, এরশাদ হয়েছেঃ

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامٰنُ ابْنِ لِيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ

'আর ফেরাউন বললো, 'হে হামান! আমার জন্যে তুমি একটি সুউচ্চ ইমারত নির্মাণ কর, সম্ভবতঃ আমি পথ পর্যন্ত পৌঁছতে পারি'।

ফেরাউনের চরম ধ্বংস যখন ঘণিয়ে আসে তখন তার দম্ভ এবং ঔদ্ধত্ব প্রকাশ পেতে থাকে, তাই সে তার প্রধানমন্ত্রী হামানকে বলে একটা উঁচু আকাশচুম্বী প্রাসাদ

নির্মাণ কর, হয়তো আমি আকাশ পথে ভ্রমণের সুযোগ পাব এবং মূসার খোদাকে দেখতে পাব, আমি মনে করি যে মূসা (আঃ) মিথ্যাবাদী।

এ আয়াতে ফেরাউনের ঔদ্ধত্ব এবং অহংকারের বর্ণনা রয়েছে। ফেরাউন, বলেছে, আমার জন্যে আকাশচুম্বী ঈমারত নির্মাণ কর, যাতে করে আমি আকাশপথে ভ্রমণ করে আসমানের দ্বার প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছতে পারি এবং মূসার খোদাকে দেখতে পারি (নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক)। ফেরাউনের এ মন্তব্য দ্বারা তার মূর্খতা এবং নির্বুদ্ধিতা প্রমাণিত হয়, সে একথাও জানেনা পৃথিবী থেকে আসমানের দূরত্ব কত খানি, আর এ-ও তার জানা নেই প্রাসাদ যত সুউচ্চই হোক না কেন, তার উপর আরোহণ করে সর্ব শক্তিমান আল্লাহ পাকের দীদার লাভ হতে পারেনা। ফেরাউন আরও বলে অবশ্য আমি জানি মূসা মিথ্যাবাদী, আর সে যে কথা বলে তা-ও সত্য নয়, যেমন সে বলে আল্লাহ পাক তাঁকে রসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন, আমার মনে হয় একথাও অসত্য, শুধু তাই নয়; তাঁর নবুওয়্যতের দাবীই মিথ্যা, এতদ্ব্যতীত সমগ্র বিশ্বের খোদা একজনই বলে যে সে দাবী করে, তার এ দাবীও মিথ্যা; আমি তো মনে করি না যে, আমি ব্যতীত আর কোন খোদা আছে (নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক)।

وَكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ ط

'আর এভাবেই ফেরাউনের নিকট তার কুকীর্তিকে শোভনীয় করা হয়েছিল এবং সরল পথ থেকে তাকে নিবৃত্ত করা হয়েছিল'।

আত্ম বিস্মৃতিই ধ্বংসের কারণ হয়

মূলতঃ মানুষ যখন কুকর্মে লিপ্ত হয় এবং অবশেষে তাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তখন তার বিবেক বুদ্ধি লোপ পায়, সে মন্দকেই উত্তম মনে করে যা অশোভনীয়। ফেরাউনেরও এ অবস্থাই হয়েছিল। হযরত মূসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে তার সকল ষড়যন্ত্র শুধু যে ব্যর্থ হয়েছে তাই নয়; বরং তা ফেরাউনের ধ্বংসই ডেকে এনেছে। এ জন্যে কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে মোমেনদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰهُمْ اَنْفُسَهُمْ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ

'আর তোমরা তাদের মত হয়োনা যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, পরিণামে আল্লাহ পাক তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন, তারাই তো পাপাচারী'।

এ আত্মবিস্মৃতিই পথভ্রষ্টতার প্রথম সোপান, এরপর মানুষ বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। তখন সে দিশেহারা, যা ইচ্ছা তা করে। প্রথমতঃ ভাল-মন্দের মধ্যে সে কোন পার্থক্য খুঁজে পায়না, এ অবস্থা কিছুদিন অব্যাহত থাকার পর সে মন্দকেই উত্তম মনে করতে থাকে এমনিভাবে অসত্যকে সত্য, অসুন্দরকে সুন্দর এবং যা অশোভন তাকে শোভন মনে করে। ফেরাউনের এ অবস্থাটির প্রতিই আলোচ্য আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এজন্যে পরবর্তী আয়াতাংশে এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِىْ تَبَابٍ

অর্থাৎ তার অন্যায় অনাচারের কারণে তাকে সরল পথ থেকে নিবৃত্ত করা হয়েছিল এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে তার যাবতীয় চক্রান্ত সম্পূর্ণ ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল, অবশেষ তার সমস্ত সৈন্য সামন্ত সহ তাকে লোহিত সাগরে নিমজ্জিত করা হয়।

এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাকের নাফরমানী, সত্যদ্রোহিতা, সত্যের বিরুদ্ধে চক্রান্ত সর্বদা ব্যর্থ-পরিণামই হয়। যখন কোন ব্যক্তি, সমাজ বা জাতি ধ্বংসের পথ বেছে নেয় আর সে পথকেই কল্যাণের পথ বলে মনে করে, তাদের এ মনে করার কারণে অকল্যাণ কখনো কল্যাণে পরিণত হয়না; বরং তাদের জন্যে তা সর্বনাশই ডেকে আনে।

وَقَالَ الَّذِىْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ

'আর ঈমানদার ব্যক্তিটি বললো, 'হে আমার জাতি! তোমরা আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করবো'।

অর্থাৎ তোমাদেরকে এমন পথে পরিচালিত করবো যার ফলে তোমরা মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছতে পার, তোমাদের জীবন-সাধনা সাফল্যমন্ডিত হবে।

উল্লিখিত বাক্যটিতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, মনে রেখ ফেরাউনের পথ অন্যায়, অসুন্দর এবং অসাফল্যের পথ, শুধু তাই নয়; বরং তা হলো নিশ্চিত ধ্বংসের পথ।[১]

يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِىَ دَارُ الْقَرَارِ

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৪, পৃষ্ঠা-৭০
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-২৪০

'হে আমার জাতি! এই পার্থিব জীবন শুধু কিছুটা উপভোগের বস্তু মাত্র, প্রকৃত পক্ষে আখেরাতই হলো চিরস্থায়ী আবাস-স্থল'।

অর্থাৎ দুনিয়ার এ জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং আখেরাতের জীবন হলো চিরস্থায়ী, দুনিয়ার এ জীবনেই আখেরাতের সম্বল সংগ্রহ করতে হয়। অতএব, বুদ্ধিমান মাত্রেরই কর্তব্য হলো এ জীবনে চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে সম্বল সংগ্রহের সর্বাত্মক চেষ্টা করা তথা এমন আমল করা যা আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনে ফলপ্রসূ হয়।

সমগ্র বিশ্ব মানবের উদ্দেশ্যে পবিত্র কোরআনের আহ্বান হলো, হে মানব জাতি! তোমরা এ অনিত্য-সংসারের মোহ মায়ায় হারিয়ে যেওনা, দু'দিনের এ জীবনের অবসান ঘটবে মৃত্যুর আক্রমণে, পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মহান সাফল্য।

এবনে মরদবিয়া হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আরইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী সম্পদ মাত্র, এর মধ্যে উত্তম সম্পদ হলো নেককার স্ত্রী যাকে তুমি যখন দেখ তখন সে তোমার আনন্দের কারণ হয়, আর যখন তুমি তার নিকট থেকে দূরে থাক তখন সে তার নিজের এবং তোমার ধন-সম্পদের হেফাজত করে।

আবদ এবনে হোমায়েদ কাতাদা (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আখেরাতে রয়েছে চিরস্থায়ী আবাস-স্থল। জান্নাত তার অধিবাসীদের নিয়ে চিরস্থায়ী থাকবে এবং দোযখ তার অধিবাসীদের নিয়ে চিরকাল থাকবে।

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰى اِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞

যে মন্দ কাজ করবে যেমন শেরক সে তেমনই বদলা পাবে (তথা দোযখ)। আর যে মোমেন অবস্থায় নেক আমল করবে পুরুষ হোক কি নারী, তারা বেহেশতে প্রবেশ করবে, সেখানে তাদেরকে অগণিত রিযক দেয়া হবে। আল্লাহর শপথ! কোন পরিমাপ করা হবেনা।[১]

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৮৬

আলোচ্য আয়াতে নেক আমল এবং বদ আমলের পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। মন্দ কাজের পরিণতি তার অনুরূপই হবে। পক্ষান্তরে, নেক আমলের শুভ পরিণতি হবে বে-হিসাব বা অগণিত, তবে নেক আমলের শুভ পরিণতি লাভের জন্যে ঈমান পূর্ব শর্ত। বর্তমান যুগে অনেক অমুসলিম ব্যক্তি ও সংগঠনকে দুঃখী মানুষের দুঃখ নিবারণে এগিয়ে আসতে দেখা যায়। নিঃসন্দেহে এসব সৎ কাজ কিন্তু ঈমানের অভাবে আল্লাহ পাকের দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়। যেহেতু সৎ কাজের শুভ পরিণতি দানকারী একমাত্র আল্লাহ পাক, তাই তাঁর প্রতি ঈমান অপরিহার্য আর যে সৎ কাজই করা হোক না কেন, তা শুধু একমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই হতে হবে। যদি এ উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট না থাকে অর্থাৎ যদি এখলাস না থাকে তবে নেক আমলও আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হয়না।

এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে সৎ কাজ মাত্রই দরবারে এলাহীতে কবুল হয়না, যে পর্যন্ত না যে এ কাজ করে তার ঈমান ও এখলাস না থাকে। দ্বিতীয়তঃ ঈমানের কারণে সৎ কাজটি গ্রহণযোগ্য হয় আর এখলাসের কারণে তার মর্তবা বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য আয়াতে আরেকটি কথা রয়েছে তা হলো بغير حساب অর্থাৎ নেক আমলের হিসাবে তার বদলা দেয়া হবেনা; বরং আল্লাহ পাকের রহমতে এবং দয়ায় নেক আমলের সওয়াব বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেয়া হবে। এটি সম্পূর্ণ দয়াময় আল্লাহ পাকের মর্জির ব্যাপার।

এ আয়াত দ্বারা আরো একটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, জান্নাতের অধিবাসীদেরকে তাদের নেক আমলের যে সওয়াব দেয়া হবে তার নির্দিষ্ট কোন সীমা নেই। আল্লাহ পাক যত ইচ্ছা দান করবেন কিন্তু মন্দ কাজের জন্যে এ নিয়ম নয়; বরং মন্দ কাজ যতখানি হবে শাস্তিও যথানিয়মে ততখানিই হবে, কখনো এর অধিক হবেনা।

ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى

সওয়াবের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সম মর্যাদা

অর্থাৎ সওয়াবের ব্যাপারে নর-নারীর মধ্যে কোন পার্থক্য করা হবেনা; বরং ঈমান ও এখলাসের বর্তমানে উভয়কে সমান সওয়াব দেয়া হবে।

এতে একথাও প্রমাণিত হয় যে, নারী কোন বিশেষ মর্যাদার অধিকারী নয় এমনিভাবে অপবিত্রও নয়; বরং ঈমান ও নেক আমলের ভিত্তিতে নারী-পুরুষ সওয়াব লাভের ক্ষেত্রে সম মর্যাদার অধিকারী। বর্বরতার যুগে এবং ভ্রান্ত মতবাদের দৃষ্টিতে

নারী জাতির প্রতি অনেক অন্যায়-অবিচার করা হয়েছে কিন্তু পবিত্র কোরআন সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে, ঈমান ও নেক আমলের ভিত্তিতে আখেরাতে সওয়াবের ক্ষেত্রে নর-নারী সম মর্যাদার অধিকারী।

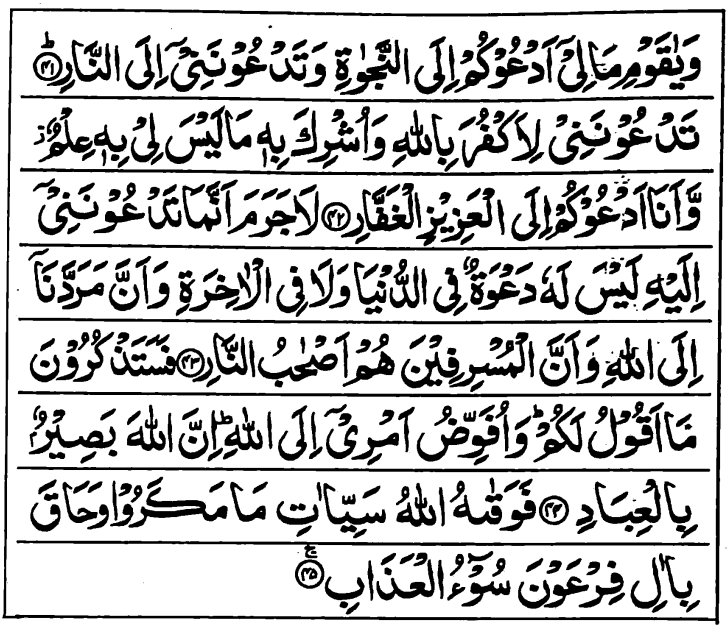
وَيٰقَوْمِ مَا لِيْٓ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَى النَّارِ ﴿٤١﴾
تَدْعُوْنَنِيْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ
وَّاَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ﴿٤٢﴾ لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِيْٓ
اِلَيْهِ لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ مَرَدَّنَآ
اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ﴿٤٣﴾ فَسَتَذْكُرُوْنَ
مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ ۭ وَاُفَوِّضُ اَمْرِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌۢ
بِالْعِبَادِ ﴿٤٤﴾ فَوَقٰىهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ
بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْۗءُ الْعَذَابِ ﴿٤٥﴾

তরজমা

(৪১) আর হে আমার জাতি! 'কি আশ্চর্য! আমি তোমাদেরকে আহবান করছি নাজাতের দিকে, আর তোমরা আমাকে ডাকছ দোযখের দিকে'।

(৪২) তোমরা আমাকে আহ্বান করছো আমি যেন আল্লাহ পাককে অস্বীকার করি আর তাঁর সাথে এমন কিছুকে শরীক করি যার কোন জ্ঞান আমার নেই, অথচ আমি তোমাদেরকে ডাকি মহা পরাক্রমশালী, অত্যন্ত ক্ষমাশীল আল্লাহ পাকের দিকে।

(৪৩) আর একথা নিশ্চিত যে, তোমরা যে বস্তুর দিকে আমাকে ডাক দুনিয়া আখেরাত কোথাও (কোন প্রয়োজনে) সে আহুত হওয়ার যোগ্য নয়, আর আমাদের সকলকে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ফিরে যেতে হবে। আর যারা সীমা লঙ্ঘন করে, নিশ্চয় তারাই হবে দোযখের অধিবাসী।

(৪৪) আমি তোমাদেরকে যা বলছি, অচিরেই তোমরা তা স্মরণ করবে। আর আমার কাজ আমি আল্লাহ পাকের নিকট সোপর্দ করছি। নিশ্চয় আল্লাহ পাক বন্দাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

(৪৫) এরপর আল্লাহ্ পাক তাকে তাদের জঘন্য ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করেন এবং এর বিপরীতে ফেরাউনী লোকদের উপর কষ্টদায়ক আযাব আপতিত হয়।

তফসীরুল কোরআন

পূর্বের আয়াত সমূহের ন্যায় এ আয়াতেও ফেরাউন বংশীয় মোমেনের উপদেশের উল্লেখ রয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَيٰقَوْمِ مَالِيْٓ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَى النَّارِ

'আর হে আমার জাতি! কি আশ্চর্য! আমি তোমাদেরকে নাজাতের দিকে আহবান করছি আর তোমরা আমাকে দোযখের দিকে ডাকছ'। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানাচ্ছি আর তোমরা আমাকে কুফর ও শেরকের দিকে ডাকছ। তোমরা চাও যে আমি মূর্খতার পরিচয় দেই, যে সম্পর্কে আমি কিছুই জানিনা তার উপর বিশ্বাস করি, কোন সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ ব্যতীত আমি আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করি।

আল্লামা সয়ুতি (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের 'নাজাত' শব্দটি ঈমান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি আরো লিখেছেন, তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

ইমাম রাজী (রঃ)-ও শব্দটির এ ব্যাখ্যাই করেছেন। তিনি বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হলো, হে আমার জাতি! আমি তোমাদেরকে ঈমান আনয়নের জন্যে আহবান করি যা আখেরাতে নাজাতের কারণ হবে। আর তোমরা আমাকে ডাক কুফর ও শেরকের দিকে যার অনিবার্য পরিণতি হবে দোযখের কঠিন শাস্তি।[১]

তোমরা আমাকে কুফরী, নাফরমানী ও শেরকের দিকে আহ্বান কর যা আমার অজানা এবং যার কোন দলিল-প্রমাণও তোমাদের নিকট নেই।

وَّاَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ

আর আমি তোমাদেরকে আহ্বান করি মহান আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নের জন্যে যিনি العزيز। বা মহা পরাক্রমশালী, কাফেরদের শাস্তি বিধানে যিনি সম্পূর্ণ সক্ষম, যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী অথচ ফেরাউন হলো একজন দুর্বল

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৮৬
তফসীরে কবীর খন্ড-২৬, পৃষ্ঠা-৭০

মানুষ তাই সে কারো উপাস্য হতে পারেনা, এমনিভাবে তোমাদের পাথরের মূর্তিগুলো চরম অসহায়, তাদের পূজারীদের কথা তারা শোনেও না, বোঝেও না, তারা কারো উপকারও করতে পারেনা। অতএব, তারাও উপাস্য হবার যোগ্য নয়। সমগ্র মানব জাতির একমাত্র উপাস্য হলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক, আর কেউ নয়।

اَلْغَفَّارِ অর্থাৎ অত্যন্ত ক্ষমাশীল।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, এ শব্দটিতে রয়েছে আল্লাহ পাকের রহমতের সুসংবাদ অর্থাৎ যুগ যুগ ধরে যারা কুফরী ও নাফরমানীতে লিপ্ত ছিল তারা যদি তওবা এস্তেগফার করে আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে তবে তিনি তাদেরকেও ক্ষমা করবেন। যদিও তিনি মহা পরাক্রমশালী, যখন খুশি যাকে ইচ্ছা যেখানে ইচ্ছা শাস্তি দিতে পারেন কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমাও করেন। এমনকি, সত্তর বছরের কুফর ও নাফরমানীকে এক ঘন্টার ঈমানের বরকতে ক্ষমা করে দেন।[১]

لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِىْٓ اِلَيْهِ لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِى الدُّنْيَا وَلَا فِى الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ مَرَدَّنَآ اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ

'আর একথা নিশ্চিত যে, তোমরা যে বস্তুর দিকে আমাকে ডাক তা দুনিয়া আখেরাত কোথাও আহুত হওয়ার যোগ্য নয়, আর একথাও সুনিশ্চিত যে, আমাদের সকলকে অবশেষে মহান আল্লাহ পাকের দরবারে ফিরে যেতে হবে। আর নিশ্চয় সীমা লঙ্ঘনকারীরা হবে দোযখের অধিবাসী'।

অর্থাৎ তোমরা যাদের পূজা অর্চনা কর এবং যাদের দিকে আমাকে ডাক, দুনিয়া আখেরাত কোথাও তাদের ক্ষমতা নেই, তারা উপকার বা অপকার কিছুই করতে সক্ষম নয়, তারা কারো ডাক শ্রবণও করতে পারেনা আর কারো ডাকে সাড়াও দিতে পারেনা। যারা এ খবরই রাখেনা যে কে তাদেরকে ডাকে এবং যারা তাদেরকে ডাকে কেয়ামতের দিন তারা হবে তাদের শত্রু। যারা সীমা লঙ্ঘনকারী, যারা শেরক এবং কুফরে লিপ্ত হয় তারাই হবে আখেরাতে দোযখবাসী। আর চিরদিন তারা দোযখে থাকবে।

فَسَتَذْكُرُوْنَ مَا اَقُوْلُ لَكُمْ ط

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২৬, পৃষ্ঠা-৭০

'আমি তোমাদেরকে যা বলেছি অচিরেই তা তোমরা স্মরণ করবে'।

যদিও এখন তোমরা আমার কথার গুরুত্ব উপলব্ধি কর না তবে অদূর ভবিষ্যতে তোমরা আমার কথা স্মরণ করবে এবং মর্মে মর্মে এর সত্যতা উপলব্ধি করবে। তখন তোমরা অত্যন্ত আক্ষেপ করবে কিন্তু সে আক্ষেপ তোমাদের কোন কাজে আসবেনা। তোমাদের আক্ষেপ-অনুতাপের কারণে তোমাদের শাস্তি এতটুকু লাঘব করা হবেনা, তোমাদেরকে অবশ্যই তোমাদের কর্মফল ভোগ করতে হবে।

وَأُفَوِّضُ أَمْرِيٓ إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌۢ بِالْعِبَادِ

(আর আমার কাজ আমি আল্লাহ পাকের নিকটই সোপর্দ করছি। নিশ্চয় আল্লাহ পাক বন্দাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন।) আমি তাঁর প্রতিই ভরসা রাখি, তিনিই আমাকে সাহায্য করবেন, তাঁর নিকট কোন কিছু গোপন নেই। সবই দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট, দেদীপ্যমান। তোমরা আমার প্রতি নির্যাতন করতে চাও তাতে আমার কোন ভয় নেই, কেননা সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকই আমাকে সাহায্য করবেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, যখন ঐ মর্দে মোমেন সুস্পষ্ট ভাষায় ফেরাউনীদের বাতিল মতবাদের বিরোধিতা করে তখন তারা তাঁর প্রতি জুলুম-অত্যাচারের হুমকি দেয়, তাদের সে হুমকির জবাবেই তিনি একথা বলেন যা আলোচ্য আয়াতে রয়েছে।

বর্ণিত আছে, একথা বলার পর তিনি ফেরাউনীদের থেকে দূরে সরে যান এবং আত্মগোপন করে থাকেন। এরপর কাফেররা কখনো তাঁকে কষ্ট দিতে সক্ষম হয়নি। পরবর্তী আয়াতেই রয়েছে এর ঘোষণাঃ

فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوا۟ وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوٓءُ الْعَذَابِ

'এরপর আল্লাহ পাক তাকে তাদের জঘন্য ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করেন এবং এর বিপরীতে ফেরাউনী লোকদের উপর কষ্টদায়ক আযাব আপতিত হয়'।

অর্থাৎ অবশেষে আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ) এবং তাঁর সাথী মোমেনদেরকে ফেরাউনের জঘন্য ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করেন, ফেরাউন ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা হযরত মূসা (আঃ) ও তাঁর সঙ্গীদের কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হয়নি; বরং তাদের অন্যায় অনাচারের অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ তারা নিজেরাই ধ্বংস হয়েছে।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, একথাটি সেই মর্দে মোমেনের সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে যার উপদেশের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, ফেরাউনের লোকেরা তাঁর উপদেশের কারণে তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিল, কিন্তু তিনি তাদের থেকে দূরে সরে গেলেন। ফেরাউন তাকে ধরার জন্যে লোক প্রেরণ করলো কিন্তু আল্লাহ পাক তাঁকে হেফাজত করেন। ফেরাউন আর তার দলবল কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হয়। প্রথমতঃ লোহিত সাগরে তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয় এবং পরে দোযখে নিক্ষেপ করা হয়। কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের শব্দ ال فرعون দ্বারা সে সব লোককে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যাদেরকে ফেরাউন ঐ মর্দে মোমেনকে গ্রেফতার করতে প্রেরণ করেছিল। তারা তাঁকে গ্রেফতার করার জন্যে পেছন পেছন যায়। তিনি পাহাড়ের উচ্চ চূড়ায় আরোহন করেন এবং নামাজে মশগুল হন। তখন জঙ্গলের হিংস্র জন্তুরা কাতারবন্দী হয়ে তাঁর হেফাজতে রত হয়। এ ভয়াবহ এবং বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে ফেরাউনের প্রেরিত লোকেরা বাধ্য হয়ে ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে ফিরে আসে। ফেরাউন এ অপরাধে তাদের সবাইকে হত্যা করে।[১]

আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, ঐ মোমেন ব্যক্তি যখন তাঁর ঈমানের কথা প্রকাশ করলেন এবং কাফেরদেরকে কুফর ও শেরক পরিহার করে ঈমান ও নেক আমলের দিকে আহবান করলেন তখন ফেরাউন তাঁকে হত্যা করার সংকল্প করলো। তখন তিনি পাহাড়ের দিকে চলে গেলেন। ফেরাউন তাঁকে গ্রেফতার করতে এক হাজার লোককে প্রেরণ করে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ পাহাড়ের উচ্চ চূড়ায় তাঁকে নামাজরত এবং হিংস্র জন্তুগুলোকে তাঁর প্রহরায় নিয়োজিত দেখতে পায়। ফেরাউনের প্রেরিত লোকদের মধ্যে কেউ কেউ পিপাসায় কাতর হয়ে মৃত্যুবরণ করে, কেউ কেউ হিংস্র জন্তুর খাদ্যে পরিণত হয়, আর কিছু লোক ব্যর্থ হয়ে ফেরাউনের নিকট ফিরে আসে। ফেরাউন তাদেরকে তাদের ব্যর্থতার জন্যে মৃত্যুদন্ড দেয়। আলোচ্য আয়াতে যাদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়া হয় বলা হয়েছে তারা ছিল ঐ এক হাজার লোক যারা ফেরাউন কর্তৃক প্রেরিত হয়েছিল।[২]

ইমাম তাবারী (রঃ) লিখেছেন, ঐ মর্দে মোমেন যার উপদেশের কথা ইতোপূর্বে একাধিক আয়াতে স্থান পেয়েছে, তিনি যদিও ফেরাউনের সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন কিন্তু তিনি ছিলেন খাঁটি মোমেন, তাই আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে তাঁকেও রক্ষা করেছেন। ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় যখন নিমজ্জিত হয় তখন আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ) ও তাঁর সঙ্গী মোমেনদেরকে রক্ষা করেছেন।[৩]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-২৪২-৪৩
তফসীরে কবীর খন্ড-২৬, পৃষ্ঠা-৭২
২। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৪, পৃষ্ঠা-৭২-৭৩
৩। তফসীরে তাবারী খন্ড-২৪, পৃষ্ঠা-৪৬

اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا
غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ۫ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ
فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾ وَاِذْ يَتَحَآجُّوْنَ فِى النَّارِ
فَيَقُوْلُ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ
تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ ﴿٤٧﴾
قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُلٌّ فِيْهَآ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ
بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿٤٨﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ فِى النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ
ادْعُوْا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ﴿٤٩﴾

(৪৬) সকাল সন্ধ্যায় তাদেরকে উপস্থিত করা হয় অগ্নির সম্মুখে, আর কেয়ামতের দিন হুকুম হবে ফেরাউন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ কর কঠিনতম আযাবে।

(৪৭) আর (স্মরণ কর সে সময়কে) যখন তারা দোযখে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে, তখন দুর্বলেরা অহংকারী প্রধানদেরকে বলবে, 'আমরা তো তোমাদেরই অনুসারী ছিলাম, তোমরা কি আমাদের দোযখের শাস্তির কিছু অংশ বহন করতে পার'?

(৪৮) অহংকারী প্রধানরা বলবে, 'আমরা সকলেই তো দোযখে পড়ে আছি, নিশ্চয় আল্লাহ পাক বন্দাদের বিচার করে ফেলেছেন'।

(৪৯) দোযখীরা দোযখের প্রহরীদেরকে বলবে, 'আমাদের প্রতিপালকের নিকট ফরিয়াদ কর যেন একটি দিন অন্তত আমাদের উপর থেকে কিছু আযাব লাঘব করে দেন'।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে ফেরাউন বংশীয় মর্দে মোমেনের নসিহতের উল্লেখ ছিল। কিভাবে তিনি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ভাষায় ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়কে উপদেশ দিয়েছিলেন এবং হযরত মূসা (আঃ)-কে হত্যা করার চক্রান্ত থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আলোচ্য আয়াত থেকে ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের প্রতি মধ্যলোকে যে আযাব হয় এবং আখেরাতে তাদেরকে যে কঠিন আযাব ভোগ করতে হবে তার উল্লেখ রয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ.....

'সকাল সন্ধ্যায় তাদেরকে উপস্থিত করা হয় অগ্নির সম্মুখে আর কেয়ামতের দিন হুকুম হবে ফেরাউন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ কর কঠিনতম আযাবে'।

এ আয়াতে আলমে বরজখ বা মধ্যলোকে ফেরাউন সম্প্রদায়ের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। দুনিয়া এবং আখেরাতের মধ্যে অবস্থিত জগতের নামই 'আলমে বরজখ', যেখানে মানুষকে মৃত্যুর পর কেয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত থাকতে হবে। মৃত ব্যক্তিকে কবরে দাফন করা হোক অথবা সমুদ্র ভাসিয়ে দেয়া হোক, কিংবা অগ্নি দগ্ধ করে ভস্ম করা হোক। সংক্ষেপে আলমে বরজখের শাস্তিকে কবরের আযাব বলা হয়। কবরের আযাব সত্য হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। যেভাবে নিদ্রা জীবন ও মৃত্যুর মাঝামাঝি একটি অবস্থার নাম, ঠিক তেমনি দুনিয়া এবং আখেরাতের মাঝামাঝি সময় যেখানে অতিবাহিত করতে হয় তাই হলো আলমে বরজখ বা মধ্যলোক। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের এ জীবনের অবসান ঘটে আর রুহ আলমে বরজখে চলে যায়। এতদসত্ত্বেও রুহের সাথে দেহের এক প্রকার সম্পর্ক অব্যাহত থাকে, কবরে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করা হয় এবং তিনটি প্রশ্ন করা হয়–

(এক) তোমার প্রতিপালক কে?

(দুই) তোমার ধর্ম কি?

(তিন) হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দিকে ইঙ্গিত করে জিজ্ঞাসা করা হয় ইনি কে?

মৃত ব্যক্তি যদি মোমেন হয় তবে প্রশ্নগুলোর সঠিক জবাব দেবে কিন্তু যদি মৃত ব্যক্তি কাফের হয় তবে জবাবে বলবে হায় আক্ষেপ! আমি জানিনা।

এখানে উল্লেখ্য, দুনিয়ার জীবন এবং কবরের জীবনে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। নিদ্রিত অবস্থায় মানুষ দেখে, শোনে, কথা বলে কিন্তু এ চক্ষু দিয়ে দেখেনা এবং এ কর্ণ দিয়েও শ্রবণ করেনা, নিদ্রিত হওয়ার কারণে এসব ইন্দ্রিয়ের শক্তি তখন অকেজো হয়ে থাকে, মৃত্যুর পর যখন মানুষ চিরতরে পৃথিবী ছেড়ে চলে যায় এবং আলমে বরজখে পৌঁছে যায় তখন সে ঈমান ও কুফর তথা আল্লাহ পাকের আনুগত্য ও নাফরমানীর প্রকৃত রূপ প্রকাশ্যে দেখতে পায়।

হাদীস শরীফে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। মোমেন ব্যক্তি কবরে যখন মুনকীর নকীরের সওয়ালের জবাব দিয়ে অবসর পায় তখন একটি অতি সুন্দর, আকর্ষণীয় আকৃতি লক্ষ্য করে, মোমেন ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কে? সে বলে, আমি তোমার নেক আমল। পক্ষান্তরে, কাফের বা অপরাধী ব্যক্তিদের সম্মুখেও তাদের আমল দৃশ্যমান রূপে হাযির হয় তবে সে দৃশ্য হয় অত্যন্ত ভয়াবহ। ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে, তুমি কে? তখন তাকে জবাব দেয়া হয় আমি তোমার আমল। এটি হলো আলমে বরজখের প্রাথমিক অবস্থা।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ফেরাউন সম্প্রদায়ের রুহগুলো কৃষ্ণ বর্ণের পাখির উদরে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়। দৈনিক দু' বার তাদেরকে দোযখের সম্মুখে উপস্থিত করা হয় এবং তাদেরকে বলা হয়, এটিই হবে তোমাদের স্থায়ী ঠিকানা।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যখন তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যু হয়, তবে প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় জান্নাত বা দোযখে তার জন্যে নিদৃষ্ট স্থান তাকে দেখিয়ে দেয়া হয়। যদি সে ব্যক্তি মোমেন হয় তবে তার জান্নাতের ঠিকানা দেখে তার আনন্দ বেড়ে যায়, আর যদি সে কাফের হয় তবে সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়।

যদিও আলোচ্য আয়াতে ফেরাউন সম্প্রদায়ের আযাবের কথা ঘোষণা করা হয়েছে তবে হাদীস শরীফে রয়েছে যে আলমে বরযখ বা মধ্যলোকে প্রত্যেক কাফেরের শাস্তি হয়ে থাকে, এমনকি গুনাহগার মোমেনেরও শাস্তি হয়ে থাকে। এজন্যে হাদীস শরীফে সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে। বোখারী শরীফে রয়েছে, হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট একজন ইহুদী স্ত্রীলোক আসে এবং বলে, 'আমরা আল্লাহ পাকের নিকট কবরের আযাব থেকে পানাহ চাই'। এরপর হযরত আয়েশা (রাঃ)

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট প্রশ্ন করলেন, 'কবরে কি আযাব হয়'? তিনি এরশাদ করলেন, 'হ্যাঁ কবরের আযাব সত্য'। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, এরপর আমি দেখলাম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নামাজের পর কবরের আযাব থেকে পানাহ্ চাইতেন।[১]

اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ

'আর যেদিন কেয়ামত কায়েম হবে সেদিন আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে আদেশ হবে ফেরাউন সম্প্রদায়কে কঠিনতম শাস্তিতে প্রবেশ করাও'।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, اشد العذاب কথা দ্বারা বিভিন্ন প্রকার আযাবকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, কবরে যে আযাব হয় তা রুহ ও দেহ উভয়টির উপরেই হয়। প্রথমতঃ দেহে রুহ ফেরত দেয়া হয়, এরপর শাস্তি হয়।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে কবরের আযাব সত্য, আর এ-ও প্রমাণিত হয় যে, কবরের এ আযাব হবে কেয়ামতের পূর্বে। স্ব-শরীরে বেহেশত বা দোযখে মানুষ প্রবেশ করবে এবং সেখানকার নেয়ামত বা আযাব ভোগ করবে কেয়ামতের দিন অনুষ্ঠেয় বিচারের পর।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ আরও বলেছেন, মানুষের মৃত্যুর পর তার দেহের সঙ্গে রুহের কিছুটা সম্পর্ক থাকে, সম্পূর্ণ বিছিন্ন হয়না এবং সম্পূর্ণ সম্পর্কও থাকেনা। মানুষ দেহ ও রুহের সমন্বিত রূপ। দুনিয়াতে দেহের ব্যাপারেই বিধান কার্যকর হয়, কেননা দুনিয়াতে দেহই মূখ্য রুহ থাকে গৌণ, কিন্তু মধ্যলোকে রুহ প্রভাব বিস্তার করবে তাই সেখানে রুহের বিধান কার্যকর হবে, মধ্যলোকে রুহ থাকবে মুখ্য আর দেহ হবে গৌণ। কিন্তু কেয়ামতের দিন দেহ ও রুহ উভয়টির গুরুত্ব সমান করে দেয়া হবে, কোনটি মূখ্য আর কোনটি গৌণ হবেনা, বরং উভয়টির প্রাধান্য ও গুরুত্ব সমান হবে।[২]

وَاِذْ يَتَحَآجُّوْنَ فِى النَّارِ فَيَقُوْلُ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৪ পৃষ্ঠা-৪৭
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৮৭
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৪, পৃষ্ঠা-৭৪
২। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৬ পৃষ্ঠা-১৪৪

আর হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আপনি আপনার জাতির উদ্দেশ্যে সে সময়ের উল্লেখ করুন, যখন দোযখীরা দোযখে পরস্পর বিতর্ক করবে তখন দুর্বলেরা অহংকারী প্রধানদেরকে বলবে, 'আমরা তো (দুনিয়াতে) তোমাদেরই অনুসারী ছিলাম, তোমরা কি আমাদের দোযখের শাস্তির কিছু অংশ বহন করতে পার'? অর্থাৎ কেয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশের পর যখন বেহেশতীরা বেহেশতে চলে যাবে এবং দোযখীরা দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে তখন দোযখে তারা পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে, দুনিয়ার জীবনে যারা দুর্বল ছিল, অন্যের কথামতে ওঠা-বসা করতো, তারা তাদের মোড়ল-মাতব্বর বা নেতা-নেত্রীদের বলবে, দুনিয়ার জীবনে আমরা তোমাদেরই অনুসরণ করেছি, তোমাদের নির্দেশের কারণেই আমরা সত্য-বিরোধিতা করেছি, আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবী রসূলগণের বিরুদ্ধাচারণ করেছি যার পরিণামে আজ দোযখের সম্মুখীন হতে হয়েছে। দুনিয়াতে তোমাদের অনুসারী না হলে আজ আমাদের এ বিপদ হতোনা, এমন অবস্থায় দোযখের শাস্তির কিছু অংশ আমাদের পক্ষ থেকে তোমরা বহন করতে পারবে কি? অথবা এর অর্থ হল, দুনিয়ার জীবনে আপনারা ছিলেন নেতা-নেত্রী, আমরা ছিলাম আপনাদের অনুসারী, আপনারা ছিলেন আমাদের উপর ক্ষমতাবান, বর্তমান মহা বিপদের সময় আমাদের এ বিপদ কিছুটা কি লাঘব করতে পারবেন?

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُلٌّ فِيْهَآ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ

'অহংকারী প্রধানরা বলবে, আমরা সকলেই তো দোযখে পড়ে আছি, নিশ্চয় আল্লাহ পাক বন্দাদের বিচার করে ফেলেছেন'।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক জান্নাতীদের জান্নাতে এবং দোযখীদের দোযখে যাওয়ার আদেশ দিয়ে ফেলেছেন, যেখানে তোমরা রয়েছো আমরাও সেখানেই রয়েছি, যদি আমাদের কোন শক্তি থাকতো তবে কি আমরা নিজেরা আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করতাম না? আর এখন তো আল্লাহ পাক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছেন, আর করার কিছুই নেই, কেননা আল্লাহ পাকের ফয়সালা পরিবর্তন করার সাধ্য কারোই নেই। প্রকৃত অবস্থা এই যে আমাদের অদৃষ্টই মন্দ, আমরা অন্যায় করেছি, কুফরী ও নাফরমানীতে লিপ্ত হয়েছি তাই তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে দোযখের শাস্তি ভোগ করছি।

وَقَالَ الَّذِيْنَ فِى النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوْا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ

'আর দোযখীরা দোযখের প্রহরীদেরকে বলবে, আমাদের প্রতিপালকের নিকট ফরিয়াদ কর যেন একটি দিন অন্তত আমাদের থেকে আযাব কিছুটা লাঘব করে দেন'।

কাফের নেতা-নেত্রীদের থেকে নিরাশ হওয়ার পর দোযখীরা দোযখের প্রহরীদের বলবে, দয়া করে তোমরাই আল্লাহ পাকের মহান দরবারে সুপারিশ কর যেন তিনি দয়া করে একটি দিন আমাদের আযাব কিছুটা লাঘব করে দেন বা মুলতবী রাখেন। অর্থাৎ একদিন সময়ের সমান যদি আযাব যদি মুলতবী রাখা হয় তবে তা-ও হবে আমাদের জন্যে বিরাট নেয়ামত।

قَالُوْٓا اَوَلَمْ تَكُ تَاْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۭ قَالُوْا بَلٰى ۭ
قَالُوْا فَادْعُوْا ۚ وَمَا دُعٰٓؤُا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ۝۵۰ ع
اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا
وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ ۝۵۱ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ
مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْۗءُ الدَّارِ ۝۵۲ وَلَقَدْ
اٰتَيْنَا مُوْسَى الْهُدٰى وَاَوْرَثْنَا بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ الْكِتٰبَ ۝۵۳
هُدًى وَّذِكْرٰى لِاُولِي الْاَلْبَابِ ۝۵۴

তরজমা

(৫০) তারা বলবে, তোমাদের নিকট কি তোমাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে আসেননি? দোযখীরা বলবে, অবশ্যই এসেছিলেন। ফেরেশতারা বলবে, তবে তোমরাই প্রার্থনা কর। আর কাফেরদের প্রার্থনা ব্যর্থই হয়।

(৫১) নিশ্চয় আমি আমার রসূলগণকে এবং মোমেনদেরকে সাহায্য করবো পার্থিব জীবনে এবং সেদিনও, যেদিন সাক্ষীগণ দন্ডায়মান হবে।

(৫২) সেদিন জালেমদের কোন ওজর-আপত্তিই কাজে আসবেনা, তাদের জন্যে রয়েছে লা'নত এবং তাদের জন্যে জঘন্য আযাবও রয়েছে।

(৫৩) আর আমি নিশ্চয় মূসাকে দান করেছিলাম পথ-নির্দেশনা এবং বণী ইসরাঈলকে এমন কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছি-

(৫৪) যা পথ প্রদর্শক এবং বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে উপদেশ।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, দোযখীরা প্রহরী ফেরেশতাগণকে বলবে, তোমরা আল্লাহ্ পাকের দরবারে আমাদের পক্ষে সুপারিশ কর যেন তিনি অন্ততঃ একটি দিন আমাদের প্রতি আযাব লাঘব করেন। তাদের এ ফরিয়াদের জবাবে প্রহরীরা যা বলবে তাই আলোচ্য আয়াতে স্থান পেয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

قَالُوْٓا اَوَلَمْ تَكُ تَاْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ط قَالُوْا بَلٰى ط قَالُوْا فَادْعُوْا ج وَمَا دُعٰٓؤُا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ

'তারা বলবে, তোমাদের নিকট কি তোমাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে আসনেনি? দোযখীরা বলবে, অবশ্যই এসেছিলেন। প্রহরীরা বলবে, তবে তোমরা নিজেরাই প্রার্থনা কর। আর কাফেরদের প্রার্থনা ব্যর্থই হয়'।

অর্থাৎ দোযখীদের ফরিয়াদের জবাবে ফেরেশতাগণ বলবেন, তোমাদের ফরিয়াদ বৃথা, সময় শেষ হয়ে গেছে এখন যত আর্তনাদই কর না কেন তোমাদের জন্যে তা উপকারী হবেনা, আমরাও তোমাদের জন্যে সুপারিশ করতে পারবোনা, আল্লাহ্ পাকের হুকুমে তোমাদের শাস্তি বিধান করাই আমাদের কাজ। সুপারিশ বা অনুরোধ করার কোন অধিকার আমাদের নেই। তোমাদের নিকট কি কোন নবী রসূল আগমন করেননি? তাঁরা কি কোন সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ, মোজেযা প্রদর্শন করেননি, তাঁরা দোযখ থেকে আত্মরক্ষা করার পথ-নির্দেশ করেননি? তখন দোযখীরা বলবে, হ্যাঁ অবশ্যই তাঁরা আমাদেরকে পথ-নির্দেশ করেছিলেন, কিন্তু আমরা তাঁদের কথা মান্য করিনি; বরং তাঁদের বিরোধিতা করেছি। ফেরেশতাগণ তখন বলবেন, তাহলে এখন আর আক্ষেপ করে কী লাভ?

দোয়া কবুল হওয়ার জন্যে ঈমান পূর্বশত

অতএব, তোমরা নিজেরাই আল্লাহ্ পাকের দরবারে ফরিয়াদ কর আর একথা সর্বজনবিদিত যে, কাফেরদের দোয়া আখেরাতে গ্রহণযোগ্য হবেনা, কেননা দোয়া কবুল হবার জন্যে ঈমান পূর্ব শর্ত, আর ঈমান আনয়ন সম্ভব ছিল দুনিয়াতে, কিন্তু তারা তা করেনি।

তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, ফেরেশতাগণ তাদের পক্ষে সুপারিশ করতে অস্বীকার করবেন এজন্যে যে, যারা ঈমান থেকে বঞ্চিত, তাদের জন্যে সুপারিশ করার অধিকার কারোই নেই।[১]

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ

'নিশ্চয় আমি সাহায্য করি আমার রসূলগণকে এবং মোমেনদেরকে পার্থিব জীবনে আর সেদিনও আমি তাদেরকে সাহায্য করবো যেদিন স্বাক্ষ্য দেয়ার জন্যে ফেরেশতাগণ দন্ডায়মান হবে' অর্থাৎ কেয়ামতের দিন।

কাফেররা দোযখে একে অন্যকে দোষারোপ করবে, লা'নত দেবে, পূর্ববর্তী আয়াতে একথার উল্লেখ ছিল। আর এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন যে, তিনি তাঁর প্রেরিত নবীগণকে এবং মোমেনদেরকে দুনিয়াতেও সাহায্য করবেন এবং আখেরাতেও। আর একথাও ঘোষণা করেছেন আল্লাহর রাহে যত সমস্যা দেখা দেয় স্বয়ং আল্লাহ্ পাকই তা সমাধান করে দেন। আল্লাহ্ পাক তাঁর কুদরতে, রহমতে সকল বাধা-বিঘ্ন দূরীভূত করেন। নবী রসূলগণকেই নয়; বরং তাঁদেরকে যারা সাহায্য করেন, আল্লাহ্ পাক সেই মোমেনদেরকেও সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর এজন্যেই নবী রসূলগণ যত বাধা-বিপত্তিরই সম্মুখীন হন না কেন, অবশেষে তাঁরা সাফল্য লাভ করেন এবং সত্যদ্রোহীদেরকে আল্লাহ্ পাক শুধু যে ব্যর্থ করেন তাই নয়; বরং তাদের প্রতি লা'নত করেন অর্থাৎ তাদেরকে তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত করেন।

নবী রসূলগণকে সাহায্য করার তাৎপর্য

তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে নবী রসূলগণকে সাহায্য করার যে ঘোষণা রয়েছে তার তাৎপর্য হলো তাঁদেরকে দলিল-প্রমাণ তথা মোজেযা দ্বারা সাহায্য করা।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে সাহায্য করার যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে তাঁর তাৎপর্য হলো নবী রসূলগণকে বিজয়ী করা, তাঁদের প্রাধান্য বিস্তার করা। যদিও কখনো কাফেররাও বিজয় লাভ করেছে কিন্তু অবশেষে নবী রসূলগণই সফল হয়েছেন।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, নবী রসূলগণকে সাহায্য করার তাৎপর্য হলো তাঁদের দুশমনদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা। আল্লাহ্ পাক অনেক ক্ষেত্রে নবী

১। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৯৪৫

রসূলগণের দুশমনদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করেছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন।

ইমাম আবু জাফর এবনে জরীর তাবারী (রঃ) আলোচ্য আয়াতের তফসীরে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, এরপর নিজেই ঐ প্রশ্নের দু'টি জবাব পেশ করেছেন। কোন কোন নবী রসূলকে তাদের স্ব-স্ব জাতি হত্যা করেছে যেমন হযরত ইয়াহয়া (আঃ), হযরত জাকারিয়া (আঃ) এবং হযরত শা'ইআ (আঃ), আর কোন কোন নবী এমনও রয়েছেন যাঁরা তাঁদের জাতির নির্যাতনে বাধ্য হয়ে হিজরত করেছেন, প্রিয় মাতৃ-ভূমি ছেড়ে গেছেন, যেমন হযরত ঈব্রাহীম (আঃ) এবং কোন কোন নবী এমনও রয়েছেন, আল্লাহ পাক তাদেরকে সরাসরি আসমানে তুলে নিয়েছেন যেমন হযরত ঈসা (আঃ)। এভাবে কাফেরদের জুলুম-অত্যাচার সইতে হয়েছে যুগে যুগে নবী রসূলগণকে, এর দ্বারা আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয় আম্বিয়ায়ে কেরাম আল্লাহ পাকের সাহায্য লাভে ব্যর্থ হয়েছেন।

উল্লিখিত প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে ইমাম তাবারী (রঃ) লিখেছেন, আল্লাহ পাকের এ ঘোষণা অধিকাংশ নবী রসূলগণের ব্যাপারে প্রযোজ্য। অর্থাৎ দু' চারজন নবী রসূল ব্যতীত অধিকাংশ নবী রসূলগণ আল্লাহ পাকের সাহায্য লাভে ধন্য হয়েছেন।

প্রশ্নের দ্বিতীয় জবাব এই, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে সাহায্যের যে ঘোষণা রয়েছে তার তাৎপর্য এই, কাফেররা নবী রসূলগণের প্রতি যে জুলুম-অত্যাচার করে এবং মোমেনদেরকেও যে কষ্ট দেয় তার প্রতিশোধ গ্রহণ করা। তাই জাকারিয়া (আঃ) এবং হযরত শা'ইআ (আঃ)-এর ঘাতকদেরকে এবং তাদের সমর্থকদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে। এমন জাতিকে তাদের উপর ক্ষমতা দেয়া হয়েছে যারা তাদের মূলোৎপাটন করেছে, এমনিভাবে জালেম নমরুদ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রতি জুলুম করেছিল, তার শাস্তি নমরুদকে ভোগ করতে হয়েছে। অত্যন্ত অপমানজনক মৃত্যু নমরুদের সকল দম্ভ চূর্ণ করে দিয়েছে। ইহুদীরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে শূলে চড়ানোর চেষ্টা করেছিল, আল্লাহ পাক তাঁকে আসমানে তুলে নিয়েছেন এবং ইহুদীদের উপর রোমানদেরকে ক্ষমতাসীন করেছিলেন এবং তারা ইহুদীদের সমুচিত শাস্তি দিয়েছিল। আর স্বয়ং হযরত ঈসা (আঃ) কেয়ামতের পূর্বে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন এবং দজ্জালকে এবং ইহুদীদেরকে শাস্তি দেবেন। পৃথিবীতে ন্যায় বিচার কায়েম করবেন, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তাঁকে সম্মান, মর্যাদা এবং নেতৃত্ব প্রদান করা হবে। এ-তো হলো দুনিয়ার শাস্তির কথা, আখেরাতের কঠিন কঠোর শাস্তি তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।[১]

১। তফসীরে তাবারী খন্ড-২৪, পৃষ্ঠা-৪৮-৪৯

যাহোক, এটি আল্লাহ পাকের চিরাচরিত নিয়ম যে, তিনি তাঁর নবী রসূলগণকে সাহায্য করেন এবং যে সব জালেমরা তাদের প্রতি জুলুম-অত্যাচার করে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করে মোমেনদেরকে সান্ত্বনা প্রদান করেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের ঘোষণার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

'যে কেউ আমার কোন ওলীর সঙ্গে শত্রুতামূলক ব্যবহার করবে, সে যেন আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে'।

ইতিহাস সাক্ষী! আল্লাহ পাক নূহ এবং লূত (আঃ)-এর জাতিকে এবং মাদীয়ানবাসীকে নবী রসূলগণের বিরুদ্ধে শত্রুতার কারণে সমূলে ধ্বংস করেছেন এবং বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি কিভাবে তাঁর নবী রসূলগণকে সাহায্য করেন।

ইসলামের বিজয় যুগে যুগে

সর্বশেষে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে আল্লাহ পাক যেভাবে সাহায্য করেছেন এবং অপমানিত করেছেন দুশমনদেরকে তা সর্বজন-বিদিত। ইসলামের প্রথম জেহাদ বদরের রণাঙ্গনে মুসলমানদের সংখ্যাল্পতা সত্ত্বেও আল্লাহ পাক সে যুদ্ধে কাফেরদের মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। এরপর অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয় দান করেছিলেন, যখন মক্কার সমস্ত জালেম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলইহে ওয়াসাল্লামের মহান দরবারে ক্ষমা-প্রার্থী হয়েছিল এবং তিনি তাদের উদ্দেশ্যে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন। এরপর সমগ্র আরব উপদ্বীপ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুগত হয়েছিল, উড্ডীন হয়েছিল ইসলামের চন্দ্র-তারকা খচিত পতাকা, দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল, সারা আরব তখন শান্তির নীড়ে পরিণত হয়েছিল, সর্বত্র ন্যায় বিচার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন, খোলাফায়ে রাশেদীন তাঁর আদর্শের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব যত্ন সহকারে পালন করলেন, ফলে পারস্য এবং রোমান সাম্রাজ্য মুসলিম মুজাহিদদের সম্মুখে ভূলুণ্ঠিত হলো। এরপর উত্তর অফ্রিকা বিজিত হলো, একদিকে স্পেন অন্যদিকে সিন্ধু পর্যন্ত মুসলমানদের বিজয় অব্যাহত রইলো। আর এসব কিছু হলো এক আল্লাহ পাকের সাহায্যে এবং আলোচ্য আয়াতের ঘোষণা এভাবে ঘটনায় পরিণত হলো।

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ

'সেদিন জালেমদের কোন ওজর-আপত্তিই কাজে আসবেনা, তাদের জন্যে রয়েছে লা'নত এবং তাদের জন্যে জঘন্য আযাবও রয়েছে'।

অর্থাৎ কেয়ামতের দিন যখন আলমনামা লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাগণ এ স্বাক্ষ্য দেবেন যে, নবী রসূলগণ তাঁদের নিজ নিজ উম্মতকে আল্লাহ্ পাকের মহান বাণী পৌঁছে দিয়েছিলেন। তাদেরকে তৌহীদে বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানিয়েছিলেন। কিন্তু তারা সে আহবানে সাড়া দেয়নি; বরং তারা নবী রসূলগণকে মিথ্যা জ্ঞান করেছে। তাই কাফের মুশরেকরা কেয়ামতের দিন অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়বে, তাদের কোন ওজর-আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবেনা। তাদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের লা'নত হতে থাকবে। অর্থাৎ তারা আল্লাহ্ পাকের রহমত থেকে অনেক দূরে থাকবে, আর তাদের জন্যে রয়েছে জঘন্য আবাসস্থল অর্থাৎ দোযখ।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْهُدٰى وَاَوْرَثْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ

'আর আমি নিশ্চয় মূসাকে দান করেছিলাম পথ-নির্দেশনা এবং বনী ইসরাঈলকেও এমন কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছি'।

هُدًى وَّذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ

'যা পথ-প্রদর্শক ও বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে উপদেশ'।

আল্লাহ্ পাক হযরত মুসা (আঃ)-কে দান করেছিলেন হেদায়েত কিন্তু ফেরাউন ও তার দলবল তাঁর হেদায়েত গ্রহণ করেনি, তারা হযরত মূসা (আঃ)-এর মোকাবেলায় সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে, লক্ষ লক্ষ সৈন্য নিয়ে ফেরাউন তাঁর মোকাবিলা করছে, কিন্তু তার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ফেরাউন ও তার দলবল লোহিত সাগরে নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংস হয়েছে অথচ বনী ইসরাঈল জাতি যখন হযরত মূসা (আঃ)-এর হেদায়েত মেনে চললো তখন আল্লাহ্ পাক তাদেরকে সাহায্য করলেন, তারা উন্নতি লাভ করলো, তৌরাতের ন্যায় মহান গ্রন্থ তাদেরকে দান করা হলো, যা পথ-প্রদর্শক এবং বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে রয়েছে তাতে উপদেশ। গুণী, জ্ঞানী লোকেরা এর দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ
اللَّهِ حَقٌّ وَّاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴿٥٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ
اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ ۙ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ
مَّا هُم بِبَالِغِيهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْبَصِيرُ ﴿٥٦﴾ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ
النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ وَمَا
يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَ
عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ ۚ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾

তরজমা

(৫৫) অতএব, (হে রসূল!) আপনি অবিচলিত থাকুন, সবর অবলম্বন করুন, আল্লাহ পাকের ওয়াদা সত্য এবং নিজের ত্রুটির জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করুন, আর সকাল সন্ধ্যায় আপনার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে থাকুন।

(৫৬) নিশ্চয় যারা নিজেদের নিকট কোন দলিল না থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহ সম্পর্কে বাদানুবাদে লিপ্ত হয় তাদের অন্তরে রয়েছে শুধু অহংকার, তারা কখনো লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেনা। অতএব, আপনি আল্লাহ পাকের আশ্রয় প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

(৫৭) মানুষের সৃষ্টির চেয়ে আসমান জমীনের সৃষ্টি অবশ্যই বড়, তবে অধিকাংশ লোকই তা জানেনা। অন্ধ এবং চক্ষুষ্মান কখনো সমান হতে পারেনা, (এমনিভাবে) যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে এবং যারা পাপাচারী (তারাও

এক সমান হতে পারেনা)। তোমরা অত্যন্ত কমই চিন্তা করে থাক (উপদেশ গ্রহণ করে থাক)।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন, আমি আমার রসূলগণকে এবং মোমেনদেরকে অবশ্যই সাহায্য করবো। এদিকে মক্কার কাফেরদের জুলুম-অত্যাচার অব্যাহত ছিল, স্বাভাবিকভাবেই মজলুম মুসলমানদের অন্তরে অস্থিরতা বিরাজ করছিল, তাই আল্লাহ পাক এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে এরশাদ করেছেনঃ

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

(হে রসূল!) আপনি কাফেরদের জুলুম অত্যাচারের ব্যাপারে সবর অবলম্বন করুন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের ওয়াদা সত্য, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন অবশেষে আল্লাহ পাকের সাহায্য আসবে। আল্লাহ পাক যে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা অবশ্যই পূর্ণ করা হবে, এর বরখেলাফ কখনো হবেনা। (হে রসূল!) আপনার বিজয় এবং সাফল্য সুনিশ্চিত। ইতোপূর্বে আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে ফেরাউনের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছিলেন, এজন্যে পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত মূসা (আঃ)-এর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হয়েছে যে, (হে রসূল!) আপনার সাফল্যকে প্রতিহত করার শক্তি কারোই হবেনা।

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ

'আর আপনার ত্রুটির জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করুন'।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছিলেন নিঃস্পাপ, এতদসত্বেও তাঁকে ক্ষমা প্রার্থনার কথা কেন বলা হয়েছে? তফসীরকারগণ এর জবাবে বলেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে একথা বলে সমগ্র উম্মতকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যেন তারা আল্লাহ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। দ্বিতীয়তঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এস্তেগফারের কারণে তাঁর মর্তবা বৃদ্ধিও এর অন্যতম লক্ষ্য। আর এ কারণেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্বদা এস্তেগফার করতেন।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-২৪৬

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, এস্তেগফারের উদ্দেশ্য হলো কখনো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উত্তম ও আফজাল পন্থার পরিবর্তে অন্য কোন বৈধ পন্থা অবলম্বন করেছেন সেজন্যে তাঁকে এস্তেগফার করার কথা বলা হয়েছে।

অথবা নবুওয়্যত লাভের পূর্বে যদি কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে থাকে তবে তার জন্যে এস্তেগফারের কথা বলা হয়েছে, অথবা এর অর্থ হলো,

واستغفر لذنب امتك

'(হে রসূল!) আপনি আপনার উম্মতের গুনাহর জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করুন'। আর উম্মতের জন্যে এটি হবে নাজাত লাভের একটি পন্থা।[১]

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ

'আর সকাল-সন্ধ্যায় আপনার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে থাকুন'।

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামতের শোকর গুজারী স্বরূপ নামাজ আদায় করতে থাকুন।

সমস্ত কাজকে দু' ভাগে বিভক্ত করা যায় যা আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় তাতে মশগুল হওয়া আর যা আল্লাহ পাকের অপছন্দনীয় তা থেকে বিরত থাকা, যদি এমন কাজ হয়ে যায় তবে এস্তেগফার করা। যেহেতু আল্লাহ পাকের অপছন্দনীয় অনাকাঙ্ক্ষিত কাজ থেকে বিরত থাকা অধিকতর উত্তম, সেজন্যে পরবর্তী বাক্যে এস্তেগফারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং এরপর আল্লাহ পাকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ

(সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহ পাকের হাম্‌দের তসবীহ পাঠ করতে থাকুন।)

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, এর দ্বারা আছরের নামাজ এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, পাঁচ ওয়াক্তের নামাজই উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২৬, পৃষ্ঠা-৭৮

ইমাম রাজী (রঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, সকাল বলতে ভোর থেকে নিয়ে দুপুর পর্যন্ত, আর সন্ধ্যা বলতে দিনের অবশিষ্ট সময়কে বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ সর্বক্ষণ আল্লাহ পাকের দরবারে এস্তেগফার করতে থাকা, এতেই রয়েছে কল্যাণ।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, এর অর্থ সকাল-সন্ধ্যা, যেমন কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ

'নামাজ কায়েম কর দিনের দু'ভাগে'।

এর তাৎপর্য হলো সর্বক্ষণ আল্লাহ পাকের জিকরে মশগুল থাকা, কখনো যেন অন্তর আল্লাহ পাকের জিকর থেকে গাফেল না হয় আর এভাবেই বন্দা ফেরেশতাদের সারিতে প্রবেশ করতে পারে, কেননা তাঁরা সর্বক্ষণ আল্লাহ পাকের জিকরে মশগুল থাকেন।

اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰهُمْ ۙ اِنْ فِيْ صُدُوْرِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيْهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۭ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

'নিশ্চয় যারা নিজেদের নিকট কোন দলিল না থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহ সম্পর্কে বাদানুবাদে লিপ্ত হয়, তাদের অন্তরে রয়েছে শুধু অহংকার। তারা কখনো লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেনা। অতএব, (হে রসূল!) আপনি আল্লাহ পাকের আশ্রয় প্রার্থনা করুন, নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা'।

মক্কার কাফেররা আল্লাহ পাকের তৌহীদ এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালত সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হতো, পবিত্র কোরআনের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করতো, ইসলামের সত্যতা নিয়ে বাদানাবুদ করতো অথচ সত্য গ্রহণে প্রস্তুত হতোনা, তাদের সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ যারা আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহ সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয় অথচ এর জন্যে তাদের নিকট কোন যুক্তি বা দলিল-প্রমাণ ছিলনা, তবুও তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করতো, মোমেনদের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হতো। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, তাদের অন্তরে রয়েছে অহংকার, এ কারণেই তারা সত্য-বিরোধিতায় লিপ্ত, তারা সত্য গ্রহণে অপ্রস্তুত, তাদের অহংকারই তাদেরকে ঔদ্ধত্ব প্রদর্শনে প্ররোচিত করে। আল্লাহ পাকের দরবারে মাথা নত করতে অহংকারই তাদেরকে বাধা দেয়।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, কাফেরদের অহংকার, অহমিকাই তাদেরকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতায় উদ্বুদ্ধ করে।

তফসীরকার এবনে কুতায়বা বলেছেন, কাফেরদের অন্তরে অহংকার রয়েছে, তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করতে চায়, তাই তাঁর প্রতি বিশ্বাস করেনা এজন্যে পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ

مَّا هُم بِبَالِغِيهِ

'তারা কখনো তাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেনা'।

অর্থাৎ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও মোমেনদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করতে পারবেনা।

তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ)-ও আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন, কেননা অবশেষে আল্লাহ পাক তাদেরকে অপমানিত করবেন, যেমন বদরের যুদ্ধে তারা অপমানিত হয়েছিল এবং ৫ম হিজরীতে খন্দকের যুদ্ধেও তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করে কিন্তু আল্লাহ পাক তাদেরকে পরাজিত করেছেন, এমনিভাবে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মক্কা বিজয় দান করেছেন, এভাবে অহংকারী কাফেরদের দম্ভ চূর্ণ হয়েছে।

فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ

অর্থাৎ (হে রসূল!) কাফেররা আপনার বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত করছে, এর জন্যে আপনি আল্লাহ পাকের আশ্রয় প্রার্থনা করুন'। কেননা এক আল্লাহ পাকই আপনাকে তাদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করতে পারেন।

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, কাফেররা (হে রসূল!) আপনার বিরুদ্ধে যা কিছু বলে, আল্লাহ পাক সবই শ্রবণ করেন এবং তিনি সর্বদ্রষ্টা, কাফেররা কী করছে আর আপনি কী করছেন আল্লাহ পাক তার সবই দেখেন। পৃথিবীর কোন কিছুই তাঁর অগোচরে নেই, সব কিছুই তাঁর নখদর্পণে রয়েছে। অতএব, মক্কার কাফেরদের শাস্তি বিধান কোন কঠিন কাজ নয় এবং আপনার হেফাজত করাও অতি সহজ।

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ

'মানুষের সৃষ্টির চেয়ে আসমান জমীনের সৃষ্টি অবশ্যই বড়, তবে অধিকাংশ লোকই তা জানেনা'।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাক মানব জাতির পুনর্জীবন ও পুনরুত্থানের কথা ঘোষণা করেছেন। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করেছেন যে, মানুষ মাত্রকে অবশেষে জীবনের প্রতিটি কর্মকান্ডের জন্যে জবাবদেহী করতে হবে। ঈমানের সঙ্গে সৎ কাজ করা হলে তার সওয়াব দেয়া হবে, ঈমান না থাকলে তার শাস্তি হবে, ঈমান এনে মন্দ কাজে লিপ্ত থাকলে তারও হিসাব-নিকাশ হবে। কিন্তু কাফেররা কেয়ামতকে অস্বীকার করতো। মানুষ মৃত্যুর পর মাটির সঙ্গে মিশে গেলে তাকে কিভাবে পুনর্জীবন দেয়া হবে একথা তারা বুঝতে পারতোনা, তাই তারা কেয়ামতকে অস্বীকার করতো

আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, মানুষকে সৃষ্টি করা এত কঠিন কাজ নয়, যত কঠিন কাজ হলো এ বিশাল বিস্তৃত আসমান জমীন সৃষ্টি করা। তারা কি এ বিস্তৃত নীলাকাশের দিকে তাকায় না? যাকে কোন প্রকার খুঁটি ব্যতীতই আল্লাহ পাক ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দিয়েছেন। তারা কি জমীনের দিকেও তাকায় না? যা পানির উপর স্থাপিত অথচ স্থবির হয়ে আছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীনের অনন্ত অসীম কুদরতের এসব জীবন্ত নিদর্শন দেখেও তারা কি বুঝতে পারেনা যে, মানুষকে পুনর্জীবন দেয়া আল্লাহ্ পাকের পক্ষে কোন কঠিন কাজই নয়।

শানে নযুল

এবনে আবি হাতেম আবুল আলীয়ার কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, একবার জনৈক ইহুদী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে দজ্জালের উল্লেখ করে তার প্রশংসা করে এবং বলে, সে তো আমাদের ইহুদীদের মধ্য থেকেই হবে এবং বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ কাজ করবে। তখন আল্লাহ পাক এ আয়াত اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ থেকে فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ পর্যন্ত নাযিল করেন অর্থাৎ আসমান জমীন সৃষ্টি করা মানুষ তথা দজ্জালকে সৃষ্টির চেয়ে অনেক বৃহৎ কর্ম। এরপর আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দজ্জালের ফেতনা থেকে আল্লাহ পাকের আশ্রয় প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

কা'বে আহবার (রঃ) বলেছেন, এ আয়াত ইহুদীদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। ইহুদীরা দজ্জালের অপেক্ষায় ছিল।

দজ্জাল প্রসঙ্গঃ

হযরত এমরান এবনে হোসায়েন (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি নিজে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি এরশাদ করেছেনঃ আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির পর থেকে কেয়ামত পর্যন্ত দজ্জালের ঘটনার চেয়ে বড় আর কোন ঘটনা ঘটবেনা। (মুসলিম শরীফ)

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ এমন কোন নবী ছিলেন না, যিনি তাঁর উম্মতকে মিথ্যুক, কানা দজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেননি। খুব ভাল করে জেনে রাখ দজ্জাল কানা হবে (এক চক্ষু বিশিষ্ট) তোমাদের প্রতিপালক এমন নন। দজ্জালের দু' চক্ষুর মধ্যখানে ك ف ر অর্থাৎ কাফের লেখা থাকবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমি কি তোমাদেরকে দজ্জাল সম্পর্কে একটি কথা বলবোনা? প্রত্যেক নবী তাঁর উম্মতকে দজ্জাল সম্পর্কে (কিছু না কিছু) বলেছেন। নিঃসন্দেহে সে এক চক্ষু বিশিষ্ট হবে। তার সঙ্গে জান্নাতও থাকবে এবং দোযখও। সে যাকে জান্নাত বলবে আসলে তাই হবে দোযখ। আমি তোমাদেরকে দজ্জালের ফেতনা সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করি, যেমন নূহ (আঃ) তাঁর জাতিকে এ সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করেছিলেন।

হযরত হোজায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দজ্জাল যখন বের হবে তখন তার সাথে পানিও থাকবে, অগ্নিও থাকবে। লোকেরা যে বস্তুকে পানি মনে করবে তাই হবে অগ্নি আর যে বস্তুকে অগ্নি মনে করবে তাই হবে সুশীতল মিষ্টি পানি। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি দজ্জালকে পায়, তার কর্তব্য হবে অগ্নির আকৃতিতে যা থাকবে তাতে ঝাঁপ দেয়া। নিঃসন্দেহে তা হবে সুশীতল পবিত্র পানি।

হযরত হোজায়ফা (রাঃ) বর্ণিত আরেকখানি বর্ণনায় রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দজ্জালের বাঁ দিকের চক্ষু থাকবেনা, তার চুল হবে কোকড়ানো। তার সাথে জান্নাতও থাকবে এবং দোযখও। তার দোযখই প্রকৃত অবস্থায় হবে জান্নাত আর তার জান্নাত হবে আসলে দোযখ। (মুসলিম শরীফ)

হযরত নওয়াস এবনে সামআন (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্মুখে দজ্জালের আলোচনা হয়। তখন তিনি এরশাদ করেন, যদি দজ্জাল আমার জীবদ্দশায় বের হয়ে আসে তবে আমি তোমাদের পক্ষ থেকে তার

মোকাবেলা করবো। যদি আমার জীবদ্দশায় সে না বের হয় তবে আমার পক্ষ থেকে আল্লাহ পাক তোমাদের সাহায্যকারী হবেন। আর প্রত্যেক ব্যক্তি তার মোকাবেলায় দায়িত্ব পালন করবে। তার চক্ষু ফুলে থাকবে, আমি তাকে আবদুল ওজ্জাহ এবনে কতনের মত দেখতে পাচ্ছি। তোমাদের মধ্যে যে কেউ তাকে পায় সে যেন সূরা কাহফের প্রথম আয়াতগুলো পাঠ করে তার প্রতি দম করে। এ আয়াত সমূহ দজ্জালের ফেতনা থেকে বাঁচার জন্যে রক্ষাকবচ হবে। সে ইরাক এবং সিরিয়ার মধ্যস্থল থেকে বের হবে। ডানে বামে অনেক কিছু ধ্বংস করবে। হে আল্লাহর বন্দাগণ! তোমরা অবিচল থেক। আমরা আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! সে কতদিন জমীনে অবস্থান করবে? তিনি এরশাদ করেন, চল্লিশ দিন, তবে তার এক দিন এক বছরের সমান হবে। আর এক দিন এক মাসের সমান হবে, আর একদিন এক সপ্তাহের সমান হবে। বাকী দিনগুলো স্বাভাবিকভাবে অন্য দিনগুলোর সমান হবে। আমরা আরজ করলাম যেদিন এক বছরের সমান হবে সেদিন কি আমাদের একদিনের নামাজ যথেষ্ট হবে। তিনি এরশাদ করলেনঃ না, বরং তোমরা সময়ের হিসাব করে নেবে। প্রত্যেক চব্বিশ ঘন্টায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবে। এভাবে এক বছরের সমান নামাজ তথা ১৮০০ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবে।

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দজ্জাল যখন বের হবে তখন একজন ঈমানদার ব্যক্তি সম্মুখের দিক থেকে তার দিকে আসবে, দজ্জালের প্রহরী ঐ মোমেন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করবে, কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা? মোমেন বলবে, এই ব্যক্তির নিকট যেতে চাই যে বের হয়েছে। প্রহরী বলবে, আমাদের প্রভুর প্রতি কি তোমার বিশ্বাস নেই? মোমেন বলবে, আমাদের প্রতিপালকের নিকট কোন কিছুই গোপন নেই। প্রহরী বলবে, এই ব্যক্তিকে হত্যা কর। তখন তাদের মধ্যে একজন বলবে, তোমাদের প্রতিপালক কি এ আদেশ দেননি যে, আমার অনুমতি ব্যতীত কাউকে হত্যা করবেনা। একথা শ্রবণ করে ঐ প্রহরী মোমেন ব্যক্তিকে হত্যা করবেনা; বরং তাকে নিয়ে দজ্জালের নিকট চলে যাবে। মোমেন দজ্জালকে দেখেই বলবে, হে লোক সকল! এ হলো সেই দাজ্জাল যার সম্পর্কে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন। তখন দজ্জাল আদেশ দেবে, এই লোকটির মাথা ভেঙ্গে দাও। হুকুম মোতাবেক লোকেরা তরবারি নিয়ে এগিয়ে আসবে এবং ঐ ব্যক্তির উদর এবং পৃষ্ঠদেশ চিরে ফেলবে। দজ্জাল বলবে, তুমি এখনও আমার প্রতি ঈমান আনবেনা? মোমেন বলবে, তুমি প্রতারক, তুমি মিথ্যাবাদী। দজ্জাল আদেশ দেবে

একে করাত দিয়ে চিরে ফেল। দজ্জালের লোকেরা ঐ ব্যক্তিকে দেহের মধ্যখান দিয়ে চিরে ফেলবে। এরপর দজ্জাল তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলবে, ওঠ মোমেন জীবিত হয়ে। সঙ্গে সঙ্গে মোমেন জীবিত হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবে, দজ্জাল তখন বলবে, এখন তো তুমি আমার প্রতি ঈমান আনবে। মোমেন বলবে, এখন তো তোমার সম্পর্কে আমার জ্ঞান আরো বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ আমার পূর্ণ বিশ্বাস হয়েছে, তুই-ই দজ্জাল। এরপর মোমেন বলবে, হে লোক সকল! শোন, আমার পর এই দজ্জাল আর কারো সঙ্গে এ ব্যবহার করতে পারবেনা। দজ্জাল ঐ মোমেন ব্যক্তিকে জবেহ করতে চেষ্টা করবে কিন্তু আল্লাহ পাক তার গর্দানকে তাম্র দ্বারা পরিবেষ্টন করে দেবেন, ফলে ছুরি বা তরবারি কার্যকর হবেনা। যখন দজ্জাল সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হবে তখন সে আদেশ দেবে, তার হাত-পা বেধে অগ্নিতে নিক্ষেপ কর। লোকেরা মনে করবে, দজ্জাল তাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করেছে। বাস্তব অবস্থা এই যে, সে জান্নাতে থাকবে। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাকের নিকট সে সবচেয়ে বড় শহীদ বলে পরিগণিত হবে। (মুসলিম শরীফ)

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ ইস্পাহান নামক স্থানে ৭০ হাজার ইহুদী দজ্জালের অনুসারী হবে, আর তারা খুব মূল্যবান চাদর পরিহিত থাকবে অর্থাৎ তারা তাদের সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় হবে। (মুসলিম শরীফ)

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দজ্জাল মদীনা শরীফে প্রবেশ করার চেষ্টা করবে কিন্তু মদীনা শরীফে প্রবেশ তার জন্যে হারাম করে দেয়া হয়েছে। এজন্যে মদীনা শরীফের নিকটস্থ কোন মরুভূমিতে সে অবতরণ করবে। এক ব্যক্তি যে তখন অত্যন্ত উত্তম হবে মদীনা শরীফ থেকে বের হয়ে তার নিকটে পৌঁছবে, দজ্জাল বলবে, আমি যদি এ ব্যক্তিকে হত্যা করে দ্বিতীয় বার জীবিত করে দেই তবু কি তোমরা আমার কথায় সন্দেহ করবে? লোকেরা বলবে, না। দজ্জাল তখন ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করবে। সে ব্যক্তি বলবে, আল্লাহর শপথ! আজ থেকে অধিক পরিমাণে তোর সম্পর্কে আমার জ্ঞান কখনো হয়নি। দজ্জাল তাকে দ্বিতীয়বার হত্যা করার চেষ্টা করবে কিন্তু ব্যর্থ হবে। (বোখারী, মুসলিম)

হযরত আবুবকর (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দজ্জালের কোন প্রকার প্রভাব মদীনা মোনাওয়ারায় প্রবেশ করবেনা। সেদিন মদীনা মোনাওয়ারার সাতটি দ্বার হবে। প্রত্যেক দ্বারে দু'জন

ফেরেশতা মোতায়েন থাকবে। হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দজ্জাল একটি প্রাচ্য দেশ থেকে যাকে খোরাসান বলা হয়, বের হবে। তার অনেক অনুসারী থাকবে। (তিরমিজী)

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমার উম্মতের ৭০ হাজার মুকুটধারী ক্ষমতাসীন ব্যক্তি দজ্জালের অনুসারী হবে। লোকেরা তার পেছন পেছন চলতে থাকবে।

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আবু উমামা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ সেদিন ৭০ হাজার ইহুদী মুকুটধারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দজ্জালের অনুসারী হবে।

হযরত আসমা বিনতে ইয়াজিদ আনসারী (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার গৃহে তশরিফ আনয়ন করেন, সেখানে দজ্জালের আলোচনা হয়, তিনি এরশাদ করেন, দজ্জালের সম্মুখে তিন বছর এমন আসবে যে এক বছর তো আসমান থেকে তিন ভাগের একভাগ বৃষ্টি বন্ধ করে দেয়া হবে, আর জমীনের এক তৃতীয়াংশে ফসল উৎপন্ন হবেনা। দ্বিতীয় বছর দু' তৃতীয়াংশ বৃষ্টি বন্ধ করে দেয়া হবে এবং জমীনেও ফসল দু' তৃতীয়াংশ কম উৎপন্ন হবে। আর তৃতীয় বছর এক ফোটা বৃষ্টিও হবেনা এবং দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। সমস্ত জীব-জন্তু মারা যাবে। দজ্জালের তরফ থেকে অত্যন্ত বিপজ্জনক ফেতনা হবে যে, সে একজন গ্রামীন ব্যক্তির নিকট যাবে এবং বলবে, যদি আমি তোমার উটগুলো জীবিত করে দেই, এরপরও কি তুমি আমাকে প্রতিপালক হিসেবে মানবেনা? সে গ্রামীন ব্যক্তিটি বলবে, কেন নয়? তখন দজ্জাল শয়তানদেরকে উষ্ট্রের আকৃতি দেবে। এক ব্যক্তির ভ্রাতা এবং পিতা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে, দজ্জাল সে ব্যক্তিকে বলবে, আমি যদি তোমার পিতা এবং ভ্রাতাকে জীবিত করে দেই তবু কি তুমি আমাকে প্রতিপালক হিসেবে মানবেনা? সে বলবে, কেন নয়? তখন দজ্জাল শয়তানদেরকে তার পিতা এবং ভ্রাতার আকৃতি দিয়ে উপস্থিত করবে। একথা বলার পর হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর নিজস্ব কোন কাজে তশরিফ নিয়ে যান। কিছুক্ষণ পর তিনি ফিরে আসেন, লোকদেরকে দেখলেন যে তারা চিন্তিত, তখন তিনি ঘরের দরজার পাল্লা ধরে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আসমা! কি হয়েছে! আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আপনি দজ্জাল সম্পর্কে যে কথা বলেছেন তা শুনে সবাই চিন্তিত হয়ে পড়েছে। তখন তিনি এরশাদ করলেন, যদি সে আমার জীবদ্দশায় আসে তবে আমি তার মোকাবেলা করবো। অন্যথায় প্রত্যেক মোমেনের জন্যে

আল্লাহ পাক নিজেই নেগাহবান। তখন আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমাদের অবস্থা এই যে, আমরা আটা তৈরী করি কিন্তু রুটি তৈরীর আগেই ক্ষুধার্ত হয়ে যাই। এমন পরিস্থিতিতে সেদিন মোমেনদের কী অবস্থা হবে? তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তখন আল্লাহ পাকের নামের তসবীহ পাঠ মোমেনদের জন্যে যথেষ্ট হবে, যেমন আসমানের অধিবাসীদের জন্যে যথেষ্ট হয় (অর্থাৎ রুটি-পানির তখন প্রয়োজনই হবেনা)। (আহমদ ও বগভী)

হযরত মুগীরা এবনে শো'বা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট দজ্জাল সম্পর্কে এত বেশী জিজ্ঞাসা করেছি যা আর কেউ করেনি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, সে তোমার কোন ক্ষতিই করতে পারবেনা। আমি আরজ করলাম লোকেরা বলে, দজ্জালের সঙ্গে রুটির পাহাড় এবং পানির সমুদ্র চলমান থাকবে। তিনি তখন এরশাদ করলেন, আল্লাহ পাকের জন্যে এ কাজটি আরো সহজ।[১]

وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَلَا الْمُسِيْٓءُ ط قَلِيْلًا مَّا تَتَذَكَّرُوْنَ

অন্ধ এবং চক্ষুষ্মান কখনো সমান হতে পারেনা, (এমনিভাবে) যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে এবং যারা পাপাচারী (তারাও এক সমান হতে পারেনা)। পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, "অধিকাংশ লোক জানেনা", তারই প্রেক্ষিতে এ আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ যারা অন্ধ এবং চক্ষস্মান তারা কখনো এক সমান হতে পারেনা, এমনিভাবে যারা জানে এবং যারা জানেনা, তারাও এক সমান হতে পারেনা। আর নেককার এবং বদকারও সমান হতে পারেনা। দুনিয়াতে যদিও এ পার্থক্য বোঝা যায়না কিন্তু আখেরাতে এ পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাবে এবং খুব কম সংখ্যক লোকই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে। যারা বুদ্ধিমান, তারাই হয় ভাগ্যবান, তারাই আখেরাতের জন্যে এ জীবনে সম্বল সংগ্রহ করে থাকে।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-২৪৭-৫১
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৮৮-৯০

إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٩﴾ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ
إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ
دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ
وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَ
لَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦١﴾ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ
كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿٦٢﴾ كَذَٰلِكَ
يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٦٣﴾

তরজমা

(৫৯) নিশ্চয় কেয়ামত অবশ্যই আসবে, তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই, কিন্তু অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করেনা।

(৬০) আর তোমাদের প্রতিপালক বলেন, শুধু আমাকেই তোমরা ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। নিশ্চয় যারা অহংকার করে আমার এবাদত থেকে বিরত থাকে তারা অপমানিত অবস্থায় দোযখে প্রবেশ করবে।

(৬১) তিনিই আল্লাহ পাক, যিনি রাতকে তৈরী করেছেন যাতে করে তোমরা তাতে বিশ্রাম কর, আর দিনকে তৈরী করেছেন দেখার জন্যে। নিশ্চয় আল্লাহ পাক মানুষের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল, কিন্তু অনেক লোকই শোকর গুজার হয়না।

(৬২) এই তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ পাক, তিনিই প্রত্যেকটি বস্তুর স্রষ্টা, তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তবুও তোমরা কিভাবে বিপথগামী হও?

(৬৩) যারা আল্লাহ পাকের কথা অস্বীকার করে তারা এভাবেই ফিরে যায়।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, অন্ধ এবং চক্ষুষ্মান এক সমান নয়; যেমন মোমেন ও কাফের এক সমান নয়, ঈমানদার ও বেঈমান এক সমান নয় এমনিভাবে নেককার এবং বদকারও এক সমান নয়। নেককার ও বদকারের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা সত্যিকারভাবে প্রকাশ পাবে কেয়ামতের দিন। সেদিনই ভাল-মন্দের বিচার হবে। মহা বিচারক আল্লাহ্ পাক সেদিন বিচার করবেন, তাই আলোচ্য আয়াতে কেয়ামত সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ

'নিশ্চয় কেয়ামত অবশ্যই আসবে, তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই, কিন্তু অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করেনা'। তারা কেয়ামতকে মানেনা, আল্লাহ্ পাকের ওয়াদাকে সত্য জানেনা, আর অধিকাংশ লোক কেয়ামত সম্পর্কে সম্পূর্ণ গাফেল। তারা যা দেখে তার প্রতিই বিশ্বাস করে, যা অদৃশ্য তার প্রতি তারা ঈমান আনেনা *অথচ সমস্ত নবী রসূলগণ কেয়ামত সম্পর্কে তাদের নিজ নিজ উম্মতকে সতর্ক করেছেন। সবার উপরে স্বয়ং আল্লাহ্ পাক এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন। অতএব, কেয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ করার কোন অবকাশই নেই। এ জীবন যেমন সত্য তেমনি পরকালীন জীবনও সত্য, কেয়ামতের দিন ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করা হবে। মহান আল্লাহ্ পাক সেদিন বিচার করবেন, এটিই চির সত্য, সন্দেহাতীত। তবে অধিকাংশ লোক ভ্রান্ত ধারণায় নিপতিত রয়েছে তাই যা দেখেনা তা মানেনা। যখন দেখবে তখন মানবে কিন্তু তখন তা কোন কাজে আসবেনা।

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

'আর তোমাদের প্রতিপালক বলেন, শুধু আমাকেই তোমরা ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব, নিশ্চয় যারা অহংকার করে আমার এবাদত থেকে বিরত থাকে তারা অপমানিত অবস্থায় দোযখে প্রবেশ করবে'।

কোন কোন তফসীরকার আলোচ্য আয়াতের ادعونى শব্দটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হলো, "শুধু আমারই এবাদত কর, আর কারো সম্মুখে মাথা নত করোনা"। আর "তোমাদের ডাকে সাড়া দেব" কথাটির তাৎপর্য হলো, "তোমাদের এবাদতের সওয়াব দান করবো", কেননা পরবর্তী আয়াতে 'এবাদত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

দোয়া এবং এবাদতের তাৎপর্য

মূলতঃ দোয়া এবং এবাদতের মর্ম কাছাকাছি, পাশাপাশি। আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে কিছু চাওয়া হলো দোয়া, আর আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে মিনতি প্রকাশ করা হলো এবাদত। জীবনের প্রতিটি প্রয়োজনে শুধু আল্লাহ্ পাকের দরবারে ফরিয়াদ করা, অন্য কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করাই হলো বন্দেগীর পরিপূর্ণ রূপ।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের মধ্যে কিছু লোক এমনও রয়েছে যারা নিজেদের প্রয়োজনের সব কিছুই আল্লাহ্ পাকের দরবারে চায় এমনকি, যদি তাদের জুতোর ফিতাও ছিড়ে যায় তা-ও তারা আল্লাহর কাছেই চায়। (তিরমিজী শরীফ)

আর হযরত সাবেত বনানীর (রঃ) বর্ণনায় রয়েছে, এমনকি তারা লবনও আল্লাহ্ পাকের নিকটই চায়।

হযরত নোমান এবনে বশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দোয়াই এবাদত, এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেছেন।

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে,

الكرم هو التقوى والحسب هو الايمان

(পরহেযগারীই সম্মান, পরহেযগারী ব্যতীত কোন সম্মান নেই, আর ঈমানই হলো বংশ, ঈমান ব্যতীত কোন বংশ পরিচয় নেই।)

আলোচ্য হাদীসেরও এ অর্থই হতে পারে (১) দোয়াই এবাদত (২) এবাদতই দোয়া, হয়তো এর তাৎপর্য হলো দোয়া এবং এবাদতের মর্মকথা একই, কেননা প্রত্যেক দোয়াই এবাদত এবং প্রত্যেক এবাদতেই থাকে দোয়া। আর দোয়া ও এবাদতের যোগ্য আল্লাহ্ পাক ব্যতীত আর কেউ নয়, যেমন পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ

'আর আপনার প্রতিপালক প্রত্যাদেশ করেছেন যে, তোমরা আল্লাহ্ পাক ব্যতীত আর কারো বন্দেগী করোনা'।

যেমন হাদীসে কুদসীতে রয়েছে, যে ব্যক্তি আমার নিকট চাওয়ার স্থলে আমার প্রশংসায় মশগুল থাকে তাকে আমি সে ব্যক্তির চেয়ে বেশী দান করি যে আমার নিকট চেয়ে থাকে।

তিরমিজী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে (আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন) যে ব্যক্তিকে পবিত্র কোরআনের তেলাওয়াত আমার জিকর এবং আমার নিকট চাওয়া থেকে বিরত রাখে আমি তাকে এমন দান করি যা যারা চেয়ে থাকে তাদের চেয়ে উত্তম হয়।[১]

এ পৃথিবীতে মানুষ নানা প্রয়োজনের জিঞ্জিরে আবদ্ধ, তাই মানুষকে সর্বদা নিজের প্রয়োজনের আয়োজনে ব্যস্ত থাকতে হয়, ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় কিন্তু তার গৃহীত ব্যবস্থা সর্বদা যে সফল হবে এমনও নয়, তাই কোন উদ্দেশ্য সফল করার লক্ষ্যে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি যা একান্ত জরুরী তা হলো, ঐ একই উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে দোয়া করা। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা করার শিক্ষা দিয়েছেন, কেননা প্রকাশ্যে উদ্দেশ্য সফল হওয়ার জন্যে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তার সাফল্য-অসাফল্য নির্ভর করে আল্লাহ পাকের মর্জির উপর। অতএব, কোন কাজের সাফল্যের জন্যে চেষ্টা-তদ্বীর যেমন জরুরী, ঠিক তেমনি আল্লাহ পাকের মহান দরবারে দোয়া করাও একান্ত জরুরী।

দোয়ার ফজিলত ও মাহাত্ম

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দোয়া হলো এবাদতের মগজ। (তিরমিজী শরীফ)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমরা আল্লাহ পাকের নিকট তাঁর দান লাভের জন্যে আরজী পেশ কর, কেননা আল্লাহ পাক পছন্দ করেন যেন তাঁর নিকট আরজী পেশ করা হয়। আর উত্তম এবাদত হলো আল্লাহ পাকের দানের অপেক্ষা করা।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের নিকট কিছু চায়না আল্লাহ পাক তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। আর এজন্যেই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-২৫২-৫৩
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৯০

"নিশ্চয় যারা অহংকার করে আমার এবাদত থেকে বিরত থাকে তারা অপমানিত অবস্থায় দোযখে প্রবেশ করবে"।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দোয়া করার ব্যাপারে দুর্বলতার পরিচয় দিওনা, কেননা দোয়ার বর্তমানে আল্লাহ পাক কাউকে ধ্বংস করেন না। (এবনে হাব্বান ও হাকেম)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দোয়া হলো মোমেনের হাতিয়ার, দ্বীন ইসলামের খুঁটি, আসমান ও জমীনের নূর। (হাকেম)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যার জন্যে দোয়ার দ্বার খোলা হয়েছে তার জন্যে রহমতের দুয়ারও খুলে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ পাকের দরবারে যা কিছু চাওয়া হয় তন্মধ্যে সবচেয়ে পছন্দনীয় হলো, সর্ব প্রকার বালা-মছিবত থেকে নিরাপত্তার জন্যে আরজী পেশ করা। (তিরমিজী)

দোয়া কবুল করার প্রতিশ্রুতি

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের মধ্যে যার জন্যে দোয়ার দরজা খোলা হয়েছে তার জন্যে কবুলিয়তের দুয়ারও খোলা হয়েছে। (এবনে আবি শায়বা)

হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের প্রতিপালক অত্যন্ত লজ্জাশীল, যখন বন্দা হাত তুলে তাঁর নিকট কিছু চায় তখন বন্দাকে শূণ্য হস্তে ফেরত দিতে তিনি লজ্জাবোধ করেন। (তিরমিজী, আবু দাউদ, বায়হাকী)

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যদি কোন মুসলমান এমন দোয়া করে যাতে গুনাহর কোন কথা না থাকে এবং কোন আত্মীয়তার হক্ব বিনষ্ট হওয়ারও সম্ভাবনা না থাকে, আল্লাহ পাক তাকে তিনটি বস্তুর একটি অবশ্যই দান করেন।

(এক) তার দোয়া অনতিবিলম্বে কবুল করা হয়।

(দুই) অথবা আখেরাতে তাকে দান করার জন্যে তার দোয়া সংরক্ষিত থাকে।

(তিন) তার কাম্য বস্তুর সমান কোন বিপদ তার উপর থেকে দূর করে দেয়া হয়।

সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! যদি আমরা অনেক দোয়া করি তবু আমরা এর বিনিময় পাব? তিনি এরশাদ করলেন, আল্লাহ পাকের নিকট অনেক কিছু আছে, তিনি অবশ্যই দান করবেন। (আহমদ)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যদি দোয়াতে গুনাহ অথবা আত্মীয়তার হক্ব নষ্ট করার কোন কথা না থাকে তবে বন্দার দোয়া অবশ্যই কবুল হয়। তবে শর্ত হলো সে যদি দোয়া কবুল হওয়ার জন্যে তাড়াহুড়া না করে। আরজ করা হলো, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! এ পর্যায়ে তাড়াহুড়া করার তাৎপর্য কি? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, বন্দা বলতে থাকে, আমি দোয়া করেছি, আমি দোয়া করেছি (অর্থাৎ বার বার দোয়া করেছি) কিন্তু দোয়া কবুল হওয়ার কোন লক্ষণ দেখিনা। অবশেষে সে ক্লান্ত হয়ে যায় এবং দোয়া করা ছেড়ে দেয় (অর্থাৎ দোয়া অব্যাহত রাখা জরুরী, কখনো কাম্য বস্তুর জন্যে তাড়াহুড়া করা সমীচিন নয়। যখন আল্লাহ পাকের মর্জি হবে তখনই তিনি দান করবেন)। (মুসলিম শরীফ)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দোয়া সেই বিপদাপদের ব্যাপারেও উপকারী হয় যা এখনও আপতিত হয়নি তবে ভবিষ্যতে হবে। অতএব, হে আল্লাহর বন্দাগণ! তোমরা সর্বদা দোয়া করতে থাক। (তিরমিজী শরীফ)

ইমাম আহমদ (রঃ) হযরত মাআজ এবনে জবল (রাঃ) এবং হযরত যাবের (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট দোয়া করে আল্লাহ পাক তার আরজী কবুল করেন, অথবা তার দোয়ার সমান কোন বিপদ দূর করে দেন। অবশ্য এর জন্যে শর্ত রয়েছে, দোয়াতে যেন কোন গুনাহর কথা না থাকে এবং আত্মীয়তার বন্ধন বিনষ্ট করারও কোন কথা না থাকে। (তিরমিজী)

যাদের দোয়া অবশ্যই কবুল হয়

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তিনটি দোয়া কবুল হয়, যে দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। (এক) পিতার দোয়া (সন্তান-সন্ততির জন্যে) (দুই) মজলুমের দোয়া (জালেমের বিরুদ্ধে) (৩) মুসাফিরের দোয়া। (তিরমিজী, আবু দাউদ, এবনে মাজা)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে আরো বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তিন ব্যক্তির দোয়া ফেরত দেয়া হয় না।

(এক) রোজাদারের দোয়া ইফতারের সময়।

(দুই) ন্যায় বিচারক রাষ্ট্রনায়কের দোয়া

(তিন) মজলুমের দোয়া। মজলুমের বদদোয়া মেঘমালার উপর তোলা হয়, তার জন্যে আসমানের দ্বার খুলে দেয়া হয়। আর আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, আমার ইজ্জতের শপথ! আমি অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করবো যদিও কিছু সময় পরে হোক। (তিরমিজী)

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কোন মুসলমান তার ভাই মুসলমানের জন্যে তার অনুপস্থিতিতে যে দোয়া করে তা কবুল হয়। যখন সে তার ভাইয়ের কল্যাণের জন্যে দোয়া করে তখন তার নিকটবর্তী ফেরেশতা আমীন বলে (অর্থাৎ তোমার ভাইয়ের জন্যে আল্লাহ পাক যেন তাই করে দেন আর তোমার জন্যেও এমনটি যেন হয়)। (মুসলিম শরীফ)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কয়েকটি দোয়া কবুল হয়ে থাকে যেমন (১) মজলুমের দোয়া প্রতিশোধ না নেয়া পর্যন্ত (২) হাজীর দোয়া বাড়ী ফিরে আসা পর্যন্ত (৩) রুগ্ন ব্যক্তির দোয়া সুস্থ হওয়া পর্যন্ত (৪) কোন মুসলমান ভাইয়ের দোয়া অন্য মুসলমান ভাইয়ের জন্যে তার অনুপস্থিতিতে। এরপর তিনি এরশাদ করেছেনঃ সর্বাধিক শীঘ্র যে দোয়া কবুল হয় তা হলো, কোন মুসলমান ভাইয়ের জন্যে তার অনুপস্থিতিতে অন্য মুসলমান ভাইয়ের দোয়া।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) থেকেও এ মর্মের হাদীস বর্ণিত হয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ সর্বাধিক শীঘ্র যে দোয়া কবুল হয় তা হলো, কোন অনুপস্থিত মুসলমান ভাইয়ের জন্যে দোয়া। (তিরমিজী, আবু দাউদ)

দোয়া কবুল হওয়ার শর্ত সমূহ

(১) পানাহারে, পোষাক-পরিচ্ছদে হারাম বস্তু সমূহ পরিহার করা এক কথায় যাবতীয় বিষয়ে হারাম পন্থা পরিহার করা।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মানুষ সুদীর্ঘ সফর করে, তার চুল থাকে এলোমেলো,

বালু মিশ্রিত, এমন অবস্থায় সে আসমানের দিকে হাত তুলে এবং বলে, হে পরওয়ারদেগার! হে পরওয়ারদেগার! কিন্তু তার খাবার হারাম পন্থায় অর্জিত, পোষাক-পরিচ্ছদও হারাম পন্থায় রোজগার করা এবং তার প্রতিপালনও হয়েছে হারাম রোজগার দ্বারা। এমন অবস্থায় দোয়া কিভাবে কবুল হবে? (মুসলিম শরীফ)

(২) দোয়া কবুল হওয়ার জন্যে আরেকটি শর্ত হলো, দোয়ার সময় আল্লাহ পাকের দরবারে মনকে হাযির করতে হবে অর্থাৎ দোয়া শুধু মৌখিক হবেনা, বরং তা আন্তরিক হতে হবে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে পূর্ণ বিশ্বাস বা একীন নিয়ে দোয়া কর, মনে রেখ গাফেল অন্তরের দোয়া আল্লাহ পাক কবুল করেন না। (তিরমিজী শরীফ)

(৩) কোন ব্যাপারে দোয়া করতে হলে বিষয়টি সম্পূর্ণ সুনির্দিষ্ট হতে হবে। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যদি দোয়া করে, সে যেন এভাবে না বলে, 'হে আল্লাহ! যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে আমাকে মাফ করে দিও', বরং সংকল্পের সুদৃঢ়তা বজায় রেখে পূর্ণ একীন নিয়ে এবং মনের আগ্রহ নিয়ে দোয়া করবে (অর্থাৎ এ বিশ্বাস রাখবে যে, আল্লাহ পাক তার দোয়া অবশ্যই কবুল করবেন)। কেননা আল্লাহ পাক যা কিছু দান করেন তা তাঁর নিকট বড় কিছু হয়না। (মুসলিম শরীফ)

দোয়ার আদব

হযরত ফোজালা এবনে ওবায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মসজিদে অবস্থান করছিলেন, এক ব্যক্তি আগমন করলো এবং নামাজ আদায়ের পর বললো, হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করে দিও এবং আমার প্রতি রহম কর। তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ হে নামাজী! তুমি (দোয়া করার ব্যাপারে) তাড়াহুড়া করে ফেলেছে, যখন তুমি নামাজ আদায় করলে, এরপর বসে যাবে, এরপর আল্লাহ পাকের গুণাবলীর উল্লেখ করে তুমি তাঁর শানে হামদ পেশ করবে, এরপর আমার প্রতি দরুদ শরীফ প্রেরণ করবে, এরপর তুমি দোয়া করবে। বর্ণনাকারী বলেন, কিছুক্ষণ পর অপর এক ব্যক্তি এসে নামাজ আদায় করলো, নামাজ আদায়ের পর আল্লাহ পাকের হামদ পেশ করলো, এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করলো, তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তোমার দোয়া কবুল করা হবে। (তিরমিজী, আবু দাউদ, নেসায়ী)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি নামাজ আদায় করছিলাম, যখন আমার নামাজের শেষ বৈঠক পূর্ণ করলাম তখন সর্ব প্রথম আল্লাহ পাকের শানে হাম্‌দ পেশ করলাম, এরপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পেশ করে দোয়া করলাম, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ তোমার যা ইচ্ছা দরবারে এলাহীতে চাও, তোমাকে দান করা হবে।

হযরত ওমর এবনুল খাত্তাব (রাঃ) বর্ণনা করেন, আসমান জমীনের মধ্যে দোয়াকে থামিয়ে রাখা হয় যতক্ষণ তুমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পাঠ না কর, দোয়ার কোন অংশ উর্দ্ধে গমন করেনা। (তিরমিজী)

হযরত মালেক এবনে ইয়াসার (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যখন তোমরা আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া কর তখন হাতকে ছড়িয়ে দোয়া করবে, হাতের পৃষ্ঠদেশ থেকে দোয়া করোনা।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তোমরা হাত খুলে দোয়া কর, হাতের পৃষ্ঠদেশ থেকে দোয়া করোনা। আর দোয়া শেষ করে দু' হাত দ্বারা মুখমন্ডল মুছে নিও।

হযরত ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দোয়াতে উভয় হাত ওঠাতেন, যতক্ষণ মুখমন্ডলে হাতগুলো ফিরিয়ে না নিতেন ততক্ষণ পর্যন্ত হাত নীচে নামাতেন না। (তিরমিজী শরীফ)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অর্থপূর্ণ ভাষায় দোয়া করা পছন্দ করতেন, আর অন্য শব্দগুলো পরিহার করতেন।
–(আবু দাউদ শরীফ)

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দোয়ার সময় এতখানি হাত ওঠাতেন যে দু' বগলের সাদা অংশ দেখা যেত।

সায়েব এবনে এজিদ তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন দোয়া করতেন তখন উভয় হাত উঠিয়ে মুখমন্ডল মুছে নিতেন।

হযরত একরামা (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, দোয়ার অবস্থা হলো এই, তোমরা দোয়ার সময় দু' হাত কাঁধ পর্যন্ত তুলবে। (আবু দাউদ শরীফ)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, (দোয়াতে) নির্দিষ্ট স্থানের ওপর হাত তোলা বেদআত। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বক্ষ বরাবর হাত উঠিয়ে দোয়া করতেন, তদুর্দ্ধে উত্তোলন করতেন না।

হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যদি কারো নাম উল্লেখ করতেন তবে তার জন্যে দোয়া করতেন। এ পর্যায়ে শুরুতে নিজের জন্যে দোয়া করতেন।[১] (তিরমিজী শরীফ)

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) আলোচ্য আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, আল্লাহ পাকের এ অনুগ্রহের প্রতি আমরা কোরবান হয়ে যাই যে, তিনি আমাদেরকে দোয়া করার হেদায়েত করেছেন এবং দোয়া কবুল করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এজন্যে বিখ্যাত বুজুর্গ হযরত সুফিয়ান সত্তরী (রঃ) নিজের দোয়ায় একথা বলতেন, হে আল্লাহ! তুমি সেই পবিত্র সত্ত্বা, যার দরবারে ঐ বন্দা প্রিয় যে অধিক পরিমাণে দোয়া করে। আর সে বন্দা অপ্রিয় যে দোয়া না করে অথচ মানুষের চরিত্র হলো এই যে, তার নিকট চাওয়া হলে সে অসন্তুষ্ট হয়।

হযরত কা'বে আহবার (রঃ) বর্ণনা করেন, এ উম্মতকে তিনটি এমন জিনিষ দান করা হয়েছে যা অন্য কোন উম্মতকে ইতোপূর্বে দেয়া হয়নি। প্রত্যেক নবীকে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এই হুকুম দেয়া হয়েছে যে, তুমি তোমার উম্মতের উপর সাক্ষী হিসেবে থাক, কিন্তু সমগ্র মানব জাতির উপর আল্লাহ পাক উম্মতে মোহাম্মদিয়াকে সাক্ষী করেছেন। পূর্বকালের নবীগণকে বলা হতো যে, দ্বীন ইসলামে কোন সংকীর্ণতা নেই আর এ উম্মতকে বলা হয়েছে, তোমাদের ধর্মে কোন ক্ষতিকর কিছু নেই। প্রত্যেক নবীকে বলা হতো, আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাক কবুল করবো কিন্তু এ উম্মতকে বলা হয়েছে তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।

আবু ইয়ালাতে রয়েছে, আল্লাহ পাক হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলেছেন যে, চারটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে তন্মধ্যে একটি আমার জন্যে এবং একটি আপনার জন্যে, আর একটি আপনার এবং আমার মধ্যে। আর একটি হলো আপনার এবং অন্যান্য বন্দাদের মধ্যে। যে চরিত্রটি বিশেষ করে আমার জন্যে তা হলো শুধু আমারই বন্দেগী কর, আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-২৫২-৫৭

করোনা। আর যা শুধু আপনার তা হলো, আপনার প্রত্যেক ভাল কাজের আমি পরিপূর্ণ বদলা দেব। আর যা আমার এবং আপনার মাঝে রয়েছে তা হলো আপনি দোয়া করবেন, আমি কবুল করবো। আর যে চরিত্রটি আপনার এবং আমার অন্যান্য বন্দাদের মধ্যে রয়েছে তা হলো, আপনি তাদের জন্যে তাই পছন্দ করবেন, যা নিজের জন্যে পছন্দ করেন। মসনদে আহমদে রয়েছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দোয়া হলো এবাদতের মূল কথা, এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেছেন।

মসনদে আহমদে সংকলিত আরেকখানি হাদীসে রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করেনা, আল্লাহ পাক তার প্রতি রাগান্বিত হন।

হযরত মোহাম্মদ এবনে মুসলেমা আনসারী (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর তাঁর তরবারীর খাপ থেকে একটি ক্ষুদ্র কাগজ বের হয়েছিল। তাতে লেখা ছিল, তুমি তোমার প্রতিপালকের রহমতের সময়গুলোর সন্ধান করতে থাক, হয়তো এমন সময় তুমি দোয়া করবে যখন তাঁর রহমত উপচে পড়বে। আর সে সুযোগে হয়তো তুমি এমন কল্যাণ লাভ করবে যার পর আর কখনো তোমার কোন প্রকার আক্ষেপ থাকবেনা।[১]

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

'নিশ্চয় যারা অহংকার করে আমার এবাদত থেকে বিরত থাকে তারা অপমানিত অবস্থায় দোযখে প্রবেশ করবে'।

অহংকারের ভয়াবহ পরিণতি

যারা অহংকারের কারণে আল্লাহ পাকের এবাদত বন্দেগী থেকে বিরত থাকে, তাদেরকে চরম অপমানিত অবস্থায় দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। তাদের জন্যে কঠিন অপমানজনক শাস্তি অবধারিত। আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ পর্যায়ে মসনদে আহমদে সংকলিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কেয়ামতের দিন অহংকারী লোকদেরকে পিপীলিকার মত করে একত্রিত করা হবে। দোযখের "বলিস" নামক কারাগারে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে। জ্বলন্ত অগ্নি শিখা দাউ দাউ করে উপরের দিকে উঠতে থাকবে। অন্য দোযখীদের দেহের পূঁজ, মল-মূত্র তাদেরকে ভক্ষণ করতে দেয়া হবে। এক বুজুর্গ বর্ণনা করেন, এবনে আবি হাতেমে রয়েছে, আমি রুমে কাফেরদের হাতে বন্দী ছিলাম। একদিন আমি একটি গায়বী আওয়াজ শ্রবণ করলাম যা পাহাড়ের সুউচ্চ চূড়ার দিক থেকে ভেসে আসছিল।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৪ পৃষ্ঠা-৫৩

'হে আল্লাহ! আশ্চর্য সে ব্যক্তির প্রতি, যে তোমার মা'রেফাত হাসিল করা সত্বেও অন্যদের কাছে আশা করে'।

'হে আল্লাহ! আশ্চর্য সে ব্যক্তির প্রতি, যে তোমার পরিচয় পাওয়া সত্বেও অন্যের কাছে নিজের প্রয়োজনের কথা বলে'।

একটু পর পুনরায় উচ্চারিত হয়, 'আশ্চর্য সে ব্যক্তির প্রতি, যে তোমার মা'রেফাত হাসিল করা সত্বেও অন্যের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে এমন কাজ করে যাতে তুমি অসন্তুষ্ট হও'। একথা শ্রবণ করে ঐ বুজুর্গ বলেন, আমি উচ্চস্বরে প্রশ্ন করি, তুমি কে? জ্বীন না মানুষ? জবাব আসে আমি মানুষ, তুমি সে সব দিক থেকে তোমার ধ্যান পরিবর্তন কর যা তোমার জন্যে উপকারী হবেনা, আর এমন কাজে মশগুল হও যা তোমার কাজে আসবে।[১]

اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ط

'তিনিই আল্লাহ পাক, যিনি রাতকে তৈরী করেছেন যেন তোমরা তাতে বিশ্রাম কর, আর দিনকে তৈরী করেছেন দেখার জন্যে'।

রাত ও দিনের সৃষ্টি আল্লাহ পাকের বিশেষ দান

অর্থাৎ অনন্ত অসীম করুণাময় আল্লাহ পাক মানব জাতির আরাম এবং বিশ্রামের জন্যে, তার সুখ-শান্তির জন্যে রাতকে সৃষ্টি করেছেন, এমনিভাবে দিনকে সৃষ্টি করেছেন যেন মানুষ দিনের আলোতে নিজের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্রতী হয় এবং জীবন-যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দিনের আলোতে সে চলাফেরা করতে পারে। সারা দিনের কর্মব্যবস্ততার কারণে স্বাভাবিক ভাবেই সে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়, এ ক্লান্তি দূর করার জন্যে চাই একটু অখন্ড বিশ্রাম, দয়াময় আল্লাহ পাক মানুষের সে বিশ্রাম এবং সুখ-শান্তির জন্যে সৃষ্টি করেছেন রাত। অতএব, মানব-মনে আল্লাহ পাকের এসব দানের উপলব্ধি থাকা উচিত এবং আল্লাহ পাকের মহান দরবারে এসব নেয়ামতের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা একান্ত কর্তব্য। কিন্তু একথা অপ্রিয় হলেও সত্য যে মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। অন্যত্র এরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৪ পৃষ্ঠা-৫৩-৫৪

'নিশ্চয় মানুষ বড় জালেম, বড়ই অকৃতজ্ঞ'। তবে সবাই যে জালেম এবং অকৃতজ্ঞ তা-ও নয়; বরং সামান্য সংখ্যক লোক আল্লাহ পাকের দরবারে শোকর গুজার থাকে। যেমন এরশাদ হয়েছেঃ

وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ

'আর অতি সামান্য সংখ্যক লোকই শোকর গুজার'। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ

'নিশ্চয় আল্লাহ পাক মানুষের প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল, কিন্তু অনেক লোকই শোকর গুজার হয়না'।

মানুষের কর্তব্য

মানুষের এ জীবন ও জীবনের যথার্সবস্ব আল্লাহ পাকেরই দান, অতএব, মানুষের একান্ত কর্তব্য হলো আল্লাহ পাকের দরবারে সর্বক্ষণ শোকর গুজার থাকা, কিন্তু মানুষ আল্লাহ পাকের অফুরন্ত দান নিয়ে ব্যস্ত, মহান দাতা সম্পর্কে উদাসীন। এ কারণেই অধিকাংশ মানুষ আল্লাহ পাকের অকৃতজ্ঞ, এটিই মানুষের দুর্ভাগ্য, আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ

'যদি তোমরা আমার শোকর গুজার হও, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তবে আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত নেয়ামত আরো বাড়িয়ে দেব। পক্ষান্তরে, যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও তবে মনে রেখ, আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠিন'।

আল্লাহ পাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে নেয়ামত বৃদ্ধি পায়, আর নাফরমানী ও অকৃতজ্ঞতায় শাস্তি অবধারিত হয়। এতদ্ব্যতীত, শুধু দান নিয়ে ব্যস্ত হওয়া এবং দাতাকে ভুলে যাওয়া অভদ্রতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। শোকর গুজারীর তাৎপর্য হলো, অন্তরে আল্লাহ পাকের দানের কথা উপলব্ধি করা এবং রসনার দ্বারা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং তিনি তাঁর দান ব্যবহারের জন্যে যে রীতি-নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা, কখনো এর বরখেলাফ না করা।

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ

'এই তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ পাক, তিনিই প্রত্যেকটি বস্তুর স্রষ্টা, তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তবুও তোমরা কিভাবে বিপথগামী হও?

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ দিবা-রাত্রির সৃষ্টি মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ দান, যদি শুধু দিন বা শুধু রাত হতো তবে মানুষের কত অসুবিধা হতো তা ভাবতেও কষ্ট হয়। আর শুধু দিবা-রাত্রিই নয়; বরং মানুষের জীবন ও জীবনের সব কিছুই আল্লাহ পাকের দান। অতএব, শুধু এক আল্লাহ পাকের বন্দেগী করাই মানুষের একান্ত কর্তব্য। তাই এ আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ

এই তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ পাক, তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা, তিনিই তোমাদের পালনকর্তা, তিনিই রিয্ক দাতা, তিনিই ভাগ্য-নিয়ন্তা, তিনি ব্যতীত এবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই। অতএব, তোমরা শুধু তাঁরই বন্দেগী কর। এমন অবস্থায় তোমরা তাঁর এবাদত না করে কোথায় চলে যাও? তোমরা কিভাবে বিপথগামী হও? কিভাবে তাঁর সঙ্গে শেরক কর? যিনি তোমাদেরকে অস্তিত্ব দান করেছেন, যিনি তোমাদের জীবনের যাবতীয় আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করেছেন, যাঁর অফুরন্ত নেয়ামত তোমরা অহরহ ভোগ করে চলেছ, এ সমস্ত নেয়ামতের দাবী হলো তোমরা শুধু এক আল্লাহ পাকেরই বন্দেগী করবে, তাঁর প্রতিই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে কিন্তু তোমরা কিভাবে তাঁর নাফরমানী কর?

كَذٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِيْنَ كَانُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ

কিভাবে তাঁর স্থলে অন্য কিছুকে উপাস্য মনে কর? মূলতঃ যারা আল্লাহ পাকের কথা অস্বীকার করে তারা এভাবেই ফিরে যায়।

অর্থাৎ মক্কার কাফেররা যেভাবে আল্লাহ পাকের কথাকে অস্বীকার করতো ঠিক তেমনি অন্যরাও আল্লাহর এবাদতের স্থলে অন্য কিছুর এবাদতের দিকে ফিরে যায়, কেননা তারা আল্লাহর কথাকে অস্বীকার করে। তাদের নিজেদের হাতে বানানো মূর্তির সম্মুখেই তারা মাথা নত করে। যা কোন কিছুকেই সৃষ্টি করেনা, বরং নিজেই অন্যের সৃষ্টি; এমন অসহায় বস্তুর সম্মুখেও মানুষ মাথানত করে। এর চেয়ে লজ্জাকর, অপমানজনক এবং দুঃখজনক আর কী হতে পারে!

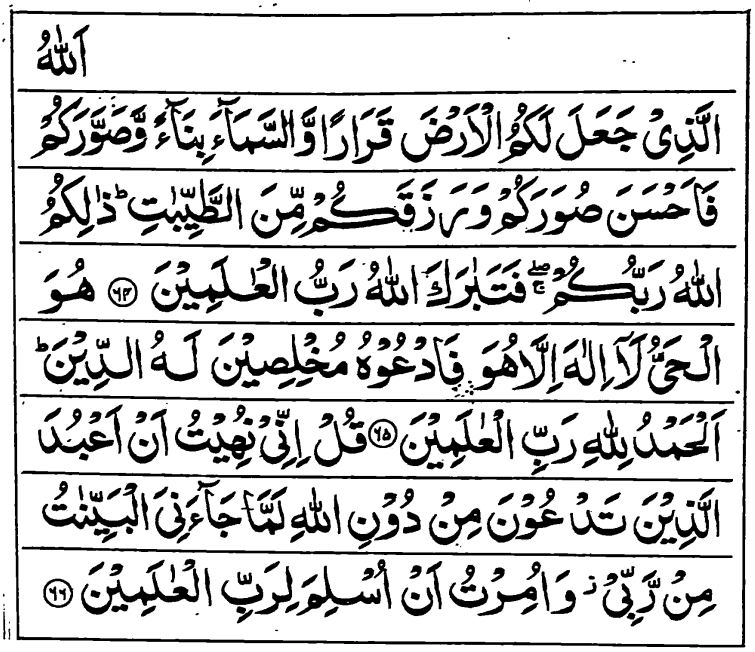
اَللّٰهُ
الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّصَوَّرَكُمْ
فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّیِّبٰتِ ؕ ذٰلِكُمُ
اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۶۴﴾ هُوَ
الْحَیُّ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِیْنَ لَهُ الدِّیْنَ ؕ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۶۵﴾ قُلْ اِنِّیْ نُهِیْتُ اَنْ اَعْبُدَ
الَّذِیْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَمَّا جَآءَنِیَ الْبَیِّنٰتُ
مِنْ رَّبِّیْ ۫ وَاُمِرْتُ اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۶۶﴾

তরজমা

(৬৪) আল্লাহ পাকই তোমাদের জন্যে জমীনকে বাসোপযোগী করে দিয়েছেন আর আসমানকে করেছেন ছাদ। আর তিনিই তোমাদের আকৃতি গঠন করে দিয়েছেন এবং তোমাদেরকে অতি সুন্দর আকৃতি দান করেছেন। আর তোমাদেরকে দান করেছেন অতি উত্তম রিয্ক। তিনিই আল্লাহ পাক, যিনি তোমাদের প্রতিপালক, অতএব, কত মহান বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহ পাক।

(৬৫) তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই অতএব, তোমরা একাগ্রচিত্তে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কর, একনিষ্ঠ হয়ে শুধু তাঁরই বন্দেগী কর, সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের জন্যে।

(৬৬) (হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, আমার নিকট আমার প্রতিপালকের তরফ থেকে প্রকাশ্য নিদর্শন সমূহ আসার পর আল্লাহ পাক ব্যতীত তোমরা যাদেরকে ডাক, তাদের বন্দেগী করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে, আর আমি আদিষ্ট হয়েছি বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের প্রতি আত্মসমর্পণ করতে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে শেরক পরিহার করার এবং আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানানো হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাকের এমন নেয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে যা সমগ্র মানব জাতি ভোগ করে এবং যে নেয়ামত সমূহ সকলেই দেখতে পায়, ফলে আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনা সহজ হয় তাই এরশাদ হয়েছেঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً

তিনিই আল্লাহ পাক, যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্যে বাসোপযোগী করেছেন, এটি মানব জাতির প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ দান। যদি মাটি কাঁদার ন্যায় নরম হতো অথবা পাথরের ন্যায় শক্ত হতো তবে মানুষ তাতে বাড়ী-ঘর নির্মাণ করতে সক্ষম হতো না।

বস্তুতঃ জমীনকে আল্লাহ পাক ফরাশের মত বিছিয়ে রেখেছেন এবং পাহাড়গুলোকে তার উপর বসিয়ে দিয়েছেন যাতে করে জমীন স্থবির থাকে, কেননা জমীনের নীচে পানি রয়েছে, তরীর মত সে নড়াচড়া করতো, আল্লাহ পাক মানব জাতির বাসোপযোগী করার লক্ষ্যে জমীনের উপর পাহাড় রেখে তাকে স্থির-নিশ্চল করে রেখেছেন, যেন মানুষ তার উপর আবাসস্থল নির্মাণ করতে পারে, চলাফেরা করতে পারে, বিশ্রাম করতে পারে, রাতের বেলা সুখ-নিদ্রায় বিভোর হতে পারে এবং দিবাভাগে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, শুধু তাই নয়, বরং হে মানব জাতি! উপরের দিকে তাকাও, লক্ষ্য কর কিভাবে আল্লাহ পাক নীলাকাশকে গম্বুজের মত তৈরী করে রেখেছেন, এর জন্যে কোন খুঁটি ব্যবহার করা হয়নি, আল্লাহ পাকের কুদরতী হাতেই বিশাল বিস্তৃত আসমানকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দিয়েছেন যাকে মানুষের জন্যে ছাদ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন আর তাতেই তিনি রেখে দিয়েছেন দীপ্তিময় সূর্য, আলোকময় চন্দ্র এবং অগণিত নক্ষত্রপুঞ্জও। আর ঐ আসমান থেকেই মানুষের জন্যে আল্লাহ পাক বারি বর্ষণ করেন, আল্লাহ পাকের নির্দেশক্রমেই মেঘমালা আকাশে ঘোরাফেরা করতে থাকে, যখন যেখানে নির্দেশ হয় সেখানেই বারি বর্ষিত হয়। এসব কিছু মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের অফুরন্ত নেয়ামত সমূহের কয়েকটি মাত্র যা দেখে মানুষ এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনতে পারে এবং তাঁর প্রতি শোকর গুজার হতে পারে।

وَّصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ

আর আল্লাহ পাকই তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন এবং অতি সুন্দর আকৃতি দান করেছেন। প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কত সুন্দর, সুশৃংখলভাবে সঠিক স্থানে স্থাপন করেছেন।

মানুষের সৃষ্টি-সৌন্দর্যের ব্যাপারে আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ

'নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতম গঠনে'।

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে একথা বলে তালাক দিয়েছিল, যদি তুমি চন্দ্র থেকে সুন্দরী না হও, তবে তোমাকে তিন তালাক। তদানীন্তন কালের ওলামায়ে কেরাম এ মত প্রকাশ করলেন যে, একথা দ্বারা ঐ ব্যক্তির স্ত্রী তালাক হয়ে গেছে। কিন্তু সে জমানার সুবিখ্যাত আলেম ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বললেন, না একথা দ্বারা তার স্ত্রী তালাক হয়নি, তিনি দলিল হিসেবে এ আয়াত পেশ করলেন, আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন যে তিনি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে সৃষ্টি করেছেন, তাহলে মানুষ যে চন্দ্রের চেয়েও সুন্দর একথা প্রমাণিত হয়। অতএব, তার স্ত্রী তালাক হয়নি।

যাহোক, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ তিনি মানুষকে সুন্দরতম আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, আর এমন সুন্দর, আকর্ষণীয় আকৃতি অন্য কোন সৃষ্টিকে তিনি দান করেননি। এজন্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে মানুষের শোকর গুজার হওয়া কর্তব্য। অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْٓ اٰدَمَ

'আর আমি আদম সন্তানদেরকে সম্মানিত করেছি'। সমগ্র সৃষ্টি জগতের উপর আল্লাহ পাক মানুষকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, মানুষ হাত দিয়ে খাদ্যবস্তু গ্রহণ করে এবং এরপর মুখে পুরে দেয়। খাদ্য গ্রহণের জন্যে তার মাথা নত করতে হয়না, অথচ সমস্ত প্রাণী জগত তার মুখ দিয়েই খাদ্য গ্রহণ করে এবং এজন্যে মাথাকে নত করতেই হয় কিন্তু মানুষের বেলায় তা হয়না, এটি একমাত্র মানুষেরই বৈশিষ্ট্য। এজন্যে মানুষের কর্তব্য হলো আল্লাহ পাকের মহান দরবারে শোকর আদায় করা।

وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ

'আর আল্লাহ পাক তোমাদেরকে সুস্বাদু পবিত্র রিয্ক দান করেছেন'।

যেমন সূরা বাকারাতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ.....

'হে মানব জাতি! তোমরা বন্দেগী কর তোমাদের প্রতিপালকের, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকেও। হয়তো তোমরা পরহেযগারী অবলম্বন করবে। সেই প্রতিপালক, যিনি জমীনকে তোমাদের জন্যে ফরাশ এবং আসমানকে ছাদ স্বরূপ সৃষ্টি করেছেন আর আসমান থেকে তিনি বারিবর্ষণ করেছেন। এবং তা দ্বারা তিনি তোমাদের উপজীবিকা হিসাবে ফলপুঞ্জ উৎপাদন করেন। অতএব, তোমরা এসব কিছু সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর কোন কিছুকে আল্লাহ পাকের সাথে শরীক করোনা'।

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ

তিনিই আল্লাহ পাক, যিনি তোমাদের প্রতিপালক, আর কত মহান বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাক, সমগ্র সৃষ্টি জগৎকে তিনিই লালন-পালন করেন, সব কিছু তাঁরই মুখাপেক্ষী। শ্রেষ্ঠত্ব তাঁরই, মাহাত্ম তাঁরই, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী তিনিই।

هُوَ الْحَىُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

'তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই'।

'তিনি চিরঞ্জীব' একথার তাৎপর্য হলো তিনি সর্বদা আছেন এবং সর্বদা থাকবেন। তাঁর কোন লয় নেই, ক্ষয় নেই, তাঁর বিদায় নেই, মৃত্যু নেই, তাঁর অস্তিত্ব সর্বত্র বিরাজমান। তাঁর জীবন কারো দান নয়; বরং নিজস্ব। শুরুও তিনি, শেষও তিনি। প্রকাশ্যেও তিনি, গোপনেও তিনি, তিনিই স্রষ্টা, সমগ্র সৃষ্টি জগৎ তাঁরই, তাঁর কোন গুণ অন্য কারো মধ্যে নেই, তাঁর কোন দৃষ্টান্ত নেই, তিনি নজিরবিহীন। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। তিনি এক, অদ্বিতীয় তাই তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। মানুষের এবাদতের যোগ্য শুধু তিনিই, আর কেউ নয়।

فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ط

'অতএব, তোমরা একাগ্রচিত্তে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কর এবং একনিষ্ঠ হয়ে শুধু তাঁরই বন্দেগী কর'। সকল কাম্য বস্তুর জন্যে তোমরা তাঁরই নিকট আরজী পেশ কর।

আলোচ্য আয়াতের "একনিষ্ঠ হয়ে শুধু তাঁরই বন্দেগীর" অর্থ হলো, এ এবাদত শেরক থেকে পবিত্র হবে, এমনিভাবে লোক দেখানোর অপপ্রয়াস থেকেও মুক্ত থাকবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

'সমস্ত প্রশংসা শুধু এক আল্লাহ্ পাকেরই জন্যে, যিনি বিশ্ব প্রতিপালক'।

অর্থাৎ এক আল্লাহ্ পাকের বন্দেগী কর এবং বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্ পাকের শানে হাম্দ পেশ কর, তাঁর অফুরন্ত নেয়ামতের জন্যে তাঁর শোকর আদায় কর।

ইমাম এবনে জরীর (রঃ) বলেছেন, তত্ত্বজ্ঞানীগণের মত হলো, যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পড়বে তার কর্তব্য হলো আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন পাঠ করা।

মুজাহেদ (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর একথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, আর হযরত সায়ীদ এবনে যোবায়ের (রঃ)-ও বলেছেন, যখন তুমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পাঠ করবে তখন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিনও পাঠ করবে, তাহলে আয়াতের উপর আমল হয়ে যাবে।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে যোবায়ের (রাঃ) প্রত্যেক নামাজের সালামের পরই পাঠ করতেন,

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير لا حول ولا قوة الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل وله الاسماء الحسنى لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون

এবং তিনি বলতেন, হযরত রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নামাজের পর এ দোয়া পাঠ করতেন।[১]

قُلْ اِنِّىْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَمَّا جَآءَنِىَ الْبَيِّنٰتُ مِنْ رَّبِّىْ وَاُمِرْتُ اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৪ পৃষ্ঠা-৫৫

'(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, তোমরা আমার নিকট আমার প্রতিপালকের তরফ থেকে প্রকাশ্য নিদর্শন সমূহ আসার পর আল্লাহ্ পাক ব্যতীত যাদেরকে ডাক, তাদের বন্দেগী করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে, আর আমি আদিষ্ট হয়েছি বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্ পাকের প্রতি আত্মসমর্পণ করতে'।

শানে নযুল

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, ওলীদ এবনে মগীরাহ্, শায়বা এবনে রবীয়াহ্ গয়রহ্ হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট হাযির হয়ে বললো, আপনি আপনার নতুন ধর্মের কথা পরিত্যাগ করুন এবং নিজের বাপ-দাদার ধর্ম মেনে চলুন', তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

তাই তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় কাফেরদেরকে জানিয়ে দেন যে, তোমরা যাদের পূজা কর, আমার প্রতিপালকের তরফ থেকে আমাকে তাদের পূজা করতে নিষেধ করা হয়েছে। আমার নিকট আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদের সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ এসে গেছে। এমন অবস্থায় আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্য কারো বন্দেগী করার প্রশ্নই ওঠেনা। আমার পক্ষে তওহীদের সত্য মতবাদ থেকে দূরে থাকা সম্ভব নয়, আমাকে শেরক থেকে দূরে থাকার এবং এক আল্লাহ্ পাকের প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণের আদেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ পাকের তাবেদার বন্দা হয়ে জীবন যাপনের মধ্যেই রয়েছে মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ। তওহীদে বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমেই মানবতার উৎকর্ষ সাধন হয়।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ
ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا ۚ
وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوْٓا اَجَلًا مُّسَمًّى وَّلَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٧﴾ هُوَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ فَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا
يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٦٨﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ
اٰيٰتِ اللّٰهِ ۭ اَنّٰى يُصْرَفُوْنَ ﴿٦٩﴾

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৯২
তফসীরে মাজহারী খণ্ড-১০, পৃষ্ঠা-৩৫৯

তরজমা

(৬৭) তিনিই আল্লাহ পাক, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দ্বারা, এরপর শুক্র বিন্দু দ্বারা, এরপর জমাট রক্ত দ্বারা, এরপর তোমাদেরকে শিশু করে বের করে আনেন, এরপর তোমরা যেন উপনীত হও যৌবনে, এরপর তোমরা হয়ে যাও বৃদ্ধ, তোমাদের মধ্যে কারো কারো ইতোপূর্বেই মৃত্যু ঘটে, আর তা এজন্যে যে, তোমরা (পৃথিবীতে) একটি নির্ধারিত অবকাশই পেয়ে থাক। আর হয়তো তোমরা (বিষয়টি) অনুধাবন করতে পার।

(৬৮) তিনিই আল্লাহ পাক, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যুমুখে পতিত করেন, আর যখন তিনি কোন কিছু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন শুধু বলেন, 'হও' তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়।

(৬৯) (হে রসূল!) আপনি কি লক্ষ্য করেননি তাদেরকে, যারা আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহ সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তারা কোন্ দিকে ফিরে চলে যায়?

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আল্লাহ পাক মানব জাতির প্রতি তাঁর নেয়ামত সমূহের উল্লেখ করেছেন। বন্দাদের বিশ্রামের জন্যে তিনি রাত এবং কর্মের জন্যে তিনি দিন সৃষ্টি করেছেন। কর্মের সুবিধার্থে তিনি দিনকে আলোকিত করেছেন এবং বিশ্রামের প্রয়োজনে তিনি রাতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন, এমনি আরো নেয়ামতের উল্লেখ করা হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে মানুষকে তার নিজের সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহ পাকের নেয়ামত সমূহ উপলব্ধি করে তাঁর শোকর গুজার হওয়ার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا ج وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوْٓا اَجَلًا مُّسَمًّى

মানব জীবনের ক্রমবিকাশ

তিনিই আল্লাহ পাক, যিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, কেননা আল্লাহ পাক আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)-কে মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করেছেন, আর অন্য মানুষকে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করা হয়।

এজন্যে যে, মানুষ মাটি থেকে উৎপন্ন খাদ্য-দ্রব্য গ্রহণ করে, ঐ খাদ্য দ্বারা রক্ত তৈরী হয়, আর ঐ রক্তকে আল্লাহ পাক শুক্রে পরিণত করেন, আর শুক্র বিন্দু থেকে আল্লাহ পাক মানুষকে সৃষ্টি করেন। সে শুক্র বিন্দুকে তিনি প্রথমে জমাট রক্ত, পরে গোশ্ত, অস্থি এবং চর্মে পরিণত করেন, এরপর তাতে মানবাবকৃতি দান করেন, একটা নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হলে তাকে মাতৃ-গর্ভ থেকে শিশু রূপে বের করে আনেন। কোরআনে করীমের অন্যত্র আল্লাহ পাক কথাটিকে এভাবে এরশাদ করেছেনঃ

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ۙ وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

'আর আল্লাহ পাক তোমাদেরকে বের করে এনেছেন তোমাদের মায়েদের উদর থেকে, এমন অবস্থায় যখন তোমরা কিছুই জানতে না, আর আল্লাহ পাকই তোমাদেরকে দান করেছেন শ্রবণ শক্তি, দর্শন শক্তি এবং অন্তর, হয়তো তোমরা শোকর গুজার হবে'।

আর শৈশবের পরে আসে কৈশোর, এরপর ঐ কিশোরই যৌবনে পদার্পণ করে। সে পূর্ণ শক্তি অর্জন করে, কিন্তু শক্তি তো চির দিন স্থায়ী হয়না, একটা নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হবার পরই একজন যুবক বার্ধক্যে উপনীত হয়। তার সমস্ত শক্তি ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে, এরই মধ্যে কারো মৃত্যুও হয়ে যায়, আর কেউ বার্ধক্যের দুর্বলতা, অসুস্থতা সহ জীবনের ঘানি টেনে মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষা করতে থাকে।

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় হলো এই, মানুষ তার জীবনের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে আল্লাহ পাকের অগণিত দানে ধন্য, এর কোন্‌টি মানুষ অস্বীকার করতে পারে? এর কোন পর্যায়ে আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কারো কোন ভূমিকা রয়েছে কি? অবশ্যই নেই, তাহলে আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কিছুকে উপাস্য মনে করা বা তাঁর সাথে শেরক করা মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নয়, আর এজন্যে কোরআনে করীমে শেরককে জুলুম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

নিশ্চয় শেরক সবচেয়ে বড় জুলুম, দ্বিতীয়তঃ মানুষের সৃষ্টি, তার ক্রমবিকাশ, তার উন্নতি, পরিবৃদ্ধি সবই এক আল্লাহ পাকেরই নিয়ন্ত্রণাধীন, এতে অন্য কারো তো দূরের কথা, মানুষের নিজেরও কোন হাত নেই।

মানুষের একান্ত কর্তব্য

অতএব, মানুষের একান্ত কর্তব্য হলো আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা। মানুষের আনুগত্যের সর্ব প্রথম হক্বদারই হলেন স্বয়ং আল্লাহ পাক, তাই মানুষ মাত্রকে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে হয় আল্লাহ পাকের মহান দরবারে আর এটিই ইসলাম। ইসলামের যাবতীয় বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করাই হলো আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা। আর এটিই পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা, আলোচ্য আয়াতে এ মহান শিক্ষা গ্রহণের আহবান জানান হয়েছে মানব-সৃষ্টির রহস্য উদ্‌ঘাটনের মাধ্যমে। আত্মবিস্মৃত মানব জাতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে তার অস্তিত্বের কথা, জীবন ও জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের অবস্থার কথা, তার প্রতি আল্লাহ পাকের মহান দানের কথা, যাতে করে মানুষ আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ অনুগত ও কৃতজ্ঞ হয়ে থাকে। কিভাবে মানুষ আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করবে? এ প্রশ্নের জবাবেই আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআন নাযিল করেছেন। অতএব, পবিত্র কোরআনের মর্মবাণী উপলব্ধি করতে হবে এবং এর উপর কিভাবে মানুষ আমল করবে তা হাতে কলমে বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে প্রেরিত হয়েছেন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। তাই তাঁকে অনুসরণ করতে হবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, এটিই মানব জীবনের সাফল্য লাভের একমাত্র পথ।

وَّلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

হয়তো তোমরা এ সত্য অনুধাবন করবে অর্থাৎ মানুষের জীবনের বিভিন্ন অবস্থার কথা বুদ্ধিমান মাত্রেরই চিন্তা করা উচিত, কেননা এসব বিষয় একটু ভেবে দেখলেই মানুষ প্রকৃত সত্যের সন্ধান পাবে এবং চির শান্তি ও চির নাজাতের পথ পাবে। পক্ষান্তরে, যারা নির্বোধ, তারা এ জীবনের আয় রোজগার এবং ভোগ-বিলাসে নিজেকে হারিয়ে ফেলে এবং অবশেষে নিঃস্ব হয়ে পৃথিবী থেকে চির বিদায় গ্রহণ করে।

এ পর্যন্ত মানুষের জীবনের বিভিন্ন অবস্থার কথা বলা হলো কিন্তু শুধু জীবনই নয়; বরং মানুষের জীবনের মত তার মৃত্যুও আল্লাহ পাকের হুকুমে এবং তাঁর নির্দেশ-ক্রমেই হয়ে থাকে। এক কথায় মানুষের জীবন ও মৃত্যু, পৃথিবীতে তার আগমন ও গমন সব কিছুই আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে। তবে এতদসত্ত্বেও আল্লাহ পাক মানুষকে ইচ্ছাশক্তি দান করেছেন, সে ইচ্ছা করলে ভাল কাজ করতে পারে, আর ইচ্ছা করলে মন্দ কাজও করতে পারে। সবচেয়ে বড় উত্তম কাজ হলো আল্লাহ পাকের প্রতি ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি পূর্ণ ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ করা। আর সব চেয়ে মন্দ কাজ হলো, আল্লাহ

পাকের সাথে শেরক করা এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ না করা।

মানুষের জীবন-গঠনে যেমন তার কোন হাত নেই, ঠিক তেমনি মানব জীবনের অবসানেও মানুষের কোন ইচ্ছা কার্যকর হয়না। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

هُوَ الَّذِيْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ فَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ

'তিনিই আল্লাহ পাক, যিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যুমুখে পতিত করেন, তিনি যখন কোন কিছু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন শুধু বলেন, "হও" তৎক্ষণাত তা হয়ে যায়'।

মানুষের জীবন ও মরণ এক কথায় সব কিছুই বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্ পাকের হাতেই রয়েছে, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তাঁর জন্যে কোন কিছুই কঠিন নয়। এমনকি, মানুষের জীবন ও মৃত্যু বা কোন কিছুই করতে তাঁকে আদৌ কোন বেগ পেতে হয়না। আল্লাহ পাকের ব্যবস্থাপনা হলো এই, তিনি কোন কিছু করার ইচ্ছা করলে শুধু বলেন, 'হও', সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে যায়। এতটুকু বিলম্ব হয়না, এটিই তাঁর মহান কুদরতের অন্যতম জীবন্ত নিদর্শন।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, যেভাবে পৃথিবীতে মানুষকে জীবন দেয়া এবং মৃত্যুমুখে পতিত করা অত্যন্ত সহজ, ঠিক এমনিভাবে মৃত্যুর পর মানুষকে নবজীবন দান করা এবং কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযির করাও আল্লাহ পাকের পক্ষে আদৌ কোন কঠিন কাজ নয়। অতএব কেয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এজন্যে আল্লাহ্ পাক অন্যত্র এরশাদ করেছেনঃ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ

'আর তোমরা সেই আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নিকট অবশেষে তোমরা একত্রিত হবে'।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ ۭ اَنّٰى يُصْرَفُوْنَ

'(হে রসূল!) আপনি কি লক্ষ্য করেননি তাদেরকে যারা আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহ সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তারা কোন্ দিকে ফিরে চলে যায়'?

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমতের বিবরণ ছিল, বিশেষতঃ মানব জীবনের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন অবস্থায় মানুষ আল্লাহ পাকের যে অনন্ত অসীম দান ভোগ করে থাকে তা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। মানুষ যেন আত্ম-বিস্মৃত হয়ে না থাকে; বরং আল্লাহ পাকের নেয়ামত সমূহ স্মরণ করে তাঁর

একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং অবশেষে আখেরাতে দরবারে এলাহীতে হাযির হওয়ার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, এটি বুদ্ধিমান মাত্রেরই কর্তব্য।

কিন্তু যারা নির্বোধ, যারা নিজেদের জীবন সম্পর্কে চিন্তাও করেনা এবং ভবিষ্যতের জন্যে তথা পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের জন্যে কোন প্রস্তুতিও গ্রহণ করেনা তারা আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহ সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাঁর নিদর্শন সমূহ সম্পর্কে বিতর্ক করে, তাদের কথা এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে তারা কিভাবে বিপথগামী হচ্ছে? তারা কোন্‌দিকে ফিরে চলে যাচ্ছে?

বস্তুতঃ সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে, এতে কোন অস্পষ্টতা বা জড়তা নেই, এক আল্লাহ পাকই সমগ্র সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা, তিনিই পালনকর্তা, তিনিই রিয্‌ক দাতা, তাঁর নিকটই মানুষকে অবশেষে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডের জনো জবাবদিহী করতে হবে। অতএব, যারা এসব ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হয়, বুঝেও বোঝেনা, সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ দেখেও মানেনা, তাদের পরিণতি হবে ভয়াবহ।

الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِالْكِتٰبِ وَبِمَآ
اَرْسَلْنَا بِهٖ رُسُلَنَا ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٠﴾ اِذِ الْاَغْلٰلُ فِيْٓ
اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلٰسِلُ ۚ يُسْحَبُوْنَ ﴿٧١﴾ فِي الْحَمِيْمِ ۙ ثُمَّ فِي
النَّارِ يُسْجَرُوْنَ ﴿٧٢﴾ ثُمَّ قِيْلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ﴿٧٣﴾
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۭ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا بَلْ لَّمْ نَكُنْ نَّدْعُوْا مِنْ
قَبْلُ شَيْـــًٔا ۭ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٤﴾ ذٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
تَفْرَحُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُوْنَ ﴿٧٥﴾
اُدْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى
الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٧٦﴾ فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۚ فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ
بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ ﴿٧٧﴾

তরজমা

(৭০) যারা আল্লাহর কিতাবকে অস্বীকার করে এবং আমার রসূলগণের সঙ্গে যা প্রেরণ করেছি তাকেও মিথ্যা বলে, অচিরেই তারা বুঝতে পারবে।

(৭১) যখন তাদের গলদেশে বেড়ি ও শেকল থাকবে, তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে।

(৭২) ফুটন্ত পানিতে, এরপর তাদেরকে অগ্নিতে দগ্ধ করা হবে।

(৭৩) এরপর তাদেরকে বলা হবে, তারা কোথায়? যাদেরকে তোমরা তাঁর শরীক করতে।

(৭৪) আল্লাহ পাক ব্যতীত, তারা বলবে, তারা তো আমাদের নিকট থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। মূলতঃ ইতোপূর্বে আমরা কোন কিছুকেই ডাকতাম না, এভাবেই আল্লাহ পাক কাফেরদেরকে পথ হারা অবস্থায় থাকতে দেন।

(৭৫) আর তা এ কারণে যে, তোমরা পৃথিবীতে অন্যায় ভাবে উল্লাস করতে আর এজন্যে যে, পৃথিবীতে তোমরা অহংকার করতে।

(৭৬) তোমরা দোযখের দ্বারে প্রবেশ কর, চিরদিন তাতে তোমরা থাকবে। অহংকারীদের আবাসস্থল কত নিকৃষ্ট।

(৭৭) অতএব, (হে রসূল!) আপনি সবর অবলম্বন করুন, আল্লাহ পাকের প্রতিশ্রুতি ধ্রুব সত্য। আমি তাদেরকে যে সব কথা দিচ্ছি তার কোনটি আপনাকে আমি দেখিয়ে দেই, অথবা আপনাকে মৃত্যুমুখে পতিত করি (তবে একথা নির্ঘাত সত্য যে,) আমারই নিকট তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

তফসীরুল কোরআন

যারা আল্লাহর নবীগণকে মিথ্যা জ্ঞান করে, তাঁদের প্রতি যে আসমানী গ্রন্থ সমূহ নাযিল হয়েছে সেগুলোকেও অস্বীকার করে এবং নবী রসূলগণ যে শরীয়ত নিয়ে এসেছেন সেগুলোকে অস্বীকার করতেও যারা দ্বিধাবোধ করেনা, তাদের কঠিন কঠোর শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে এ আয়াত সমূহে।

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, যারা আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহ সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয় তাদের পরিণাম হবে ভয়াবহ। আর আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের অন্যায় আচরণের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে তাদের বিভিন্ন প্রকার কঠোর শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায়।

এরশাদ হয়েছেঃ

الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِالْكِتٰبِ وَبِمَآ اَرْسَلْنَا بِهٖ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ

যারা আল্লাহর কিতাবকে অস্বীকার করে এবং নবী রসূলগণের সঙ্গে যে শরীয়ত প্রেরণ করেছি তাকেও মিথ্যা বলে, অচিরেই তারা বুঝতে পারবে যে এমন অন্যায় আচরণের পরিণতি কত ভয়াবহ হয়।

اِذِ الْاَغْلٰلُ فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلٰسِلُ ط يُسْحَبُوْنَ ۞ فِى الْحَمِيْمِ ثُمَّ فِى النَّارِ يُسْجَرُوْنَ

কাফেরদের বিভিন্ন প্রকার শাস্তি

তারা এ ভয়াবহ পরিণতি তখন দেখতে পাবে যখন কেয়ামতের কঠিন দিনে তাদের গলদেশে বেড়ী ও শেকল থাকবে, তাদেরকে জন্তুর মত দোযখের দিকে টেনে নেয়া হবে, কখনো ফুটন্ত পানিতে আর কখনো জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, দোযখের আগুন যখন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকবে তখন তাদেরকে তাতে নিক্ষেপ করা হবে। আর তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, এ কাফেরদেরকে দোযখের অগ্নির ইন্ধন বানানো হবে।

মোটকথা, কাফেরদেরকে দোযখে বিভিন্নভাবে শাস্তি দেয়া হবে, কখনো ফুটন্ত পানিতে, আর কখনো জ্বলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ করে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে।

তিরমিজী, নেসায়ী. এবনে মাজা, এবনে আবি হাতেম, এবনে হাব্বান, হাকেম এবং বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যদি সীসা নির্মিত কোন গোলা আসমান থেকে জমিনে নিক্ষেপ করা হয়, যার দূরত্ব পাঁচশত মাইল, তবে সে গোলাটি রাত পর্যন্ত জমীনে পৌঁছে যাবে (অর্থাৎ পাঁচশ' বছরের পথ অতিক্রম করতে আনুমানিক দশ বারো ঘন্টার প্রয়োজন হবে)। কিন্তু যদি দোযখের ভেতরে কোন গোলা নিক্ষেপ করা হয় তবে তার তলদেশ পর্যন্ত পৌঁছতে চল্লিশ বছরের প্রয়োজন হবে (অর্থাৎ দোযখের গভীরতা আসমান জমীনের দূরত্ব থেকে অনেক বেশী)।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-২৬২

ثُمَّ قِيْلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ

'এরপর তাদেরকে বলা হবে, তারা কোথায়? যাদেরকে তোমরা তাঁর শরীক করতে'।

অর্থাৎ যখন কাফেরদেরকে ফুটন্ত পানিতে বা জ্বলন্ত অগ্নিতে শাস্তি দেয়া হবে তখন তাদেরকে ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে, দুনিয়ার জীবনে তোমরা যাদেরকে আল্লাহ পাকের শরীক মনে করতে, তোমরা যাদের পূজা-অর্চনা করতে আজ তাদেরকে ডাক, তাদের পক্ষে সম্ভব হলে তারা তোমাদের সাহায্য করুক, কেননা তোমরা আল্লাহ পাকের বন্দেগীর স্থলে তাদের পূজা করেছিলে।

قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا بَلْ لَّمْ نَكُنْ نَّدْعُوْا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا ط

'তারা বলবে, 'তারা তো আমাদের নিকট থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। মূলতঃ ইতোপূর্বে আমরা কোন কিছুকেই ডাকতাম না'।

ফেরেশতাগণের প্রশ্নের জবাবে দোযখীরা বলবে, আল্লাহ পাক ব্যতীত যাদেরকে আমরা ডাকতাম আজ তারা আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছে, তারা অদৃশ্য হয়ে গেছে, আর তখন তারা এ মিথ্যা কথাও বলবে যে, আমরা কখনো কাউকে আল্লাহর শরীক মানিনি এবং আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ডাকিনি।

তফসীরকারগণ একথাও লিখেছেন, ভয়াবহ আযাব দেখে তারা শেরক করার কথাই অস্বীকার করবে। তারা বলবে, আমরা কখনো শেরক করিনি অর্থাৎ আমরা এমন কিছুর এবাদত করিনি যা আমাদের জন্যে উপকারী না হয়।

হাসান এবনে ফজল বলেছেন, আমরা ইতিপূর্বে কিছুই করিনি অর্থাৎ সৃষ্টির যে এবাদত করেছি তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ الْكٰفِرِيْنَ

'এভাবেই আল্লাহ পাক কাফেরদেরকে পথ হারা অবস্থায় থাকতে দেন'।

এর অর্থ হলো, আল্লাহ পাক এভাবে কাফেরদেরকে বিভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ করে রাখেন। আল্লাহ পাক ব্যতীত তারা যে মূর্তিগুলোর পূজা করতো, যাদের কাছে তারা আশা করতো এবং যাদের সম্মুখে তারা মাথা নত করতো সেগুলো যে একেবারেই প্রাণহীন জড় পদার্থ একথা তারা ভালভাবেই জানত, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা সেগুলোকেই মেনে চলত। সত্য বিরোধিতায় তারা ছিল খড়গহস্ত, মানবতার অবমাননায় তারা ছিল লিপ্ত, তারা দুর্নীতিকেই নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছিল, সত্যের

দুশমনীকেই তারা সত্য মনে করেছিল, পূর্ব পুরুষদের বাতিল ধ্যান-ধারণাকেই তারা সত্য মনে করেছিল, আল্লাহ পাক তাদেরকে ঐ অবস্থায়ই রেখে দিয়েছেন আর তা অকারণেও নয়; বরং

ذٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُوْنَ

এর কারণ হলো, তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে উল্লাস করতে আর এ কারণে যে তোমরা অহংকার করতে।

অর্থাৎ কাফেরদের অহংকার, অহমিকা এবং অন্যায় উল্লাসই তাদের শাস্তির কারণ হয়েছে।

اُدْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ج

(তাদেরকে তখন বলা হবে) তোমরা দোযখের দ্বারে প্রবেশ কর, চির দিন তোমাদেরকে তাতে থাকতে হবে।

فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ

'অহংকারীদের আবাসস্থল কত নিকৃষ্ট'!

আলোচ্য আয়াতের كذالك শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যবহ অর্থাৎ যেভাবে এ কাফের মুশরেকরা পথভ্রষ্ট হয়েছে, ঠিক এভাবে দুনিয়ার সমস্ত কাফের মুশরেকদেরকে পথভ্রষ্ট করে রাখা হয়। তারা তাদের কল্যাণের পথ খুঁজে পায়না, ক্ষেত্র বিশেষে কল্যাণের পথ খুঁজে পেলেও তারা তাতে চলেনা, আর আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তাদেরকে যে শাস্তি দেয়া হয় তার কারণ হলো তারা অন্যায় ভাবে উল্লাসে মেতে উঠত এবং অহংকার করতো, অথচ অহংকার করার কোন অধিকার তাদের ছিলনা।

অতএব, এ অন্যায়-অনাচার এবং অহংকারের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ তোমরা দোযখের সাতটি দ্বার দিয়ে প্রবেশ কর, তোমরা সেখানে চিরদিন থাকবে।

যারা দুনিয়ার জীবনে সত্য-বিরোধিতায় তৎপর হয়, অহংকার করে সত্যকে বাধা দেয় তাদের স্থায়ী ঠিকানা হলো দোযখ, আর তা অত্যন্ত মন্দ ঠিকানা।

فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ج فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِىْ نَعِدُهُمْ اَوْنَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ

'অতএব, (হে রসূল!) আপনি সবর অবলম্বন করুন, আল্লাহ পাকের প্রতিশ্রুতি ধ্রুব সত্য, আমি তাদেরকে যে সব কথা দিচ্ছি তার কোনটি আপনাকে দেখিয়ে দেই,

অথবা আপনাকে মৃত্যুমুখে পতিত করি (তবে একথা নির্ঘাত সত্য যে) আমারই নিকট তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে'।

এ আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে এরশাদ করেছেনঃ কাফেরদের অন্যায়-অত্যাচারে আপনি সবর অবলম্বন করুন, আল্লাহ পাক আপনাকে অবশেষে বিজয় দান করবেন এবং কাফেরদেরকে ধ্বংস করবেন। এটি আল্লাহ পাকের ওয়াদা, তাঁর পক্ষ থেকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি, আর আল্লাহ পাকের প্রতিশ্রুতি ধ্রুব সত্য, তা অবশ্যই পূর্ণ করা হবে। এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। 'আমি তাদেরকে যে সব কথা দিচ্ছি' অর্থাৎ তাদের যে শাস্তির কথা ঘোষণা করছি তার কোনটি হয়তো আপনাকে দেখিয়ে দেব যেমন বদরের যুদ্ধে, খন্দকের যুদ্ধে এবং মক্কা বিজয়ে আল্লাহ পাক কাফেরদের পরাজয় এবং অপমানজনক শাস্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দেখিয়ে দিয়েছেন,

اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ

অথবা তাদের কোন কোন শাস্তি দেখার পূর্বেই আপনাকে মৃত্যুমুখে পতিত করবো তবে নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন যে, আখেরাতে তাদের শাস্তি অবশ্যই হবে আর তাদেরকে আমার নিকট অবশ্যই ফিরে আসতে হবে এবং কর্ম অনুযায়ী তাদেরকে শাস্তি দেব, এটি নির্ঘাত সত্য। শাস্তি থেকে তাদের রেহাই নেই, হয় আপনার জীবদ্দশায় দুনিয়াতেই শাস্তি ভোগ করবে, অথবা যদি এরই মধ্যে আপনার ওফাত হয় তবে আখেরাতে তাদের শাস্তি অবধারিত।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ
وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِيَ
بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ فَاِذَا جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ
هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٧٨﴾ اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَنْعَامَ
لِتَرْكَبُوْا مِنْهَا وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ﴿٧٩﴾ وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَ
لِتَبْلُغُوْا عَلَيْهَا حَاجَةً فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ
تُحْمَلُوْنَ ﴿٨٠﴾ وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ ۖ فَاَيَّ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُنْكِرُوْنَ ﴿٨١﴾

তরজমা

(৭৮) (হে রসূল!) নিশ্চয় আমি আপনার পূর্বে অনেক রসূল প্রেরণ করেছি, তন্মধ্যে কারো কারো কথা আমি আপনাকে বলেছি, আর কোন কোন নবীর কথা আপনাকে বলি নাই। আল্লাহ্ পাকের হুকুম ব্যতীত নিদর্শন পেশ করার ক্ষমতা কোন রসূলেরই নাই। এরপর যখন আল্লাহ্ পাকের হুকুম হবে তখন ইনসাফ-ভিত্তিক ফয়সালা করা হবে, মিথ্যাবাদীরা তখন সর্বস্বান্ত হয়ে যাবে।

(৭৯) আল্লাহ্ পাকই তোমাদের উপকারার্থে চতুঃষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, তার কোন কোনগুলোর উপর তোমরা আরোহন কর, আর কোনটাকে তোমরা আহার করে থাক।

(৮০) আর তাতে রয়েছে তোমাদের জন্যে প্রচুর উপকার, তোমরা যা কিছু প্রয়োজন বোধ কর এগুলো দ্বারা তা পূর্ণ করে থাক, এবং এ চতুঃষ্পদ জন্তুগুলোর উপর এবং নৌযানের উপর তোমাদেরকে বহন করা হয়।

(৮১) আর আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শন সমূহ দেখিয়ে থাকেন, অতএব তোমরা আল্লাহ্ পাকের কোন্ নিদর্শনকে অস্বীকার করতে পারবে?

তফসীরুল কোরআন

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেনঃ (হে রসূল!) আপনার পূর্বে আল্লাহ্ পাক পৃথিবীতে মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে অনেক নবী রসূল প্রেরণ করেছেন, নবী রসূল প্রেরিত হওয়া নতুন কিছু নয়; বরং বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে আল্লাহ্ পাক তাঁর বন্দাদেরকে সরল-সঠিক পন্থা প্রদর্শনের নিমিত্তে অনেক নবী রসূল প্রেরণ করেছেন, তন্মধ্যে আপনি শুধু অন্যতম রসূল নন; বরং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল।

ইমাম আহমদ (রঃ) হযরত আবু জর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, হযরত আবুজর (রাঃ) বলেন, আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করেছি, নবীগণের সংখ্যা কত? তিনি এরশাদ করেছেনঃ ১ লক্ষ ২৪ হাজার। এরপর আরজ করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে রসূলগণের সংখ্যা কত? তিনি এরশাদ করেছেনঃ ৩১৩ জন। এই হাদীস এবনে রাহবীয়া তাঁর মসনদে, এবনে হাব্বান তাঁর গ্রন্থে এবং হাকেম মোস্তাদরাকে হযরত আবু লোবাবার সূত্রে বর্ণিত আছে বলে উল্লেখ করেছেন।[১]

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৪, পৃষ্ঠা-৮৮
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-২৬৪

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন যে পবিত্র কোরআনে মোট ২৭জন নবী রসূলের নামোল্লেখ করা হয়েছে। মূলতঃ নবী রসূলগণের সংখ্যার এলম এক আল্লাহ পাকেরই রয়েছে। যাঁদের উল্লেখ করা আল্লাহ পাকের মর্জি হয়েছে, কোরআনে করীমে তিনি তাঁদের উল্লেখ করেছেন। এজন্যেই এ আয়াতের শেষাংশে এরশাদ হয়েছেঃ

مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ

তাদের মধ্যে কারো কারো কথা আমি আপনার নিকট বর্ণনা করেছি, আর কারো কারো কথা বর্ণনা করিনি। তাদের প্রত্যেকেই যে সত্য ছিলেন, একথা অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে। তাই অন্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

ইসলামের উদার নীতি

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ

"আমরা নবীগণের সত্যতার ব্যাপারে কোন প্রকার পার্থক্য করিনা"। সকলকেই সত্য বলে জানি, তাঁরা সকলেই আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রেরিত, একথার প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখি। এটিই প্রকৃত মোমেনের কথা। এটিই ইসলামের শিক্ষা। ইসলামের এ উদার নীতিই তাকে বিশ্ব-জনীন জীবন বিধান রূপে পরিগণিত করেছে। পক্ষান্তরে, ইহুদীরা বনী ইসরাঈলী নবী ব্যতীত আর কাউকে মানেনা, তদুপরি বনী ইসরাঈলের শেষ নবী হযরত ঈসা (আঃ)-এর সঙ্গে তারা শত্রুতা রাখে। অপরপক্ষে, খৃষ্টানরা নবুওয়্যতের স্তর থেকে তাঁকে উন্নীত করে তাঁর সম্পর্কে এমন কথা বলে যা তাদের বলা উচিত নয়। ইসলাম যে পরিপূর্ণ, পূর্ণ পরিণত, বাস্তবের অগ্নি পরীক্ষায় বারে বারে পরীক্ষিত একমাত্র জীবন বিধান তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই, ইসলাম নবী রসূলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করেনা। পবিত্র কোরআনের চিরস্থায়ী ঘোষণা হলো, আল্লাহ পাকের প্রেরিত সমস্ত নবী রসূলগণই সত্য, এ পর্যায়ে এটিই শেষ কথা।

وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِىَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ

'আল্লাহ পাকের হুকুম ব্যতীত কোন নিদর্শন পেশ করার ক্ষমতা কোন রসূলেরই নেই'।

মোজেযা প্রসঙ্গে

মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে বিশেষ বিশেষ মোজেযা প্রদর্শনের আবদার করতো। তারই জবাবে আল্লাহ পাক এ

আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ মোজেযা প্রদর্শন করা নবীর কাজ নয়, আল্লাহ পাকের অনুমতি ব্যতীত কোন নবীই মোজেযা প্রদর্শন করতে পারেনা। মোজেযা মূলতঃ আল্লাহ পাকের কুদরত এবং ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ, আর তা তাঁর অনুমতি-ক্রমে নবী রসূলগণের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। আল্লাহ পাক তাঁর মর্জি মোতাবেক যখন ইচ্ছা, যেখানে ইচ্ছা, যে নবীর দ্বারা ইচ্ছা মোজেযা প্রকাশ করেন। যেমন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর জন্যে নমরুদের তৈরী অগ্নিকুন্ডকে ফুলের বাগানে পরিণত করেন। হযরত মূসা (আঃ)-এর লাঠির আঘাতে লোহিত সাগরের মাঝে হযরত মূসা (আঃ) ও তাঁর অনুসারী বনী ইসরাঈলের জন্যে পথ তৈরী করে দেন। এমনিভাবে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আঙ্গুলের ইশারায় চন্দ্রকে দ্বিখন্ডিত করা হয়। তাঁর দোয়ায় সপ্তম হিজরীতে খায়বরে অস্তমিত সূর্যকে ফিরিয়ে আনা হয় এবং এছাড়া মে'রাজের ঘটনার ন্যায় বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে। এসব কিছুই এক আল্লাহ পাকের ইচ্ছা, মর্জি এবং শক্তিতেই হয়।

অতএব, (হে রসূল!) মক্কার কাফেররা আপনার নিকট যে মোজেযার আবদার করে তা যদি আল্লাহ পাক আপনাকে কোন হেকমতের কারণে প্রদান না করেন, তবে আপনি ব্যথিত এবং চিন্তিত হবেন না; বরং সবর অবলম্বন করুন।

فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ

যখন আল্লাহ পাকের হুকুম হবে তখন ইনসাফ-ভিত্তিক ফয়সালা করা হবে, তখন এ বাতিলপন্থীরা সর্বস্বান্ত হবে।

অর্থাৎ যখন কোন জাতি সম্পর্কে আল্লাহ পাকের শাস্তির আদেশ হবে তখন সঠিকভাবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে। কাফেরদের শাস্তি হবে আর মোমেনগণ লাভ করবে বিজয়। বাতিলপন্থী, মিথ্যাবাদী, সত্য-বিরোধী এবং সত্যদ্রোহীরা সেদিন হবে সর্বস্বান্ত।

মক্কার যে সব কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতকে অস্বীকার করেছে, বিস্ময়কর মোজেযা সমূহ দেখেও তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি; বরং শত্রুতাবশতঃ নতুন নতুন মোজেযার আবদার করেছে তাদের উদ্দেশ্যে আলোচ্য আয়াতে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। এর পাশাপাশি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে রয়েছে এ সান্ত্বনা যে, অদূর ভবিষ্যতে এমনও সময় আসবে যখন অবাধ্য কাফেরদের শাস্তির আদেশ হবে। তখন তারা নিশ্চিহ্ন হবে এবং

সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হবে, সত্যের অনুসারীদের বিজয় লাভ হবে, যেমন বদরের যুদ্ধে আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেছিলেন, এরপর অষ্টম হিজরীতে অনুষ্ঠিত মক্কা বিজয়ের দিনও আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে ঐতিহাসিক সাফল্য দান করেছিলেন।

اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَنْعَامَ لِتَرْكَبُوْا مِنْهَا وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ

'আল্লাহ পাকই তোমাদের উপকারার্থে চতুঃষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, তন্মধ্যে কোন কোনগুলোর উপর তোমরা আরোহণ কর, আর কোনটাকে তোমরা আহার করে থাক'।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে তৌহীদের বিবরণের পাশাপাশি তৌহীদ বিরোধী পাপিষ্ঠ লোকদের ধ্বংসের কথাও রয়েছে। আর এ আয়াতে আল্লাহ পাকের কিছু কিছু নেয়ামতের উল্লেখ করে তৌহীদ বা তাঁর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানানো হয়েছে।

اَللّٰهُ الَّذِىْ.....

অর্থাৎ আল্লাহ পাক মানব জাতির উপকারার্থে চতুঃষ্পদ জন্তু যেমন উট, ঘোড়া প্রভৃতি সৃষ্টি করেছেন, এর মধ্যে কোন কোনটির উপর আরোহণ করে মানুষ তার মঞ্জিলে মকসুদে পৌছে যায়, আর কোন কোন জন্তুর গোশ্ত খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে, এভাবে মানুষ এসবের দ্বারা উপকৃত হয়। এগুলোই মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের মহান দান। আল্লাহ পাকের এসব নেয়ামতের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তাই মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য।

وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ فَاَىَّ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُنْكِرُوْنَ

'আর আল্লাহ পাক তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শন সমূহ দেখিয়ে থাকেন। অতএব, তোমরা আল্লাহ পাকের কোন্ নিদর্শনকে অস্বীকার করতে পারবে'?

বস্তুতঃ সমগ্র বিশ্ব-সৃষ্টিতে ছড়িয়ে আছে আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমতের বিস্ময়কর নিদর্শন সমূহ। উপরে নীলাভ আকাশের চাঁদোয়া এবং নীচে সবুজ ঘাষের ফরাশ, পাশে রয়েছে বৃক্ষ-তরুলতা, ফল-ফুল এবং অগণিত জীব-জন্তু, এসবের দ্বারাই তো মানুষ উপকৃত হয়। গরুর গোশ্ত খায়, দুধ পান করে, তদুপরি জমি চাষেও ব্যবহৃত হয়। উটকে ভার বহনের কাজে এবং আরোহণে ব্যবহার করা হয়। এমনিভাবে বকরীর গোশ্ত খাওয়া হয়, দুগ্ধ পান করা হয়, এর প্রত্যেকটিই মানব জাতির প্রতি আল্লাহ পাকের নেয়ামত, এর কোন্‌টি মানুষ অস্বীকার করতে পারে?

বিবেকবান মানুষের পক্ষে কোন কিছুই অস্বীকার করা সম্ভব নয়। অতএব, আল্লাহ পাকের এসব নিদর্শন সমূহ দেখে তাঁর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁর অফুরন্ত নেয়ামত ভোগ করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাই মানুষের কর্তব্য।

এ আয়াতে আরো একটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, তা হলো এ জন্তুগুলোকে আল্লাহ পাক আশরাফুল মাখলুকাত মানুষের সেবায় নিয়োজিত রেখেছেন, মানুষের জন্যে এগুলোকে জবেহ করা হালাল করেছেন, আল্লাহ পাক আরও ঘোষণা করেছেনঃ

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا

তিনিই আল্লাহ পাক, যিনি পৃথিবীর সব কিছুকে তোমাদের উপকারার্থে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ সর্বদা এর দ্বারা উপকৃত হয়। এসব কিছু মানুষের সেবক কিন্তু অত্যন্ত লজ্জাকর বিষয় এই, পৃথিবীর কোন কোন জাতি এসব জীব-জন্তুকেই উপাস্য জ্ঞান করে পূজা করে, তাদেরকে পবিত্র ভেবে পূজা করে, মানবতার এর চেয়ে বড় অবমাননা আর কি হতে পারে!

মানুষ যখন আত্ম-পরিচিতি লাভে ব্যর্থ হয়, আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবী রসূলগণের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয় এবং নিজের বিবেক-বুদ্ধিকে যখন মানুষ অকেজো করে রাখে তখন এমনি হীন এবং নীচ কাজে লিপ্ত হয়। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এ বিষয়ে আত্মবিস্মৃত মানব জাতিকে সর্তক করেছেন যে, এসব জীব-জন্তু তোমাদের উপাস্য হতে পারেনা, এগুলোর সৃষ্টি তোমাদের সেবার জন্যেই, আর এসব আল্লাহ পাকের নিদর্শন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর নেয়ামত, অতএব, নিদর্শন দেখে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তাঁর অনুগত হও, আর নেয়ামত ভোগ করে তাঁর শোকর গুজার থাক।

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآ
ثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾
فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ
وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٨٣﴾ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا
قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿٨٤﴾
فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ۖ سُنَّتَ اللَّهِ
الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ۖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ﴿٨٥﴾

তরজমা

(৮২) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনা? এবং তারা কি দেখেনা তাদের পূর্ববর্তী লোকদের দশা কী হয়েছিল? তারা তো এদের তুলনায় সংখ্যায় বেশী ছিল, অধিকতর প্রবল ছিল এবং পৃথিবীতে নিজেদের স্মৃতি চিহ্ন অধিক পরিমাণে রেখে গিয়েছিল, কিন্তু তাদের কীর্তিকলাপ তাদের কোন কাজে আসেনি।

(৮৩) যখন তাদের নিকট প্রকাশ্য নিদর্শন সমূহ নিয়ে নবী রসূলগণ উপস্থিত হন, তখন তারা তাদের জ্ঞান-বুদ্ধির বড়াই করতে থাকে, তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতো, তাই তাদের উপর পতিত হলো।

(৮৪) এরপর যখন তারা আমার আযাব দেখল তখন তারা বললো, আমরা এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনলাম এবং তাঁর সাথে যাদেরকে শরীক করতাম, তাদেরকেও আমরা প্রত্যাখ্যান করলাম।

(৮৫) আমার আযাব প্রত্যক্ষ করার পর তাদের ঈমান কোন উপকারে আসল না, আল্লাহ পাকের এ বিধান তাঁর বন্দাদের মধ্যে পূর্ব থেকেই প্রচলিত রয়েছে, তাই কাফেররা সেখানে সর্বস্বান্ত হয়ে গেল।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আল্লাহ পাকের অসংখ্য নেয়ামতের উল্লেখ করে তৌহীদ তথা আল্লাহ পাকের একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানানো হয়েছে। কিন্তু মক্কাবাসী এ আহবানে সাড়া দেয়নি এবং ইসলামের বিরোধিতায় তৎপর থাকে, অর্থ সম্পদের লোভ, অহংকার প্রভৃতি সত্য পথ গ্রহণের পথে ছিল তাদের জন্যে বাধা এবং এসবই ছিল তাদের অন্তরের রোগ। এ রোগ দূরীভূত করার লক্ষ্যেই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ

অর্থাৎ মক্কাবাসী কি দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করেনা? যদি তা করতো তবে তারা দেখত ইতোপূর্বে পৃথিবীতে যারা ছিল তারা তাদের চাইতে অধিকতর শক্তিশালী ছিল, তাদের ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য মক্কাবাসীর চেয়ে অনেক বেশী ছিল, কিন্তু আল্লাহ পাকের আযাবের মোকাবেলায় তা কোন কাজে আসেনি, আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হবার কারণে যখন তাদের প্রতি আযাব আপতিত হয়েছে তখন কোন ভাবেই তারা নিস্তার পায়নি, এমন অবস্থায় এ যুগের কাফেররা কিভাবে রক্ষা পাবে?

ইতিহাস থেকে শিক্ষা

এ আয়াতে অতীত ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণের আহবান জানানো হয়েছে। পূর্ববর্তীদের ইতিহাস থেকে পরবর্তীরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। যারা এ পৃথিবীতে ইতিপূর্বে আল্লাহ পাকের নাফরমানীতে লিপ্ত ছিল, তাদের পরিণতি কত ভয়াবহ হয়েছে তা পরবর্তী লোকেরা দেখে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করতে পারে।

ইমাম তাবারী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ (হে রসূল!) আপনার স্ব-জাতি মক্কাবাসী কাফের মুশরেকরা সিরিয়া এবং ইয়ামনে সফর করে থাকে, তারা কি দেখেনা যে, ইতোপূর্বে সে দেশের কাফেররা আল্লাহ পাকের নাফরমানীর কারণে কিভাবে নিশ্চিহ্ন হয়েছে, অথচ মক্কাবাসীর চেয়ে তারা ছিল অধিক শক্তিধর এবং বিপুল সম্পদের অধিকারী, তাদের অনেক স্মৃতি চিহ্ন আজো

পৃথিবীতে বিদ্যমান, তাদের বীরত্ব ও শক্তি সামর্থ্যের অনেক কাহিনী আজো লোকমুখে প্রচারিত কিন্তু এসব কিছু তাদের জন্যে উপকারী হয়নি, অতএব মক্কাবাসী যদি আল্লাহর নবীর বিরোধিতা করতে থাকে তবে তাদের ধ্বংসও অনিবার্য।

فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرِحُوْا بِمَا عِنْدَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ

'যখন তাদের নিকট প্রকাশ্য নিদর্শন সমূহ নিয়ে নবী রসূলগণ উপস্থিত হন, তখন তারা জ্ঞান-বুদ্ধির বড়াই করতে থাকে'।

আত্ম সংশোধনের পথ নির্দেশ

অতীতের বিভিন্ন জাতির নিকট যখন রসূলগণ প্রকাশ্য নিদর্শন সমূহ নিয়ে আগমন করেন তখন তারা বলে, এসব নিদর্শনের আমাদের কোন প্রয়োজন নেই, আমাদের নিকট যে জ্ঞান রয়েছে তাই যথেষ্ট, যেমন এ যুগেও অনেক আধুনিক শিক্ষিত লোকদের এমন কথা বলতে শোনা যায়, যখন তাদেরকে আখেরাতের প্রস্তুতি গ্রহণের কথা বলা হয়, আল্লাহ পাকের মহান দরবারে এ জীবন সম্পর্কে জবাবদেহী করতে হবে তা নিয়ে চিন্তা করতে বলা হয় তখন তারা জবাব দেয়, আপনাদের এসব কথার কারণেই তো আমরা পেছনে পড়ে রয়েছি। আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় আমরা অংশ নিতে পারিনা, অথচ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের উন্নতির কারণে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। কোরআনে করীমের এ আয়াতে আল্লাহ পাক এমন বিভ্রান্ত লোকাদের আত্ম সংশোধনের পথ-নির্দেশ করেছেন।

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় কোন বাধা বা বিপত্তি নেই কিন্তু তা মৃত্যু পর্যন্তই সীমিত, অথচ মানুষের জীবন-যাত্রা আরো অনেক দূর অব্যাহত থাকবে, মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষের এ স্তরটির অবসান ঘটে, কিন্তু এরপরই মানুষ আরেকটি স্তরে পৌছে যায়, মধ্যলোকে সে স্তর অনেক দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, এরপর মানুষকে কেয়ামতের কঠিন দিনে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযির হতে হবে। আর সে জীবন হবে চিরস্থায়ী অতএব, যে জ্ঞান কেবল এ জীবনের উন্নতি-অগ্রগতিতে উপকারী হয় তা পরজীবনেও ফলপ্রসূ হবে এমন নয়, সে জীবনে যে জ্ঞান উপকারী হয় তা নিয়ে আগমন করেন নবী রসূলগণ, তা লিপিবদ্ধ থাকে আসমানী গ্রন্থ সমূহে। বৈজ্ঞানিক উন্নতির এ যুগে যান্ত্রিক সভ্যতার বর্তমান পরিবেশে যে জ্ঞানের চর্চা হচ্ছে বা হবে তা আপাততঃ প্রশংসনীয় হলেও অবশেষে মানব জীবনের জন্যে তা উপকারী হবেনা, কেননা এসব কিছুর উপকার এ জীবনেই সীমিত, এ জীবনই যখন থাকবেনা তখন এর উপকারও থাকবেনা, পবিত্র কোরআনের এ আয়াত মানুষকে এ সম্পর্কেই

সতর্ক করছে। যারা পরিণামদর্শী নয় তারা তাদের অর্জিত জ্ঞান নিয়েই মুগ্ধ, কিন্তু এ জ্ঞান অবশেষে তাদের কোন কাজে আসবেনা। সত্যিকার জ্ঞানী আল্লাহ পাকের মা'রেফাত হাসিল করে, তাঁর সান্নিধ্য লাভের পথ ধরে, আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের সাফল্যের জন্যে সাধনায় রত হয়। আর এ পথই বাতলিয়েছেন প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, পবিত্র কোরআনে রয়েছে এ পথ-নির্দেশনা।

فَرِحُوْا بِمَا عِنْدَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ

আলোচ্য আয়াতাংশে যে এলমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো এ জীবনের উন্নতির কোন বিষয়ের জ্ঞান, যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ

'তারা দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে কিছু জানে কিন্তু আখেরাত সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ গাফেল'।

নবী রসূলগণ আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবন সম্পর্কে যে সব বিষয়ে পথ-নির্দেশ করতেন, সে সম্পর্কে কাফেররা ছিল সম্পূর্ণ গাফেল। দুনিয়ার জীবনে পদার্থ, রসায়ন, প্রকৌশল, চিকিৎসা, স্থাপত্য, জীব বিজ্ঞান প্রভৃতির গুরুত্ব আছে, কিন্তু পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনে এর দ্বারা উপকৃত হবার কোন সম্ভাবনা নেই। পবিত্র কোরআন মানব জীবনের সামগ্রিক কল্যাণের পথ-নির্দেশ করে, শুধু এ জীবনের কথা বলেনা, বরং এ জীবন ও পরজীবন সব কিছুর কথাই বলে। যেহেতু এ জীবনেই কর্ম এবং পর জীবনে রয়েছে ফল, তাই যারা এ জীবনে পরকালীন চিরস্থায়ী জীবন সম্পর্কে সাধনা করে তারাই লাভ করবে পর জীবনে সাফল্যের মণি-মানিক্য।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, কাফেররা নবী রসূলগণকে বিদ্রুপ করতো, তাদের আচরণের শাস্তি অবশেষে তাদেরকে অবশ্যই ভোগ করতে হয়। তাই পরবর্তী বাক্যাংশে এরশাদ হয়েছেঃ

وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ

'তারা যা নিয়ে বিদ্রুপ করতো, তাই তাদের উপর পতিত হলো'।

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের আযাব তাদের প্রতি আপতিত হলো।

فَلَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهٖ مُشْرِكِيْنَ

'এরপর যখন তারা আমার আযাব দেখল তখন তারা বললো, আমরা এক আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আনলাম, তার সাথে যাদেরকে শরীক করতাম তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম'।

অর্থাৎ আমরা মূর্তি পূজা বৃক্ষ পূজা প্রভৃতি বর্জন করলাম।

কিন্তু কোন জাতির প্রতি যখন আল্লাহ্ পাকের আযাব আপতিত হয়, তারা স্বচক্ষে আযাব প্রত্যক্ষ করে তখন তাদের ভুল ভাঙে, তারা যাদেরকে এতদিন ডাকত, তারা তখন কোন উপকারেই আসেনা আর এ সময়ের ঈমান দরবারে এলাহীতে গ্রহণযোগ্য হয়না, যেমন ফেরাউন যখন দেখল যে সে আল্লাহর আযাবে পতিত হয়েছে এবং ক্ষণিকের মধ্যে লোহিত সাগরে তার সলিল সমাধি ঘটতে যাচ্ছে, তখন সে বলেছিল, 'আমি ঈমান আনলাম মুসা ও হারুনের (আঃ) প্রতিপালকের প্রতি'। আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে ঘোষণা করা হলো, 'এখন? অথচ ইতিপূর্বে তুই কাফের ছিলি'।

বস্তুতঃ আযাব দেখার পর যে ঈমান আনা হয় তা অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি ঈমান নয়, তাই তা গ্রহণযোগ্য হয়না এমনিভাবে স্বাভাবিক মৃত্যুর পূর্ব মূহুর্তে অর্থাৎ যখন মৃত্যুর ক্রিয়াকলাপ শুরু হয়ে যায় তখনকার তওবা গ্রহণযোগ্য হয়না। পবিত্র কোরআনেই রয়েছে এর ঘোষণাঃ

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ حَتّٰى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّىْ تُبْتُ الْئٰنَ

'আর তাদের জন্যে তওবা নয় যারা মন্দ কাজে লিপ্ত থাকে, যখন মৃত্যু আসে তখন তারা বলে, আমি এখন তওবা করলাম'।

অতএব, তওবার জন্যে সময় নির্দিষ্ট রয়েছে, সময় থাকতে যারা তওবা করে, আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে ফিরে আসে, সে তওবা দরবারে এলাহীতে কবুল হয়।

পক্ষান্তরে, আল্লাহ্ পাকের আযাব দেখার পর যারা তওবা করে তাদের তওবা কবুল হয়না, তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا ط

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের আযাব দেখার পর ঈমান আনা বা তওবা করা তাদের জন্যে উপকারী হয়না। এই সময় ঈমান আনার কোন গুরুত্ব নেই। কেননা ঈমান আনয়নের নিয়ম হলো স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে আল্লাহ্ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِىْ قَدْ خَلَتْ فِىْ عِبَادِهٖ ج وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُوْنَ

এটিই আল্লাহ পাকের চিরাচরিত নিয়ম যা তাঁর বন্দাদের ব্যাপারে প্রচলিত রয়েছে। যারা আল্লাহ পাকের নবী-রসূলগণকে অস্বীকার করেছে, তাঁদের প্রতি বিদ্রুপ করেছে এমনকি, তাঁদের প্রতি নির্যাতন করার দুঃসাহস দেখিয়েছে, অবশেষে তাদের অন্যায় আচরণের পরিণতিতে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আযাব এসেছে। ঐ আযাব দেখে তারা ঈমান এনেছে কিন্তু তাদের সে ঈমান গ্রহণযোগ্য হয়নি, তাই তারা ক্ষতিগ্রস্ত এমনকি, সর্বস্বান্ত হয়েছে। এটি হল চিরাচরিত নিয়ম।

তফসীরকার জুযাজ (রঃ) বলেছেন, কাফেররা সর্বদাই ক্ষতিগ্রস্ত, তবে তাদের ক্ষতিগ্রস্ত হবার অবস্থাটি তখন প্রকাশ পায় যখন তারা আযাব প্রত্যক্ষ করে।[১]

আলহামদুলিল্লাহ! অদ্য ২২-২-৯৬ ইং মোতাবেক ২রা শাওয়াল ১৪১৬ হিঃ তারিখে সূরা আল-মোমেনের তফসীর সমাপ্ত হলো।

১। তফসীরে তাবারী খন্ড-২৪, পৃষ্ঠা-৫৮
তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-২৬৭-৬৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা হা-মীম আস্ সজদা

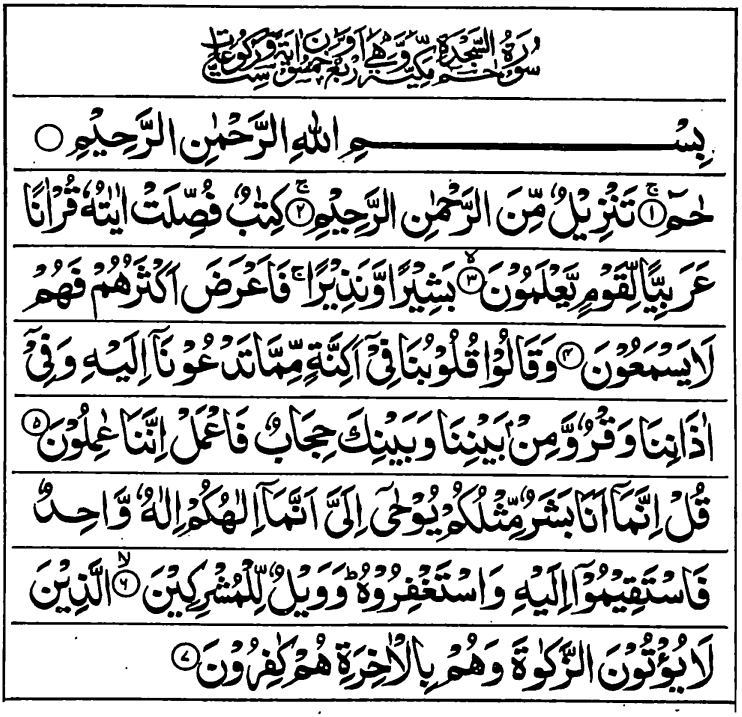
سُوْرَةُ السَّجْدَةِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ اَرْبَعُوْنَ اٰيَةً وَّسِتُّ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

حٰمٓ ① تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ② كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا
عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ③ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۚ فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ
لَا يَسْمَعُوْنَ ④ وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ وَفِيْٓ
اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ ⑤
قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ
فَاسْتَقِيْمُوْٓا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ⑥ الَّذِيْنَ
لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ⑦

পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের নামে আরম্ভ করছি

তরজমা

(১) হা-মীম।

(২) এই বাণী পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ পাকের নিকট থেকে অবতীর্ণ।

(৩) এটি এমন এক গ্রন্থ যার আয়াত সমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে- যা আরবী ভাষায় জ্ঞানী লোকদের জন্যে (উপকারী)।

(৪) সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই বিমুখ হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তারা শ্রবণই করেনা।

(৫) অধিকন্তু তারা বলে, যে কথার প্রতি আপনি আমাদেরকে ডাকেন, আমাদের অন্তর তা থেকে পর্দায় আচ্ছাদিত রয়েছে, আর আমাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং আমাদের ও আপনার মধ্যে রয়েছে আড়াল, অতএব আপনি আপনার কাজ করুন, আমরা আমাদের কাজ করছি।

(৬) (হে রসূল!) আপনি বলুন, আমি তো তোমাদেরই ন্যায় একজন মানুষ, আমার প্রতি এ নির্দেশ আসে যে, তোমাদের মা'বুদ (উপাস্য) একই। অতএব, তোমরা সুদৃঢ়ভাবে তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, আর মুশরেকদের জন্যে রয়েছে ভীষণ দুর্দশা।

(৭) সে সব লোক যারা যাকাত আদায় করেনা এবং যারা আখেরাতে অবিশ্বাসী, তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।

সূরা হা-মীম আস্ সজদা প্রসঙ্গে

এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে, এতে ৬টি রুকু, ৫৪টি আয়াত রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে।

নামকরণ

এ সূরার নাম সূরাতুস সজদা, সূরা হা-মীম সজদা, সূরাতুল মাসাবীহ এবং এ সূরাকে 'সূরা ফুস্সেলাত'ও বলা হয়।

এ সূরার ফজিলত

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক রাত্রে এ সূরা এবং সূরা মূলক পাঠ না করে নিদ্রিত হতেন না।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরা আল মোমেনে তৌহীদ, আল্লাহ পাকের কুদরতের বিভিন্ন নিদর্শন এবং কেয়ামত সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে। আর এ সূরায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালত সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। এর পাশাপাশি মৃত্যুর পর যে জীবন আসবে, সে সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনয়নে অনীহা প্রকাশ করে এবং তাঁর বিরোধিতা করে তাদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

প্রিয়নবী (দঃ)-এর খেদমতে কোরায়েশ প্রতিনিধি

হযরত যাবের এবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদিন কোরায়শ গোত্রের লোকেরা একত্রিত হল এবং এ বিষয়ে পরামর্শক্রমে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলা

ওয়াসাল্লামের প্রতি ইঙ্গিত করে বললো, এ ব্যক্তি আমাদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করেছে এবং আমাদের উপাস্যদেরকে মন্দ বলছে, অতএব তাঁর সাথে কথা বলা দরকার। প্রশ্ন হলো কে তাঁর সঙ্গে কথা বলবে? তখন তাদের মধ্যে ওতবা এবনে রবীয়া ছিল অত্যন্ত বাকপটু, তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কথা বলার জন্যে তাকেই মনোনীত করে প্রেরণ করলো। সে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে বললো, 'হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আপনি উত্তম? না আপনার পিতা আবদুল্লাহ?' হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ প্রশ্নের কোন জবাব দেননি, ওতবা পুনরায় প্রশ্ন করলো, 'আমাকে বলুন, আপনি উত্তম? নাকি আপনার পিতামহ আবদুল মোত্তালিব?' প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবারও নীরবতা পালন করলেন। তখন সে নিজেই বলতে লাগল, যদি আপনি মনে করেন তাঁরা আপনার চেয়ে উত্তম, আপনার নিকট তাঁরা অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তিত্ব, তবে একথাও আপনি জানেন যে, তারা মূর্তি পূজা করতেন, যার বিরুদ্ধে আপনি কথা বলেন। আর যদি মনে করেন আপনি তাঁদের চেয়ে উত্তম তবে আপনি এর ব্যাখ্যা করুন, কি কি কারণে আপনি তাঁদের চেয়ে উত্তম? আমাদের উপাস্যদের শপথ করে বলছি, কোন সম্প্রদায়ে আপনার চেয়ে অধিকতর বিভেদ সৃষ্টিকারী আর কাউকে দেখিনি। আপনি আমাদের ঘরে ঘরে বিভেদ সৃষ্টি করেছেন, আমাদের উপাস্যদেরকে মন্দ বলেছেন, আমাদের ধর্মের সমালোচনা করেছেন, সারা আরবে আমাদেরকে অপমানিত করেছেন, আর একথা আজ সর্বত্র প্রচারিত হয়েছে যে, কোরায়শে একজন যাদুকর, গণক জন্ম গ্রহণ করেছে। আপনি কি সেদিনের অপেক্ষা করছেন যেদিন আমাদের পরস্পরের মধ্যে তরবারী নিয়ে যুদ্ধ শুরু হবে। যদি আপনার অর্থ সম্পদের প্রয়োজন হয় তবে বলুন, আমরা সকলে সমবেত প্রচেষ্টায় অর্থ সম্পদ সংগ্রহ করে আপনাকে সবচেয়ে বড় সম্পদশালী করে দেই। যদি নেতৃত্ব আপনার কাম্য হয় তবে আমরা আপনাকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করতে রাজী, যদি অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা থাকে তাও পূর্ণ করতে প্রস্তুত।

এতক্ষণ কথা বলার পর ওতবা যখন নীরব হলো তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কথা শেষ হয়েছে? সে বললো, জ্বী-হ্যাঁ।

তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পাঠ করে এ সূরা তেলাওয়াত শুরু করলেন। যখন তিনি

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ

পর্যন্ত পৌছলেন তখন সে বললো, ব্যাস, আর নয়, যদি আপনার নিকট এছাড়া আর কোন কথা থাকে তবে বলুন। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ এই কালামই আল্লাহ পাক আমার নিকট নাযিল করেছেন। ওতবা তখন ফিরে এল। কোরায়শ গোত্রীয় লোকেরা তাকে জিজ্ঞাসা করলো, কি করে এলে? সে বললো, তোমরা যা কিছু বলেছিল সবই তাকে শুনিয়ে দিয়েছি, কিন্তু তিনি যা বলেছেন তা আমি বুঝতে পারিনি। তারা বললো, এ-তো বড় বিস্ময়কর কথা, তিনি তো আরবী ভাষায়ই কথা বলেছেন, আর তুমি এ ভাষায় দক্ষ ব্যক্তি, সে বললো আমি শুধু একথা বুঝলাম আদ এবং সামুদ জাতিকে যেভাবে ভয়ংকর চিৎকারে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে, আমি তোমাদেরকে সে আযাব সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করছি।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, কোরায়শের লোকেরা ওতবার সঙ্গে কথা বলে এই মন্তব্য করলো, তুমি যে অবস্থায় সেখানে গিয়েছিলে, তোমার সে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। ওতবা বললো, আল্লাহর শপথ! আমি যে কালাম তাঁর নিকট শ্রবণ করেছি তা কবির কাব্য নয়, গণকের গণনাও নয়, যাদুকরের যাদুও নয়। তোমরা তাঁর মোকাবেলা করা বর্জন কর, যদি আরবের অন্যান্য গোত্রের লোকেরা তাঁকে পরাজিত করতে পারে তবে তা তোমাদের পক্ষে যথেষ্ট হবে, আর যদি তিনিই বিজয়ী হন তবে তাঁর ক্ষমতা তোমাদের ক্ষমতা হবে, তাঁর রাজত্ব হবে তোমাদের রাজত্ব, তাঁর সম্মান হবে তোমাদেরই সম্মান আর পৃথিবীতে তোমরা সর্বাধিক সম্মান, মর্যাদা এবং সৌভাগ্যের অধিকারী হবে। তখন তারা বললো, হে আবদুল ওলীদ (ওতবা)! মনে হয় তিনি তাঁর কথা দিয়ে তোমার প্রতি যাদু করেছেন, ওতবা একথা শ্রবণ করে বললো, তোমাদের যা ইচ্ছা কর।[১]

তফসীরুল কোরআন

হা-মীম, এর অর্থ সম্পর্কে আল্লাহ পাকই সম্যক অবগত রয়েছেন। একে 'হরফে মোকাত্তাআত' বলা হয়। এ সম্পর্কে সূরা বাকারায় আলোচনা করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে এর তিনটি ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে। (১) এটি হলো আল্লাহ পাকের এসমে আজম। (২) এটি শপথের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (৩) হা-মীম আর রহমানের সংক্ষিপ্ত রূপ। অভিধাণ-বেত্তা জুযাজ (রঃ) এ

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৯৬

মতই পোষণ করতেন। আর সায়ীদ এবনে যোবায়ের (রঃ) এবং আতা খোরাসানী (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাকের পবিত্র নাম হাকীম, হামীদ, হাইয়্যুন, হালীম, হান্নান থেকে "হা" গ্রহণ করা হয়েছে, আর আল্লাহ পাকের পবিত্র নাম মালিক, মজিদ এবং মান্নান থেকে মীম গ্রহণ করা হয়েছে তাই হা-মীম হয়েছে।[১]

تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

'মহাগ্রন্থ পবিত্র কোরআন বিশ্ব মানবের কল্যাণার্থে পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে'।

পবিত্র কোরআন এক অপূর্ব জ্ঞান-ভান্ডার। এমন মহা গ্রন্থের অবতারণ আল্লাহ পাকের অফুরন্ত করুণার জ্বলন্ত নিদর্শন ব্যতীত আর কিছুই নয়। অতএব, পবিত্র কোরআনকে মহান আল্লাহ পাকের মহা দান হিসেবেই গ্রহণ করতে হবে এবং এর মহান শিক্ষাকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে বরণ করে নিতে হবে।

كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ

'এটি এমন এক মহাগ্রন্থ, যার আয়াত সমূহ বিষদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যা আরবী ভাষায় (নাযিল হয়েছে), যা জ্ঞানী লোকদের জন্যে (উপকারী)'।

পবিত্র কোরআনের প্রতিটি আয়াত একটি থেকে আরেকটি পৃথক, আর এমনিভাবে মর্মের দিক থেকেও রয়েছে তাতে স্বাতন্ত্র, এর প্রতিটি আয়াতে রয়েছে বহুবিধ জ্ঞানের সন্ধান। পৃথিবীর সর্ব প্রকার জ্ঞানের মূল উৎস হলো পবিত্র কোরআন, এতে আল্লাহ পাকের গুণাবলী, তাঁর পবিত্রতা এবং অনন্ত অসীম কুদরত হেকমতের বিবরণ যেমন রয়েছে, ঠিক তেমনি রয়েছে তাঁর বিস্ময়কর সৃষ্টি-নৈপূণ্যের বর্ণনা, আসমান-জমীন, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা, পাহাড়-পর্বত, জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ, মানব-দানব এক কথায় সমগ্র সৃষ্টি জগতের বিবরণ স্থান পেয়েছে। এর পাশাপাশি এতে রয়েছে ঈমান ও কুফরের বিবরণ, যারা ঈমানদার ও নেককার হবে তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাতের সুসংবাদ এবং জান্নাতের অনন্ত অসীম নেয়ামতের বিবরণ। আর যারা আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হবে তাদের উদ্দেশ্যে দোযখের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ইতোপূর্বে পৃথিবীতে যারা ছিল, তাদের কার্যকলাপ ও পরিণতিও এতে বর্ণিত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে অনেক উপদেশও রয়েছে, চরিত্র মাধুর্য অজর্নের তাগিদ রয়েছে এতে এবং আধ্যাত্মিক সাধনার পথ-নির্দেশ করা হয়েছে। আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হওয়ার পন্থা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং মানব জীবনের

১। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৯৩৫

বিভিন্ন পর্যায়ের জন্যে বিধি-নিষেধ প্রদত্ত হয়েছে। আর এতে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে প্রত্যেকটি বিষয়। আল্লাহ পাকের মহান বাণী পবিত্র কোরআন আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে। কেননা, এর প্রথম শ্রোতা ও পাঠক ছিলেন আরবী ভাষী, তাঁরা এর মর্মবাণী হৃদয়ঙ্গম করেই পৃথিবীর অন্যান্য ভাষা-ভাষীদেরকে তা বোঝাতে পারবেন। যদি আরবী ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় পবিত্র কোরআন নাযিল হতো তবে তারা বুঝতে সক্ষম হতো না।

বস্তুতঃ আরবদের প্রতি এটি আল্লাহ পাকের বিরাট অনুগ্রহ যে, আল্লাহ পাক আরবী ভাষায় পবিত্র কোরআন নাযিল করেছেন, যা পাঠ করা এবং তার মর্ম হৃদয়ঙ্গম করা তাদের জন্যে সহজ।

لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ

জ্ঞানী লোকদের জন্যেই এ গ্রন্থ উপকারী অর্থাৎ পবিত্র কোরআন সমগ্র মানব জাতির হেদায়েতের জন্যেই নাযিল হয়েছে। কিন্তু এর দ্বারা উপকৃত হয় সে সব লোক যাদের জ্ঞান আছে, যারা পরহেযগার, যারা পরিণামদর্শী, যারা নিজেদের ভবিষ্যত চিন্তা করে তারাই এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে।

পক্ষান্তরে যারা নির্বোধ, যারা অপরিণামদর্শী, তারা কোরআনে করীম দ্বারা উপকৃত হয়না; হতে পারেনা। যারা বুদ্ধিমান, যারা বিদ্যোৎসাহী তারা কোরআনে করীমের মর্ম উপলব্ধি করার জন্যে যত্নবান হয়। যারা মূর্খতার অন্ধকারে নিমজ্জমান, যারা জ্ঞানের সাধনায় অনিচ্ছুক, তারা পবিত্র কোরআনের তত্ত্ব জানতেও পারেনা এবং এর দ্বারা উপকৃতও হতে পারেনা।

بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ج

যারা পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের অনুগত তাদের জন্যে পবিত্র কোরআন সুসংবাদ দাতা আর যারা আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ তাদের জন্যে পবিত্র কোরআন ভয় প্রদর্শনকারী।

فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ

'কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই বিমুখ হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তারা শ্রবণই করেনা'।

অর্থাৎ তারা মনযোগ সহকারে আল্লাহ পাকের মহান বাণী পবিত্র কোরআন শ্রবণ করেনা, অথবা এর অর্থ হলো শ্রবণ করে কিন্তু কবুল করেনা। পবিত্র কোরআনের প্রতি তারা উদাসীন থাকে, শ্রবণ করতে চায়না, শুনেও যেন শোনেনা, পবিত্র

কোরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এমন লোকদের উদ্দেশ্যে বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেনঃ

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى.....

(সূরা তোয়াহাঃ ১২৪-২৬)

'আর যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ হবে তার জীবন হবে দুর্বিষহ, আর কেয়ামতের দিন তাকে পুনরুত্থিত করা হবে অন্ধ অবস্থায়। সে বলবে, হে আমার পরওয়ারদেগার! আমি তো দুনিয়াতে চক্ষুষ্মান ছিলাম, আমাকে কেন অন্ধ করে তুলেছ। তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করবেনঃ এভাবেই এসেছিল তোমার কাছে আমার আয়াত সমূহ কিন্তু তা তুমি ভুলে গিয়েছিলে, তেমনি আজ তোমাকেও ভুলে যাওয়া হবে'।

وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِىْٓ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ وَفِىْٓ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ

'অধিকন্তু তারা বলে, যে কথার প্রতি আপনি আমাকে ডাকেন, আমাদের অন্তর তা থেকে পর্দায় আচ্ছাদিত রয়েছে, আর আমাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং আমাদের ও আপনার মাঝে রয়েছে আড়াল। অতএব, আপনি আপনার কাজ করুন, আমরা আমাদের কাজ করছি'।

মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বললো, আপনি যত চেষ্টাই করুন না কেন কোরআন আমাদের মনে রেখাপাত করেনা, কেননা আমাদের মন পর্দায় আচ্ছাদিত রয়েছে, আমাদের কর্ণেও রয়েছে বধিরতা, তাই আমরা কোরআন শ্রবণ করিনা, মূলতঃ আমাদের এবং আপনার মাঝে রয়েছে এক বিরাট আড়াল, তাই আপনি যত চেষ্টাই করুন না কেন, আমাদের অন্তরে তার প্রভাব পড়বেনা, আমাদের ও আপনার মাঝে যে আড়াল বা প্রাচীর রয়েছে তা হলো শত্রুতা এবং বিদ্বেষের প্রাচীর। আর এ আড়াল যতদিন থাকবে, ততদিন আপনার প্রচেষ্টা সফল হবেনা।

فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ

অতএব, আপনি আপনার ধর্ম মোতাবেক কাজ করুন, আমরা আমাদের বিশ্বাস মোতাবেক কাজ করি।

হযরত ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, কোরায়শ গোত্রের কিছু লোক হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা ইসলাম কেন গ্রহণ করনা? তোমরা যদি ইসলাম গ্রহণ কর তবে সারা আরবের নেতৃত্ব তোমাদের হাতেই আসবে, তখন কোরায়শ গোত্রীয় লোকেরা বললো, আমরা আপনার কথা বুঝিনা, আমাদের অন্তর গেলাফে আচ্ছাদিত রয়েছে। আবু জেহেল তখন একটি কাপড় হাতে নিয়ে নিজের এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মধ্যে আড়াল করে নিল আর আলোচ্য আয়াতের বক্তব্যটি প্রকাশ করলো। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, আমি তোমাদেরকে দুটি কথা মেনে নেয়ার আহবান করছি (১) এক আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং তাঁর কোন শরীক নেই। (২) আমি আল্লাহর রসূল।

কাফেররা একথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে প্রস্থান করলো এবং একে অন্যকে বলতে লাগল, সে আমাদের সকল উপাস্য বাদ দিয়ে এক উপাস্যের বন্দেগী করার আহবান জানায়, এরপর একে অন্যকে বলে, চল নিজ নিজ উপাস্যদের পূজা-অর্চনায় সুদৃঢ় থাক। এসব কথা যা ইনি বলছেন ইতোপূর্বে আমরা কখনও শুনিনি, এসব হলো তাঁর মনগড়া কথা। এ নসিহতনামা শুধু কি তাঁর নিকটই অবতীর্ণ হলো? ঠিক ঐ সময়ই আল্লাহ পাকের তরফ থেকে হযরত জীব্রাঈল (আঃ) হাযির হলেন এবং বললেন, হে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আল্লাহ পাক আপনাকে সালাম দিয়েছেন এবং এরশাদ করেছেনঃ কোরায়শ গোত্রের লোকেরা বলে, তারা কোরআন বুঝতে পারেনা, তাদের মন রয়েছে আচ্ছাদিত অবস্থায় আর তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা, তাই তারা কিছুই শুনতে পায়না। যদি তাদের একথা সত্য হতো তবে পবিত্র কোরআন শ্রবণ করা মাত্র তারা কেন পলায়ন করলো? তারা শ্রবণ করে ঠিকই, কিন্তু তা দ্বারা উপকৃত হয়না। এর পরদিন কোরায়শের ৭০ জন লোক হাযির হলো এবং আরজ করলো, হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমাদের নিকট ইসলামের ব্যাখ্যা করুন, আমরা মুসলমান হতে চাই। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট ইসলামকে ব্যাখ্যা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তারা মুসলমান হলো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসলেন এবং এরশাদ করলেনঃ গতকাল তোমরা বলেছিলে, আমার আহবানের ব্যাপারে তোমাদের অন্তর আচ্ছাদিত, আর তোমাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা, আজ তোমরা ইসলাম গ্রহণ করলে, আলহামদুলিল্লাহ! তারা বললো, হে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমরা গতকাল মিথ্যা কথা বলেছিলাম, যদি ঐ কথা সত্য হতো তবে

আজ হেদায়েত আমাদের নসীব হতোনা। আল্লাহ পাক সত্যবাদী, বন্দা মিথ্যুক, আল্লাহ পাক কারো মুখাপেক্ষী নন, আর আমরা সকলে তাঁর দরবারের ফকীর।[১]

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَىَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ

'(হে রসূল!) আপনি বলুন, আমি তো তোমাদেরই ন্যায় একজন মানুষ, আমার প্রতি এ নির্দেশ আসে যে, তোমাদের মা'বুদ (উপাস্য) একই মা'বুদ'।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ পাক এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বিনয়ের শিক্ষা দিয়েছেন এভাবে যে, আপনি বলুন, আমি তো তোমাদের ন্যায় মানুষই, তবে আমার ও তোমাদের মধ্যে পার্থক্য এই, আমার নিকট আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ওহী আসে, যদি আমার নিকট ওহী না আসতো তবে আমার সে এলম থাকত না যা তোমরা এখন দেখতে পাচ্ছ। আমার নিকট এ প্রত্যাদেশ এসেছে যে, তোমাদের সকলের মা'বুদ বা উপাস্য একই, তিনি এক, অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই, তিনিই স্রষ্টা, তিনিই পালনকর্তা, তিনিই রিয্কদাতা, অতএব তোমাদের কর্তব্য হলো তাঁর মহান বাণী শ্রবণ করা এবং তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা।

অথবা "আমি তোমাদেরই ন্যায় মানুষ" একথার অর্থ হলো, আমি ফেরেশতা নই, আমি জ্বীনও নই; বরং আমি তোমাদেরই মত রক্ত মাংসের মানুষ, অতএব আমার কথা বুঝতে তোমাদের কোন অসুবিধা হওয়ার কারণ নেই, যদি আল্লাহ পাক কোন ফেরেশতা বা জ্বীনকে রসূল হিসেবে প্রেরণ করতেন, তাদের কথা বুঝতে তোমাদের অসুবিধা হতো আর আমি তোমাদের ন্যায় মানুষ হলেও আমার যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা হলো, বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাক আমার নিকট তাঁর মহান বাণী প্রেরণ করেন, তিনি আমাকে তাঁর রসূল হিসেবে মনোনীত করেছেন, তাঁর সাথে আমার সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর, অতীব নিবিড়, অতএব যদি তোমরা আমার কথা শুনতে রাজী না হও, আল্লাহ পাকের মহান বাণী মেনে চলতে বিরত থাক, এমনকি আমার সঙ্গে শত্রুতা রাখ তাতে আমার কিছু যায় আসেনা, কেননা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, পরাক্রমশালী, সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকই আমার হেফাজত করছেন, আমি তাঁর তরফ থেকে অর্পিত রেসালতের দায়িত্ব পালন করে যাব, আর তোমাদেরকে সতর্ক করতে থাকব। তাই জেনে রাখ আমাদের সকলের একই মা'বুদ, তিনি অদ্বিতীয়, শুধু তাঁরই বন্দেগী কর, তিনি ব্যতীত আর কোন কিছুর সম্মুখে মাথা নত করোনা।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-২৭০
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৯৬

فَاسْتَقِيْمُوْٓا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ ط

অতএব, তোমরা এক আল্লাহ্ পাকের পথে সুদৃঢ়ভাবে একাগ্র চিত্তে চলতে থাক। তাঁর প্রতিই মনোনিবেশ কর, অন্য সব দিক থেকে বিমুখ হও, এক আল্লাহ্ পাকের বন্দেগীতে যত্নবান হও এবং এতদিন যে শেরক ও অন্যান্য পাপাচারে লিপ্ত ছিলে, সেজন্যে তাঁরই সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা কর, কিন্তু এতদসত্ত্বেও যদি মানবতার কলঙ্ক শেরক বা পৌত্তলিকতায় তোমরা লিপ্ত থাক, এক আল্লাহ্ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে ব্যর্থ হও, তবে মনে রেখ তোমাদের শাস্তি অবধারিত। এরশাদ হয়েছেঃ

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ۞ الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ

'আর মুশরেকদের জন্যে রয়েছে ভীষণ দুর্দশা, সে সব লোক যারা যাকাত আদায় করেনা এবং আখেরাতেও তারা অবিশ্বাসী'।

অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করে, মূর্তি বা অন্য কিছুর পূজা করে, যারা আল্লাহ্ রাহে ব্যয় করেনা, যথা নিয়মে যাকাত আদায় করেনা এবং পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে বিশ্বাস করেনা তাদের কঠিন শাস্তি অবশ্যম্ভাবী, তাদের ধ্বংস অনিবার্য।

অর্থাৎ এমন মুশরেকদের জন্যে কঠোর কঠিন শাস্তি রয়েছে, যারা আল্লাহ্ পাকের সাথে শেরক করে এবং যারা যাকাত আদায় করেনা। আলোচ্য আয়াতের

لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ

এর ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো যারা তৌহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করেনা, কেননা 'যাকাত' শব্দটির আভিধাণিক অর্থ হলো পবিত্রতা অর্জন করা, আর কোন মানুষ যখন তৌহীদে বিশ্বাস করে তখনই সে শেরক বা পৌত্তলিকতার অপবিত্রতা থেকে নিজেকে পবিত্র করে। পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ

(সূরা তওবা-২৮)

'মুশরেকরা তো অপবিত্র', কেননা তাদের মধ্যে রয়েছে শেরকের অপবিত্রতা, আলোচ্য আয়াতে তাই এরশাদ হয়েছেঃ যারা "যাকাত" দেয়না অর্থাৎ যারা নিজেদেরকে শেরক থেকে পবিত্র করেনা। একরামা (রঃ)-ও আলোচ্য আয়াতের এ

ব্যাখ্যাই করেছেন যেমন অন্য আয়াতেও আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ۞ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا

(সূরা শামস-৯-১০)

"সে-ই সফলকাম হবে, যে নিজেকে পবিত্র করবে এবং সে-ই ব্যর্থ হবে যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করবে।"

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ۞ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى

(সূরা আল্ আলা- ১৪-১৫)

'নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে যে পবিত্রতা অর্জন করে এবং তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও নামাজ আদায় করে'।

এ আয়াত সমূহে "যাকাত" শব্দটিকে পবিত্রতা অর্জনের অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে, আর সবচেয়ে মন্দ বিষয় হলো পৃথিবীতে আল্লাহ্ পাকের সাথে শেরক করা। অতএব, আলোচ্য আয়াতে "তারা যাকাত দেয়না" এর অর্থ হলো, তারা তৌহীদে বিশ্বাস করেনা।

"যাকাত" শব্দটির আভিধাণিক অর্থই গ্রহণ করেছেন হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং একরামা (রঃ), হাকেম তিরমিজী (রঃ) প্রমুখ তফসীরকারগণ। আর শরীয়তের পরিভাষায় যাকাতের যে অর্থ রয়েছে তা গ্রহণ করেছেন তফসীরকার হাসান এবং কাতাদা (রঃ)। তারা বলেছেন, "তারা যাকাত আদায় করেনা" এর তাৎপর্য হলো, যাকাত যে প্রত্যেক সম্পদশালী ব্যক্তির উপর অবশ্য কর্তব্য বা ফরজ একথায় তারা বিশ্বাস করেনা।

যাহ্যাক (রঃ) এবং মোকাতেল (রঃ) এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, তারা আল্লাহ্ পাকের আনুগত্যে এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অর্থ সম্পদ ব্যয় করেনা। আর মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো তারা নিজেদের আমলকে পবিত্র করেনা।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, যাকাত হলো সেতু স্বরূপ, যারা এ সেতু পার হয় তারাই নাজাত পায়। আর যারা এ সেতু পার হয়না তথা যাকাত আদায় করেনা তারা ধ্বংস হয়।

"যাকাত" শব্দটির আভিধাণিক বা পরিভাষাগত অর্থ যা-ই গ্রহণ করা হোক না কেন মুশরেকরা যে যাকাত দেয়না তার কারণ হলো, তারা আখেরাতে বিশ্বাসই করেনা, আর যে আখেরাতে বিশ্বাস করেনা সে নিজের আমলকেও পবিত্র করেনা এবং আল্লাহর রাহে দান-খয়রাতও করেনা।

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই, প্রথমে বলা হয়েছে যারা আল্লাহর সাথে শেরক করে এবং পরে বলা হয়েছে যারা আখেরাতে বিশ্বাস করেনা এবং এ দু'য়ের মধ্যস্থলে বলা হয়েছে যারা যাকাত দেয়না, এর দ্বারা যাকাত আদায়ের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ অর্থ-সম্পদের প্রতি মানুষের মনের আকর্ষণ থাকে অধিকতর, যারা এক আল্লাহ্ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আখেরাতে আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে হাযির হতে হবে বলে জানে, তারা নিজেকে শেরক সহ যাবতীয় পাপাচার থেকে পবিত্র রাখে এবং অর্থ-সম্পদের যাকাতও আদায় করে।[১]

إِنَّ الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٨﴾ قُلْ أَئِنَّكُمْ
لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ
أَندَادًا ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٩﴾ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا
وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً
لِّلسَّائِلِينَ ﴿١٠﴾ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ
لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿١١﴾

তরজমা

(৮) নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে, তাদের জন্যে এমন পুরস্কার রয়েছে যা কখনও শেষ হবার নয়।

(৯) (হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমরা কি তাঁকেই অস্বীকার করতে চাও, যিনি মাত্র দু'দিনে পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন, আর তোমরা অন্যকে তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে চাও? তিনিই তো বিশ্ব প্রতিপালক।

১। তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা-৪০১
তফসীরে তাবারী খন্ড-২৪, পৃষ্ঠা-৬০
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৪, পৃষ্ঠা-৯৮
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৯৬
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৪ পৃষ্ঠা-৬৪

(১০) তিনিই স্থাপন করেছেন পৃথিবীর উপর অটল পর্বতমালা এবং তাতে রেখেছেন বরকত, আর চারদিনে তার অধিবাসীদের জন্যে খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন, এটি জিজ্ঞাসাকারীদের জন্যে পূর্ণ বর্ণনা।

(১১) এরপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করেন, আর তা ছিল ধোঁয়ার ন্যায়, তাকে এবং জমীনকে আদেশ দিলেন, তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়, তারা উভয়ে আরজ করলো, আমরা হাযির হলাম অনুগত হয়ে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফের মুশরেকদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ আয়াতে নেককার মোমেনদের পুরস্কারের উল্লেখ রয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ

নেককারদের জন্যে পুরস্কারের ঘোষণা

নিশ্চয় যারা আল্লাহ পাকের প্রতি, তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি ও আল্লাহ পাকের মহান বাণী পবিত্র কোরআনের প্রতি ঈমান আনে আর সে ঈমান মোতাবেক সৎ কাজ করে তাদের জন্যে রয়েছে অবর্ণনীয় পুরস্কার, যার কোন সীমা নেই যা কখনও শেষ হবেনা।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) আলোচ্য আয়াতের غير ممنون কথাটির ব্যাখ্যা করেছেন, তাদেরকে এমন পুরস্কার দেয়া হবে যা কখনও শেষ হবে না। আর তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) এর ব্যাখ্যা করেছেনঃ ঈমানদার ও নেককার বন্দাদেরকে পরিপূর্ণ পুরস্কার প্রদান করা হবে। আর মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, নেককার মোমেনদেরকে অগণিত এবং অফুরন্ত নেয়ামত প্রদান করা হবে।

সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, অসুস্থ, বৃদ্ধ লোকেরা যখন সুস্থ অবস্থার মত এবং যৌবনের ন্যায় এবাদত করতে পারেনা, তাদের সম্পর্কেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে। যৌবনে তারা যে এবাদত করতো এবং সুস্থ অবস্থায় যেভাবে আল্লাহর বন্দেগী করতো, দুর্বল এবং অসুস্থ অবস্থায় তেমনি এবাদত করতে পারেনা তাদের জন্যে আল্লাহ পাকের আদেশ হলো, যেভাবে ইতোপূর্বে এবাদত করতো এবং যেভাবে তাদের সওয়াব লিপিবদ্ধ হতো এখন অপারগ অবস্থায়ও সেভাবে সওয়াব লিপিবদ্ধ হবে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ বন্দা যখন ভালভাবে এবাদত করে, এরপর অসুস্থ হয়ে

পড়ে, তখন আমল লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাদেরকে আদেশ দেয়া হয় যে, এ বন্দার সে আমলই লিপিবদ্ধ করা যা সুস্থ অবস্থায় সে করতো। এ আদেশ ততদিনের জন্যে যতদিন আল্লাহ পাক তাকে রোগ থেকে মুক্ত করেন। (বগভী)

হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কোন মুসলমান যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন আল্লাহ পাক ফেরেশতাকে আদেশ দান করেন, এ বন্দার জন্যে সে নেক আমল লিপিবদ্ধ কর, যা সে সুস্থ অবস্থায় করতো। যদি আল্লাহ পাক তাকে আরোগ্য দান করেন, তবে তার অসুস্থ হওয়ার কারণে তার গুনাহ দূরীভূত করে দেন এবং তাকে পবিত্র করেন। আর যদি তার এন্তেকাল হয়ে যায় তবে তাকে মাগফেরাত দান করেন এবং স্বীয় রহমত দ্বারা তাকে ধন্য করেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, অসুস্থ অবস্থায় বন্দার জন্যে সে সওয়াব লিপিবদ্ধ হয়, যা অসুস্থ হওয়ার পূর্বে তার আমলের জন্যে লিপিবদ্ধ হতো।[১]

قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗٓ اَنْدَادًا ۭ ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ

'(হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমরা কি তাঁকেই অস্বীকার করতে চাও, যিনি মাত্র দু'দিনে সমগ্র পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন, আর তোমরা অন্যকে তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে চাও? তিনিই তো বিশ্ব প্রতিপালক'।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে পবিত্র কোরআনের সত্যতার ঘোষণা ছিল, এর পাশাপাশি প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছিল, এ দু'টি কথা ভূমিকা স্বরূপ বর্ণনার পর এ আয়াত থেকে বিস্তারিত ভাবে বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরত হেকমত এবং তাঁর সৃষ্টি-নৈপুণ্যের কথা এরশাদ হয়েছে। এসব কিছুর মধ্যে রয়েছে তৌহীদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

মূলতঃ বিশ্ব-সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরত হেকমত এবং তাঁর অসীম ক্ষমতা ও তাঁর তৌহীদের অসংখ্য প্রমাণ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-২৭২-৭৩

লক্ষ্য করা যায়। আর এ বর্ণনা শুরু করা হয়েছে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ভাষায় এবং বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে এ বিষয়ের উপর যে, যিনি এ বিশাল বিস্তৃত পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে তোমরা কিভাবে অস্বীকার কর? অর্থাৎ তোমাদের পক্ষে বিশ্ব স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাককে অস্বীকার করা কিভাবে সম্ভব হয়? তাঁর সৃষ্ট পৃথিবীতেই তোমরা বাস কর, তাঁর অসংখ্য নেয়ামত সর্বদা ভোগ কর, তাঁর সৃষ্ট নীলাকাশের নীচেই সর্বদা থাক, তারপরও তোমরা তাঁকে অস্বীকার কর কিভাবে? তাই এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ خَلَقَ الْاَرْضَ

পূর্ববর্তী একখানি আয়াতে আদেশ ছিলঃ

فَاسْتَقِيْمُوْٓا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ

"তোমরা সুদৃঢ়ভাবে একাগ্র চিত্তে আল্লাহ পাকের পথ অবলম্বন কর এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর"। তখন যেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের মহান দরবারে এ আরজী পেশ করলেন, হে আল্লাহ! যদি এ কাফেররা তোমার পথ অবলম্বন না করে এবং তোমার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী না হয় তবে আমি তাদেরকে কি বলবো? একথার জবাবেই আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেনঃ

قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ خَلَقَ الْاَرْضَ

(হে রসূল!) তাহলে আপনি বলুন, তোমরা কি সেই মহান প্রতিপালক আল্লাহ পাককে অস্বীকার করছো? যিনি মাত্র দু' দিনে এ বিশাল পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আর তোমরা কি তাঁর সাথে শরীক করছো? যিনি বিশ্ব প্রতিপালক, যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, যিনি সর্বশক্তিমান তাঁকে অস্বীকার করার ধৃষ্টতা তোমরা দেখাও আর অক্ষম, অপদার্থ মূর্তিগুলোকে তাঁর সমকক্ষ মনে কর? এর চেয়ে বড় মূর্খতা এবং অন্যায় কিছুই হতে পারেনা। মাত্র দু' দিনে এ বিশাল পৃথিবী সৃষ্টি করা শুধু এক আল্লাহ পাকের পক্ষেই সম্ভব, আর এ দু' দিন হলো রোববার এবং সোমবার।

وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَآ اَقْوَاتَهَا فِىْٓ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ ط

'তিনিই স্থাপন করেছেন পৃথিবীর উপর অটল পর্বতমালা, এবং তাতে রেখেছেন বরকত, আর চারদিনে পৃথিবীর অধিবাসদের জন্যে ব্যবস্থা করেছেন খাদ্যের'।

অর্থাৎ হে আত্মবিস্মৃত মানব জাতি! তোমরা লক্ষ্য কর কিভাবে আল্লাহ পাক আকাশচুম্বি পর্বতমালাকে পৃথিবীর উপর বসিয়ে দিয়েছেন এবং পানির উপর স্থাপিত এ পৃথিবীকে স্থবির করেছেন। বিশ্ববাসীর জন্যে তাতে রেখে দিয়েছেন বরকত, খাদ্য-দ্রব্য, ফলমূল, গাছ-পালা, খনিজ পদার্থ, আহার্য ও পানীয় সবকিছু পৃথিবীতে রেখে দিয়েছেন। সমগ্র বিশ্ববাসী তা দ্বারা তাদের প্রয়োজনের আয়োজন করে, এসব কিছুই কি তোমাদের বন্ধ চক্ষুকে উন্মীলিত করার জন্যে যথেষ্ট নয়?

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, পরম করুণাময় আল্লাহ পাক পৃথিবীতে মানব জাতি এবং চতুঃষ্পদ জন্তুগুলোর জন্যে আহার্য ও পানীয় রেখে দিয়েছেন, যার জন্যে যেখানে যা প্রয়োজন তার ব্যবস্থা করে রেখেছেন তিনি।

তফসীরকার একরামা এবং যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, কোন কোন এলাকায় এমন কিছু রেখেছেন, যা অন্য এলাকায় নেই যাতে করে এসব জিনিসের আমদানী রপ্তানীর ব্যবসা করে মানুষ তার জীবিকা সংগ্রহ করতে পারে।

কালবী (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক দয়া করে একেক এলাকার জন্যে একেক প্রকার বিশেষ খাদ্য দান করেছেন। এটি তাঁর অনন্ত অসীম করুণা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

فِيْٓ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ

অর্থাৎ আরো দু'দিনে পৃথিবীতে এসব কিছু রেখেছেন, এভাবে চারদিনে পৃথিবীর সব কিছু আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন। আর এ দু' দিন হলো মঙ্গলবার ও বুধবার।

এখানে উল্লেখ্য, আসমান জমীন সৃষ্টির সময় দিন রাতের কোন হিসাব ছিলনা, তাই তফসীরকারগণ বলেছেন, দু' দিন ও চার দিনের যে উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো দু'দিন এবং চার দিনের সমপরিমাণ সময় ব্যয় করা হয়েছে পৃথিবী এবং তার সব কিছুর সৃষ্টিতে। এ পর্যায়ে আরো উল্লেখ্য, আলোচ্য আয়াতে যে দিনের কথা বলা হয়েছে তা আমাদের পরিচিত দিন নয়; বরং আল্লাহ পাকের নিকট যে দিনের হিসাব রয়েছে সেদিনই এর দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে।[১]

سَوَآءً

১। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-৬১৯

অর্থাৎ জমীন এবং জমীনের আনুষাঙ্গিক যা কিছু রয়েছে তা সৃষ্টিতে সর্বমোট চারদিন ব্যয় হয়েছে।

لِّلسَّآئِلِيْنَ

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো যদি কেউ এ প্রশ্ন করে যে, জমীন এবং তার অভ্যন্তরে যা কিছু রয়েছে তার সৃষ্টিতে কত সময় ব্যয় হয়েছে? এটিই তার সম্পূর্ণ জবাব।

ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْكَرْهًا

'এরপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করেন, আর তা ছিল ধোঁয়ার ন্যায়, এরপর তিনি আসমান এবং জমীনকে আদেশ দিলেন, তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়'।

চারদিনের সমপরিমাণ সময়ে জমীন আর তার অভ্যন্তরীণ বস্তু সমূহ সৃষ্টি করার পর আল্লাহ পাক আসমান সৃষ্টির দিকে মনোনিবেশ করলেন, আর তা ছিল তখন ধোঁয়ার ন্যায়। আল্লাহ পাক তাকে সাতভাগে বিভক্ত করে সাতটি আসমানে রূপান্তরিত করেন।

دخان অর্থাৎ ধোঁয়া।

এ পর্যায়ে এ শব্দটি দ্বারা আসমান সৃষ্টির ধাতু উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এসব কিছু আল্লাহ পাকের ইচ্ছা এবং মর্জিরই বহিঃপ্রকাশ, কেননা আল্লাহ পাক যখন যা ইচ্ছা করেন তাই কার্যকর হয়।

فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْكَرْهًا

এরপর তিনি আসমান এবং জমীনকে আদেশ দিলেন, তোমরা উভয়ে আস, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক আসমানকে হুকুম দিয়েছেন, তুমি সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজিকে উদিত কর, আর জমীনকে আদেশ দিয়েছেন নদ-নদী প্রবাহিত করো, বৃক্ষ-তরুলতা ফল-ফসল উৎপন্ন কর, এভাবে, সূর্যের কিরণ দেখা দিল, বায়ু প্রবাহিত হলো, সমুদ্র থেকে বাষ্প উত্থিত হলো, ফলে বৃষ্টিপাত হলো, তার ফলশ্রুতিতে জমীনে রকমারী ফল-ফসল উৎপন্ন হলো। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

قَالَتَآ اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ

'তারা উভয়ে আরজ করলো, আমরা হাযির হলাম অনুগত হয়ে'।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, আল্লাহ্ পাক জমীন আসমানকে আদেশ দিয়েছেন এবং তাদেরকে জবাব দেয়ার ক্ষমতাও দান করেছেন। আর একথাও বর্ণিত আছে যে, জমীনের সে অংশটিই আল্লাহ্ পাকের কথার জবাব দিয়েছে যেখানে কা'বা শরীফ নির্মাণ করা হয়েছে, আর আসমানের সে অংশটি কথা বলেছে যা কাবা শরীফের ঠিক উপরে রয়েছে (আল্লাহ্ পাকই সর্বাধিক জ্ঞানী)।[১]

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, আসমান জমীন যদি অনুগত না হতো তবে তাদের শাস্তি হতো।

যাহোক, পরবর্তী দু'দিনে অর্থাৎ বৃহস্পতি এবং শুক্রবারে সপ্ত আসমান সৃষ্টি করা হলো এবং প্রত্যেক আসমানে যা কিছু রাখার তা রাখা হয়েছে, যেখানে যে ফেরেশতা নিযুক্ত করার কথা সেখানে তা করা হয়েছে। জমীনের নিকটবর্তী আসমানকে নক্ষত্রপুঞ্জ দ্বারা সুশোভিত করা হয়েছে যা বিশ্ববাসী আলোয় ঝলমল দেখতে পায়। এসব ব্যবস্থা সেই আল্লাহ্ পাকের, যিনি পরাক্রমশালী, যিনি সমগ্র বিশ্বের সব কিছু সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

এবনে জরীরের বর্ণনায় রয়েছে, ইহুদীরা আসমান জমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তখন তিনি এরশাদ করেনঃ রবিবার ও সোমবার আল্লাহ্ পাক জমীনকে সৃষ্টি করেছেন, মঙ্গলবার সৃষ্টি করেছেন পাহাড় সমূহ এবং তাতে যা কিছু রয়েছে। আর বুধবার বৃক্ষরাজি, পানি আর যেসব স্থান আবাদ হবে, আর যে সব বিরাণ থাকবে। এভাবে চারদিন ব্যয় হয়েছে, এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেছেন। এরপর এরশাদ করেন, বৃহস্পতিবার দিন তিনি আসমান সৃষ্টি করেছেন, শুক্রবার দিন তিনি চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্রপুঞ্জ সৃষ্টি করেছেন এবং ফেরেশতাদেরকেও এদিনই সৃষ্টি করেছেন আর ঐ জুমআর দিনেই বিকেল বেলা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে জান্নাতে আবাদ করেছেন, আর তাঁকে সেজদা করার জন্যে ইবলিসকে আদেশ দিয়েছেন, আর জুমআর দিনের শেষ পর্যায়ে আদম (আঃ)-কে জান্নাত থেকে বের করেছেন।

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৪ পৃষ্ঠা-৬৭

ইহুদীরা এসব কথা শুনে বললো, এরপর কি হয়েছে? তিনি এরশাদ করলেনঃ এরপর আল্লাহ পাক মহান আরশে অধিষ্ঠান গ্রহণ করেছেন।[১]

তখন ইহুদীরা বললো, আপনি সবই ঠিক বলেছেন তবে শেষ কথাটি বলেননি তা হলো "এরপর তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করেছেন"। ইহুদীদের একথা শ্রবণ করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন, তখন এ আয়াত নাযিল হয়ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ ۞ فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ.....

(সূরা ক্বাফ আয়াতঃ ৩৮-৩৯)

নিশ্চয় আমি আসমান জমীন ও তন্মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবই সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে, আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করেনি, অতএব (হে রসূল!) তারা যা বলে, সে সম্পর্কে আপনি সবর অবলম্বন করুন।[২]

فَقَضٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِىْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِىْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا
وَزَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ ۖ وَحِفْظًا ۚ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ
الْعَلِيْمِ ﴿١٢﴾ فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ
عَادٍ وَّثَمُوْدَ ﴿١٣﴾ اِذْ جَآءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ
خَلْفِهِمْ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ۭ قَالُوْا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً
فَاِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿١٤﴾ فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى
الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۭ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ
الَّذِىْ خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۭ وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿١٥﴾

১। এ সম্পর্কে আরো জানতে হরে দেখুন, তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-১, পৃষ্ঠা-২৫৪-৫৫
২। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৪ পৃষ্ঠা-৬৭-৬৮
তফসীরে তাবারী খন্ড-২৪, পৃষ্ঠা-৬১
তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৯৭

তরজমা

(১২) এরপর তিনি দু'দিনে আকাশ মন্ডলকে সাত আসমানে পরিণত করলেন। এবং প্রত্যেক আসমানেই তাঁর হুকুম প্রেরণ করলেন, আর আমি দুনিয়ার নিকটতম আসমানকে প্রদীপ দ্বারা সুশোভিত করলাম, আর সুরক্ষিতও করলাম, আর এ ব্যবস্থাপনা হলো পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী আল্লাহ্ পাকের।

(১৩) (হে রসূল!) যদি তবুও তারা (সত্য গ্রহণে) বিমুখ হয় তবে আপনি বলুন, আমি তোমাদেরকে আদ ও সামুদ জাতির আযাবের ন্যায় আযাব সম্বন্ধে সতর্ক করছি।

(১৪) তাদের নিকট যখন তাদের সম্মুখ এবং পশ্চাত-এক কথায় সব দিক থেকে নবী রসূলগণ এ নির্দেশ নিয়ে আসেন যে, "তোমরা আল্লাহ্ পাক ব্যতীত আর কারো বন্দেগী করোনা", তারা বলেছিল যদি আমাদের প্রতিপালক এমন ইচ্ছা করতেন, তবে তিনি অবশ্যই ফেরেশতা প্রেরণ করতেন। অতএব, তোমরা যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছ আমরা তা মানিনা।

(১৫) আর আদ জাতির ব্যাপার এই যে, তারা অযথা পৃথিবীতে বড়াই করতো এবং বলতো, আমাদের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী কে? তবে কি তারা লক্ষ্য করেনা যে নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী, আর তারা আমার নিদর্শন সমূহকে অস্বীকার করতো।

তফসীরুল কোরআন

فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِىْ يَوْمَيْنِ

'এরপর তিনি দু'দিনে আকাশমন্ডলকে সাত আসমানে পরিণত করলেন'।

ইতোপূর্বে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাক পৃথিবীকে দু'দিনে আর পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে তা সৃষ্টি করেছেন আরো দু'দিনে। এভাবে চার দিনে পৃথিবী ও তার সব কিছু সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ জমীনের উপর পর্বতমালা স্থাপন করে তাকে করেছেন স্থবির, নদ-নদী, সাগর-মহাসাগর, বৃক্ষ-তরুলতা, ফল-ফসল উৎপন্ন করেছেন, জমীনের অভ্যন্তরে খনিজ দ্রব্য সহ বহুবিধ নেয়ামত রেখে দিয়েছেন মানব জাতির উপকারার্থে, এভাবে মোট চারদিন ব্যয় হয়েছে। এরপর আল্লাহ্ পাক আসমানের দিকে মনোনিবেশ করেছেন, সপ্ত আসমান সৃষ্টি করেছেন, দুনিয়ার নিকটতম আসমানকে চন্দ্র সূর্য ও নক্ষত্রপুঞ্জ দ্বারা সুশোভিত করেছেন এবং আসমান ও তার আনুষাংঙ্গিক বিষয় সৃষ্টিতে দু' দিন ব্যয় করেছেন।

আসমান জমীন সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোন্‌টি আগে এবং কোন্‌টি পরে এ প্রশ্নটির জবাব রয়েছে আলোচ্য আয়াতে, কেননা পূর্ববর্তী আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছেঃ

ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَآءِ

এরপর অর্থাৎ জমীন সৃষ্টির পর আসমানের দিকে মনোনিবেশ করেছেন, আর আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে,

فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِىْ يَوْمَيْنِ

'এরপর তিনি দু'দিন আকাশমন্ডলকে সাত আসমানে পরিণত করেছেন'।

আর সূরা বাকারায়ও এভাবেই ঘোষণা করা হয়েছেঃ

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ

'তিনিই আল্লাহ পাক, যিনি পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের উপকারার্থে সৃষ্টি করেছেন, এরপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করেছেন। এরপর তাকে সাত আসমান রূপে তৈরী করেছেন'।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাক জমীনকে পূর্বে এবং আসমানকে পরে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু সূরা "ওয়ান নাজেআতে" রয়েছে,

وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا (এবং পৃথিবীকে এরপর বিস্তৃত করেছেন)

যার দ্বারা বোঝা যায় যে, জমীনকে আসমানের পর সৃষ্টি করেছেন। এজন্যে তফসীরকারগণ এর ব্যাখ্যা করেছেন। এ পর্যায়ে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যা হাকেম এবং বায়হাকী সায়ীদ এবনে যোবায়ের (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এর নিকট হাযির হয়ে বললো, আমি পবিত্র কোরআনের দু'টি আয়াত সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, তিনি বললেন, বল, তখন সে আলোচ্য আয়াত এবং সূরা ওয়ান নাজেআতের আয়াতটির উল্লেখ করলো। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন, প্রকৃত অবস্থা এই যে, আল্লাহ পাক প্রথমে জমীন সৃষ্টি করেন, এরপর আসমান সৃষ্টি করেছেন, আর "সূরা ওয়ান নাজেআতের" আয়াতের অর্থ হলো, আল্লাহ পাক জমীনের উপর পাহাড় সৃষ্টি করেছেন, নদ-নদী,

সাগর-মহাসাগর প্রবাহিত করেছেন, বৃক্ষ-তরুলতা উৎপন্ন করেছেন, অর্থাৎ دحاها শব্দটির অর্থ জমীন সৃষ্টি নয়; বরং জমীনের মধ্যে যা কিছু আছে সে সবের ব্যবস্থা করা।

আল্লামা ওসমানী (রঃ) লিখেছেন, পবিত্র কোরআনে যখনই নেয়ামতের আলোচনা করা হয়েছে তখন পৃথিবীর কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে, আর যখন আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরত হেকমতের আলোচনা করা হয়েছে তখন আসমানের কথা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। অতএব, এ বিষয়ে আর কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকেনা।

আল্লামা আলুসী (রঃ) এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন (এ ব্যাপারে আল্লাহ পাকই সর্বাধিক অবগত)।[১]

وَاَوْحٰى فِىْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا

এ পৃথিবীতে যেমন অগণিত প্রকার সৃষ্টি একই সঙ্গে বসবাস করছে, তেমনি প্রত্যেক আসমানেও আল্লাহ পাকের অনেক সৃষ্টি রয়েছে আর আসমানের অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে তাদের অবস্থা অনুযায়ী তিনি নির্দেশ প্রেরণ করেছেন।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) এবং সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ পাক আসমানে চন্দ্র-সূর্য এবং নক্ষত্রপুঞ্জ সৃষ্টি করেছেন।

মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ পাক প্রত্যেক আসমানের প্রতি তাঁর বিধি-নিষেধ জারী করেছেন।

আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হলো প্রত্যেক আসমানের অধিবাসীদেরকে আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের আদেশ দিয়েছেন।

وَزَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَحِفْظًا ط ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ

'আর আমি দুনিয়ার নিকটতম আসমানকে প্রদীপ দ্বারা সুশোভিত করলাম, আর সুরক্ষিতও করলাম। আর এ ব্যবস্থাপনা হলো পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী আল্লাহ পাকের'।

আল্লাহ পাক অগণিত নক্ষত্রপুঞ্জ দ্বারা দুনিয়ার নিকটবর্তী নীলাভ আকাশের সৌন্দর্য বর্ধন করেছেন, শুধু তাই নয়; বরং আকাশের এ সুন্দর চাঁদোয়াকে সুরক্ষিতও

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৪, পৃষ্ঠা-১০৬-০৭
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত আল্লামা কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৬ পৃষ্ঠা-১৭৫-৭৬
ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-৬১৯

করেছেন, তা ভেঙ্গে পড়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এমনকি, ফাটল ধরারও কোন ভয় নেই। শয়তানেরা কোন কথা যেন চুরি করে শুনতে না পারে, তার সুদৃঢ় ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে তাতে। মহা পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী আল্লাহ পাকের ব্যবস্থাপনাতেই এসব কিছু হয়েছে, তাই এতে হস্তক্ষেপ করার শক্তি-সাহস কারোই নেই।

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ

'(হে রসূল!) যদি তবুও তারা (সত্য গ্রহণে) বিমুখ হয় তবে আপনি বলুন, আমি তোমাদেরকে আদ ও সামুদ জাতির আযাবের ন্যায় আযাব সম্পর্কে সতর্ক করছি'।

আল্লাহ পাকের অফুরন্ত নেয়ামত, কুদরত এবং অনন্ত করুণার নিদর্শন সমূহ দেখার পরও যদি মক্কার কাফেররা ইসলাম গ্রহণে প্রস্তুত না হয়, তবে (হে রসূল!) আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন যে, আদ এবং সামুদ জাতি আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হয়ে যেভাবে আযাব ভোগ করেছে এবং নিশ্চিহ্ন হয়েছে, ঠিক তেমনি আযাব সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে সতর্ক করছি। আদ ও সামুদ জাতি আল্লাহ পাকের নাফরমানী করেছিল, হযরত হুদ (আঃ) প্রেরিত হয়েছিলেন আদ জাতির নিকট, এমনিভাবে সামুদ জাতির হেদায়েতের জন্যে প্রেরিত হয়েছিলেন হযরত সালেহ (আঃ), কিন্তু আদ ও সামুদ জাতি নবীগণের আহবানে সাড়া দেয়ার স্থলে তাঁদের বিরোধিতা করে, সত্যদ্রোহীতার অপরাধে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হয়। হে মক্কাবাসী! যদি তোমরাও আল্লাহ পাকের নাফরমানী কর, তাঁর রসূলের বিরোধিতা কর তবে কোপগ্রস্ত আদ ও সামুদ জাতির ভয়াবহ পরিণতি তোমাদেরও হতে পারে।

اِذْ جَآءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ؕ قَالُوْا لَوْشَآءَ رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً فَاِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ

'তাদের নিকট যখন তাদের সম্মুখ এবং পশ্চাত-এক কথায় সব দিক থেকে নবী রসূলগণ এ নির্দেশ নিয়ে আসেন যে, তোমরা আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কারো বন্দেগী করোনা, তারা বলেছিল, যদি আমাদের প্রতিপালক এমন ইচ্ছা করতেন তবে তিনি অবশ্যই ফেরেশতা প্রেরণ করতেন। অতএব, তোমরা যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছ আমরা তা মানিনা'।

আলোচ্য আয়াতের مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ (সম্মুখ পশ্চাৎ থেকে) কথার তাৎপর্য হলো, নবী রসূলগণ মানুষকে সত্য গ্রহণের আহবানের পাশাপাশি অতীতে ।রা এ আহবান প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের যে শাস্তি হয়েছে তা বর্ণনা করেছেন এবং

ভবিষ্যতে তথা আখেরাতে তাদের কি শাস্তি হবে তারও উল্লেখ করেছেন।

অথবা এর অর্থ হলো, নবী রসূলগণ তাদের অতীত এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে উত্তমভাবে তাদেরকে জ্ঞান দান করেছেন।

অথবা এর অর্থ হলো, নবী রসূলগণ সর্বদিক থেকে তাদের নিকট আগমন করেছেন এবং তাদের হেদায়েতের জন্যে সম্ভাব্য সকল পন্থাই অবলম্বন করেছেন।

قَالُوْا لَوْشَآءَ رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً فَاِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ

কাফেররা বললো, যদি আল্লাহ পাক রসূল প্রেরণের ইচ্ছা করতেন তবে অবশ্যই কোন ফেরেশতা প্রেরণ করতেন, মানুষ কি করে আল্লাহর রসূল হবে? অতএব, রেসালতের দাবীকে আমরা সত্য মনে করিনা এবং আপনাদের বর্ণিত বিষয়গুলোও আমরা মানিনা। এভাবে আদ ও সামুদ জাতির দূরাত্মা কাফেররা হযরত হুদ (আঃ) এবং হযরত সালেহ (আঃ)-কে নবী হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা বলে, আপনারা আমাদেরই ন্যায় মানুষ, মানুষ হিসেবে সকলেই সমান, আপনাদেরকে আল্লাহর রসূল হিসেবে মেনে নেয়ার কোন যুক্তি আছে বলে আমরা মনে করিনা। এরপরই আদ ও সামুদ জাতির প্রতি আসমানী আযাব আপতিত হয় এবং তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করা হয়।

হতভাগা আদ ও সামুদ জাতির এ ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে মক্কার কাফেরদেরকে সতর্ক করা হয়েছে এ মর্মে যে, যদি তোমরা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীকে না মান তবে তোমাদের শাস্তিও অবধারিত।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা

এ আয়াতে রয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বিশেষ সান্ত্বনা, এ মর্মে যে, (হে রসূল!) মক্কার কাফেররা যদি আপনাকে অবিশ্বাস করে তবে তাতে দুঃখিত হবার কোন কারণ নেই, কেননা ইতিপূর্বে যখনই কোন নবী রসূল এসেছেন, তখনই কাফেররা তাঁদের সঙ্গে এমন আচরণই করেছে যা মক্কার কাফেররা আপনার সাথে করছে। আর আদ ও সামুদ জাতি এমন ধ্বংসাত্মক আচরণ করেই ধ্বংস হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে আদ জাতির অন্যায় অনাচার, দম্ভ-অহংকার এবং তাদের শাস্তির কথা বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে।

فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً

আর আদ জাতির ব্যাপার এই যে, তারা অযথা পৃথিবীতে বড়াই করতো এবং বলতো, আমাদের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী কে?

আদ জাতির লোকেরা দৈহিক শক্তির অধিকারী ছিল, তারা পাহাড়ের বড় বড় পাথরকে উঠিয়ে যেখানে ইচ্ছা সেখানে নিয়ে যেত, তাদের দৈহিক শক্তির দম্ভ ছিল অনেক বেশী, তারা বলতো, আমাদের কোন ভয় নেই, আমরা যে কোন বিপদের মোকাবেলা করতে পারি, আমাদেরকে শাস্তি দিতে পারে এমন কেউ নেই, কাজেই আমাদেরকে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করে কোন লাভ হবেনা। কারো কোন আযাবের ভয়কে আমরা পরোয়া করিনা। তাই পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেনঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ

'তবে কি তারা লক্ষ্য করেনা? নিশ্চয় যে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী, আর তারা আমার নিদর্শন সমূহকে অস্বীকার করতো।

অর্থাৎ তারা যখন নিজেকে শক্তিশালী বলে দাবী করে তখন এ সত্য ভুলে যায় যে, পরাক্রমশালী আল্লাহ্ পাক তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে শক্তি দান করেছেন, তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি যখন ইচ্ছা তখনই তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন।

মূলতঃ তারা আমার আয়াত সমূহকে অস্বীকার করতো, অর্থাৎ তারা মনে মনে আল্লাহ্ পাকের নিদর্শন সমূহের সত্যতা উপলব্ধি করা সত্বেও দম্ভ অহমিকার কারণে তা অস্বীকার করতো, তাদের এ হঠকারিতার শাস্তি স্বরূপই তারা নিশ্চিহ্ন হয়েছে।

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ
عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ
لَا يُنصَرُونَ ﴿١٦﴾ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ
فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٧﴾ وَ
نَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿١٨﴾ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ
اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٩﴾ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ
عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾

তরজমা

(১৬) এরপর আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে অপমানজনক শাস্তি ভোগ করাবার জন্যে তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম ঝড়-ঝঞ্ঝা কয়েকটি অশুভ দিনে, আর আখেরাতের শাস্তি তো অধিকতর অপমানজনক এবং তাদেরকে কোন প্রকার সাহায্য করা হবেনা।

(১৭) আর সামুদ জাতির অবস্থা এই যে, আমি তাদেরকে হেদায়েত করেছিলাম কিন্তু তারা সৎ পথ গ্রহণ করার স্থলে বিভ্রান্ত থাকতে অধিকতর ভালবাসে। পরিণামে তাদেরকে চরম লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আঘাত হানলো তাদের কৃীর্তিকলাপেরই কারণে।

(১৮) আর যারা ঈমানদার ছিল এবং যারা তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করতে থাকে, তাদেরকে আমি রক্ষা করেছি।

(১৯) আর যেদিন আল্লাহ পাকের শত্রুদেরকে একত্রিত করে দোযখ অভিমুখে হাযির করা হবে তখন তাদেরকে শ্রেণীবদ্ধ করে দেয়া হবে।

(২০) অবশেষে যখন তারা দোযখের নিকট পৌছে যাবে তখন তাদের কর্ণ, চক্ষু এবং দেহ চর্ম তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে আদ জাতির অন্যায় আচরণের বিবরণ ছিল যে, তারা নিজেদের শক্তির বড়াই করতো, আর আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহকে অস্বীকার করতো। মানুষের নৈতিক গুণের বহিঃপ্রকাশ হয় এবং মানবতার উৎকর্ষ সাধন হয় দুটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জনের মাধ্যমে (১) স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা। (২) সৃষ্টির প্রতি দয়া করা। কিন্তু আদ জাতি অহংকার করে এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, নৈতিক ও মানবিক গুণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে অর্থাৎ মানবতার ন্যূনতম গুণও তাদের মধ্যে অবশিষ্ট ছিলনা, তাই তাদের ধ্বংস ছিল অনিবার্য। আলোচ্য আয়াতে আদ জাতির শাস্তির কথা বিস্তারিতভাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ

'এরপর আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে অপমানজনক শাস্তি ভোগ করাবার জন্যে তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম ঝড়-ঝঞ্ঝা কয়েকটি অশুভ দিনে, আর আখেরাতের শাস্তি তো অধিকতর অপমানজনক এবং তাদেরকে কোন প্রকার সাহায্য করা হবেনা'।

আদ জাতির শাস্তি

অনবরত সাত রাত্রি এবং আট দিন ঐ ভয়াবহ আযাব অব্যাহত থাকে, পরিণামে তারা ও তাদের ঘর বাড়ী, বৃক্ষ-তরুলতা, ফল-ফসল, জীব-জন্তু সবই ধ্বংস হয়ে যায়, এ দিনগুলো ছিল তাদের জন্যে অত্যন্ত অশুভ এবং চরম বিপজ্জনক।

তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, তিন বছর পর্যন্ত আল্লাহ পাক তাদেরকে বৃষ্টি থেকে বঞ্চিত রেখেছেন।

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, এ গজবী ঝড়-ঝঞ্ঝা শাওয়ালের শেষ সপ্তাহের বুধবার থেকে শুরু হয়েছে এবং পরবর্তী বুধবার পর্যন্ত অনবরত অব্যাহত থাকে। আদ জাতির সর্ব শেষ ব্যক্তিটির মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত এই গজব নাযিল হতে থাকে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), যাহ্যাক (রঃ), কাতাদা (রঃ) সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, আদ জাতির ধ্বংসের জন্য প্রেরিত এ ঝড়-ঝঞ্ঝায় শুধু যে ভয়ংকর শব্দ ছিল তাই নয়; বরং এটি ছিল অত্যন্ত হিমেল হাওয়া। এতে তাদের অনেক লোকের মৃত্যু ঘটে।

এবনে কোতায়বা, তাবারী সহ আরও কয়েকজন তফসীরকার বলেছেন, এ ঝড়-ঝঞ্ঝার ভয়ঙ্কর শব্দের কারণেও অনেক লোকের মৃত্যু হয়েছে।[১]

আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহকে অস্বীকার করার কারণে এবং আল্লাহর নবী রসূলগণকে মিথ্যা জ্ঞান করার কারণে আদ জাতির উপর এ মহা বিপদ আপতিত হয়। একদিকে তাতে ছিল ভয়ংকর শব্দ, চরম হিমেল হাওয়া, ধ্বংসাত্মক ঝড় যা আদ জাতিকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেয়। যেমন তারা দম্ভ প্রকাশ করেছিল তেমনি অপমানজনক শাস্তিও ভোগ করেছে। তবে এখানেই শেষ নয়; বরং কেয়ামতের দিন চরম অপমানজনক কঠিন শাস্তি তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

وَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى فَاَخَذَتْهُمْ صٰعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

'আর সামুদ জাতির অবস্থা এই, আমি তাদেরকে হেদায়েত করেছিলাম, কিন্তু তারা সৎ পথ গ্রহণ করার স্থলে বিভ্রান্ত থাকতে অধিকতর ভালবাসে। পরিণামে তাদেরকে চরম যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আঘাত হানলো তাদের কীর্তিকলাপেরই কারণে'।

সামুদ জাতির হেদায়েতের জন্যে আল্লাহ পাক হযরত সালেহ (আঃ)-কে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি তাদেরকে হেদায়েত ও গোমরাহী সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারা হেদায়েতের পথ তথা ঈমান ও বিশ্বাসের পথ বর্জন করে এবং বেঈমানী ও নাফরমানীর পথ গ্রহণ করে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), কাতাদা (রঃ) এবং সুদ্দী (রঃ) প্রমুখ তফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান ও আনুগত্যের পথ পরিহার করে সামুদ জাতি অন্ধত্ব ও মূর্খতার পথ অবলম্বন করার কারণে আল্লাহ পাক তাদেরকে ঐ অবস্থায় ছেড়ে দেন। অবশেষে যখন তাদের নাফরমানী এবং ঔদ্ধত্য চরমে পৌছে তখন তাদের শাস্তি বিধানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। একটি ভয়ংকর হুংকার তাদেরকে চিরদিনের জন্যে শেষ করে দেয়। এটি হল তাদের কৃতকর্মের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

فَاَخَذَتْهُمْ صٰعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-২৮০-৮১
তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৪, পৃষ্ঠা-১১২

তখন তাদেরকে অপমানজনক শাস্তির হুংকার পাকড়াও করলো তাদের কীর্তিকলাপের কারণে, তাদের গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার কারণে।

বর্ণিত আছে যে সামুদ জাতির ধ্বংসের জন্যে প্রথমে ভূমিকম্প হয়, এরপর ভয়ংকর গর্জন শুরু হয়, পরিণামে সকলেরই হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

وَنَجَّيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ

'আর যারা ঈমানদার ছিল এবং তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করতে থাকে, তাদেরকে আমি রক্ষা করেছি'।

ঈমান ও সৎ কাজই নাজাতের কারণ হয়

আল্লাহ পাকের দয়ার কোন সীমা নেই, ঐ প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্প এবং ভয়ংকর গর্জন সত্বেও সামুদ জাতির মধ্যে যারা ঈমানদার ও নেককার ছিল, যারা আল্লাহ পাককে ভয় করে জীবন যাপন করতো তাদেরকে আল্লাহ পাক তাঁর বিশেষ রহমতে আপতিত মহা বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাকের মর্জি হলে যাকে ইচ্ছা তাকে মহা বিপদ থেকেও রক্ষা করেন, নাজাত দান করেন কঠিন শাস্তি থেকে। তবে নাজাত লাভের মাধ্যম হল ঈমান ও তাকওয়া। যারা আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান আনে, আর সে ঈমানের দাবী মোতাবেক সৎ কাজ করে, পরহেযগারী অবলম্বন করে, জীবনের সকল অবস্থায় আল্লাহ পাককে ভয় করতে থাকে তাদেরকে আল্লাহ পাক দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে নাজাত দান করেন।

وَيَوْمَ يُحْشَرُ اَعْدَاۤءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ

'আর যেদিন আল্লাহ পাকের শত্রুদেরকে একত্রিত করে দোযখের নিকট আনয়ন করা হবে তখন তাদেরকে শ্রেণীবদ্ধ করে দেয়া হবে'।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আল্লাহ পাকের কুদরত হেকমত এবং তাঁর সৃষ্টি-নৈপূণ্যের কয়েকটি বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। এরপর অবাধ্য কাফেরদের অপমানজনক শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ পাকের নাফরমানীর শাস্তি কত ভয়াবহ হয় তা আদ ও সামুদ জাতির শাস্তির কথা উল্লেখ করার মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। আদ ও সামুদ জাতির যে শাস্তি দুনিয়াতে হয়েছে তার বিবরণই স্থান পেয়েছে পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে।

আর আলোচ্য আয়াতে আখেরাতে তাদের যে কঠিন শাস্তি হবে তার ঘোষণা স্থান পেয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ

আর সেদিনকে স্মরণ কর, যেদিন আল্লাহ পাকের সকল দুশমনকে দোযখের কাছে একত্রিত করা হবে এবং তাদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হবে অর্থাৎ একটি নিদৃষ্ট স্থানে সকলকে সমবেত করা হবে, যখন সকলে একত্রিত হবে তখন তাদেরকে তাদের জীবনের যাবতীয় কার্যকলাপ স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে, তারা যত জুলুম-অত্যাচার করেছিল, যত অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত হয়েছিল সব কিছু সেদিন প্রকাশ করা হবে। সেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে তাদেরই কর্ণ, চক্ষু এবং তাদের চর্ম।

এ আয়াতের তফসীরে মোকাতেল (রঃ) বলেছেনঃ মানুষের হাত-পাগুলোকে মানুষ কী কাজে ব্যবহার করেছে তা তারা বর্ণনা করবে।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, আমরা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে ছিলাম, হঠাৎ তিনি মুচকী হাসলেন। এরপর তিনি এরশাদ করলেন, তোমরা কি জান আমি কেন মুচকী হাসলাম, সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলই তা ভাল জানেন। তখন তিনি এরশাদ করলেন, আমি এজন্যে মুচকী হেসেছি (কেয়ামতের দিন) বন্দা তার প্রতিপালকের দরবারে আরজী পেশ করবে, হে আমার প্রতিপালক, আপনি কি আমাকে জুলুম থেকে আশ্রয় দেননি? (অর্থাৎ আপনি কি একথা ঘোষণা করেননি যে, কারো প্রতি কেয়ামতের দিন জুলুম করা হবেনা) আল্লাহ পাক ঘোষণা করবেন, অবশ্যই। তখন বন্দা আরজ করবে, আমার বিরুদ্ধে বাইরের কেউ যেন সাক্ষ্য না দেয়, যা আমার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তাই আমার ব্যাপারে স্বাক্ষ্য দেবে। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, আজ তোমার আপন সত্ত্বাই তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, অথবা তোমার কার্যকলাপ লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতারাই তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। এরপর ঐ ব্যক্তির রসনাকে বন্ধ করে দেয়া হবে এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বাক শক্তি দান করে কথা বলার আদেশ দেয়া হবে। এরপর তার হাত পা তার বিরুদ্ধে স্বাক্ষ্য দেবে।

মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে, তাতে একথাটি সংযোজিত হয়েছে, আল্লাহ পাক যখন তার রসনাকে বন্ধ করে দেবেন তখন তার উরুকে আদেশ দেয়া হবে কথা বলার জন্যে, তখন সঙ্গে সঙ্গে ঐ ব্যক্তির উরুর গোশ্ত ও হাড় কথা বলবে এবং তার কার্যকলাপ বর্ণনা করবে।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-২৮১-৮২
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৪ পৃষ্ঠা-৭১

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ করেছেন যে, কাফের ও মুনাফেকদেরকে হিসাবের জন্য ডাকা হবে, তাদের আমলনামা তাদের সামনে রাখা হবে, তখন তারা শপথ করে বলবে যে আমরা এসব কাজ করিনি, ফেরেশতারা তখন বলবে তুমি কি এসব কাজ করনি? তখন সে বলবে হে আল্লাহ! তোমার ইজ্জতের শপথ করে বলছি, আমি তা করিনি। তখন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তার রসনা বন্ধ করে দেয়া হবে, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, সর্ব প্রথম তার ডান উরু কথা বলবে।

وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا ۭ قَالُوْٓا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ
الَّذِيْٓ اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَّهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّاِلَيْهِ
تُرْجَعُوْنَ ﴿٢١﴾ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ
سَمْعُكُمْ وَلَآ اَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ
لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٢﴾ وَذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِيْ
ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدٰىكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٢٣﴾ فَاِنْ
يَّصْبِرُوْا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۚ وَاِنْ يَّسْتَعْتِبُوْا فَمَا هُمْ مِّنَ
الْمُعْتَبِيْنَ ﴿٢٤﴾

তরজমা

(২১) দোযখীরা তাদের চর্ম সমূহকে জিজ্ঞাসা করবে, কেন তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছ? তারা বলবে, যিনি সমস্ত কিছুকে বাক শক্তি দান করেছেন, তিনি আমাদেরকেও বাক শক্তি দিয়েছেন, তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, আর তাঁরই নিকট তোমাদের ফিরে যেতে হবে।

(২২) তোমরা কোন কিছু গোপন করতে না, তোমরা মনে করেছিলে যে তোমাদের কর্ণ, চক্ষু এবং চর্ম তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে না, তোমরা মনে করেছিলে তোমাদের অনেক কীর্তিকলাপ সম্পর্কে আল্লাহ পাক জানতেন না।

(২৩) তোমাদের প্রতিপালক সম্পর্কে তোমাদের এ (ভ্রান্ত) ধারণাই তোমাদের ধ্বংস ডেকে এনেছে, তোমরা হয়েছ সর্বস্বান্ত।

(২৪) অতএব, তারা যদি সবর অবলম্বন করে তবুও দোজখই হবে তাদের ঠিকানা, আর যদি অনুগ্রহ প্রার্থনা করে তবুও তারা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবে না।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন কাফের মুনাফেকদের চক্ষু, কর্ণ চর্ম সবই তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে কাফেররা এভাবে অপমানিত-অপদস্ত হওয়ার পর তাদের চক্ষু, কর্ণ ও চর্মকে লক্ষ্য করে বলবে, আমরা যখন সব কথা অস্বীকার করলাম তখন তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে কেন সাক্ষ্য দিলে?

কেয়ামতের দিন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাক্ষ্য দেবে

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন কেয়ামতের দিন পাপীষ্ঠদেরকে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় দোযখের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, তাদেরকে দোযখের পার্শ্বে দাঁড় করানো হবে, তাদের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনে এ অঙ্গ দ্বারা যা কিছু করেছে তা সেদিন তারা প্রকাশ করে দেবে। যেমন 'সূরা আত তারেকে' এরশাদ হয়েছে ঃ

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ ۞ فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ

'সেদিনকে স্মরণ কর যেদিন গোপন বিষয় সমূহ পরীক্ষিত হবে, যেদিন তার কোন শক্তিও থাকবেনা, কোন সাহায্যকারীও থাকবেনা'।

وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا ؕ

সেদিন পাপীষ্ঠরা নিজেদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সম্বোধন করে বলবে, 'তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে কেন সাক্ষ্য দিলে'?

তখন তারা বলবে,

قَالُوْٓا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِيْٓ اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَّهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

'আল্লাহ্ পাকই আমাদেরকে বাক শক্তি দান করেছেন, যিনি প্রত্যেকটি বস্তুকে বাক শক্তি দিয়েছেন। আর তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আর তাঁরই নিকট তোমাদের ফিরে যেতে হবে'।

অতএব, যিনি স্রষ্টা, যিনি পালনকর্তা তাঁর বিরোধিতা করা করো পক্ষেই সম্ভব নয়। আমরা তোমার দেহের অঙ্গ সত্য কিন্তু আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্ পাক এবং তিনিই আমাদেরকে বাক শক্তি দান করেছেন, তাই তাঁর হুকুম মোতাবেকই আমরা তোমাদের কীর্তি কলাপ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছি।

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ اَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ

'তোমরা কোন কিছু গোপন করতে না, তোমরা মনে করেছিলে যে, তোমাদের কর্ণ, চক্ষু এবং চর্ম তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবেনা, তোমরা মনে করেছিলে তোমাদের অনেক কীর্তি কলাপ সম্পর্কে আল্লাহ্ জানতেন না'।

শানে নযুল

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে একখানি হাদীস সংকলিত হয়েছে। আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে এ হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কা'বা শরীফের নিকট সাকাফী গোত্রের দু' জন এবং কোরায়শ গোত্রের একজন অথবা দু' জন কোরায়শী ও একজন সাকাফী একত্রিত হয়। এই তিনজনেরই পেট বেশ মোটা ছিল, তাতে চর্বি জমেছিল তবে বুদ্ধি কম ছিল। তাদের একজন বললো, তোমরা কি জান আল্লাহ্ পাক আমাদের কথাবার্তা শুনে ফেলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি বললো, আমরা চিৎকার করে বললে শোনেন, আর চুপিসারে বললে শোনেন না। আর তৃতীয় ব্যক্তি বললো, যদি উচ্চস্বরে চিৎকার করে বললে শোনেন তবে নিম্নস্বরে বললেও শুনবেন।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, সাকাফী লোকটি ছিল আবদ ইয়ালাইল। আর কোরায়শী দু'জন ছিল রাবীয়া এবং সাফওয়ান এবনে উমাইয়া। তাদের এ কথাবার্তার পরই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনে তোমরা কি চিন্তা করেছিলে? যে তোমাদের চক্ষু, কর্ণ তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে বস্তুতঃ তা তোমরা তখন কল্পনাও করনি; বরং প্রকৃত অবস্থা এই যে তোমরা এ ভুল ধারণা করতে যে তোমাদের অনেক কাজ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক জানেন না। এজন্যেই

তোমরা নির্ভয়ে আল্লাহ পাকের নাফরমানীতে লিপ্ত ছিলে। আর তোমাদের এ ভুল ধারণাই তোমাদের ধ্বংসের কারণ হয়েছে। যদি তোমরা একথা বিশ্বাস করতে যে, আল্লাহ পাক সব কিছু জানেন, সব কিছু দেখেন তবে তাঁর নাফরমানী করার ধৃষ্টতা তোমরা দেখাতে না।

فَاِنْ يَّصْبِرُوْا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ط

'অতএব, তারা যদি সবর অবলম্বন করে তবুও দোযখই হবে তাদের ঠিকানা'।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, পৃথিবীতে ধৈর্য ধারণ করলে অনেক বিপদ দূর হয়ে যায়। বিখ্যাত উর্দু কবি মির্জা গালিব কথাটিকে অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেনঃ

رنج کا خو گرهو انسان تو مت جاتا هے رنج
مشکلین اتنی پڑین مجه پرکه آسان هوگین

'যদি বিপদাপদে মানুষ অভ্যস্ত হয়ে যায় তবে তা দূরীভূত হয়ে যায়, আমার জীবনে এত কঠিন সমস্যা এসেছে যে সবই সহজ হয়ে গেছে'।

যাহোক, এ অবস্থা দুনিয়ার ব্যাপারে হতে পারে কিন্তু আখেরাতের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, যদি কাফেররা সবরও করে তবুও তাদের বিপদ কম হবেনা, দোযখই থাকবে তাদের ঠিকানা, দোযখের শাস্তিও অব্যাহত থাকবে।

وَاِنْ يَّسْتَعْتِبُوْا فَمَا هُمْ مِّنَ الْمُعْتَبِيْنَ

আর যদি তারা কাকুতি-মিনতি করে ক্ষমাপ্রার্থী হয়, অনুগ্রহ চায় তবুও তারা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবেনা, তাদের কাকুতি মিনতি কোন কাজেই আসবেনা।

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُوْا لَهُمْ مَّا بَيْنَ
اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْٓ اُمَمٍ
قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا
خٰسِرِيْنَ ﴿٢٥﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ
وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ ﴿٢٦﴾ فَلَنُذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا عَذَابًا شَدِيْدًا ۙ وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَسْوَاَ الَّذِيْ كَانُوْا
يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٧﴾ ذٰلِكَ جَزَآءُ اَعْدَآءِ اللّٰهِ النَّارُ ۚ لَهُمْ فِيْهَا
دَارُ الْخُلْدِ ۭ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿٢٨﴾

তরজমা

(২৫) আর আমি তাদের জন্যে নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম কিছু এমন সহচর যারা তাদের সম্মুখ ও পশ্চাতের কার্য সমূহকে তাদের দৃষ্টিতে শোভনীয় করে দেখিয়েছিল, এবং তাদের প্রতি পূর্ববর্তী জ্বীন ও মানুষদের ন্যায় শাস্তির বিধান বাস্তবায়িত হয়েছে। নিশ্চয় তারা ছিল অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত।

(২৬) এবং কাফেররা বলে যে, তোমরা এই কোরআন শ্রবণ করোনা, আর কোরআন তেলাওয়াতের সময় শোরগোল সৃষ্টি কর যাতে করে তোমরা জয়ী হও।

(২৭) অতএব, আমি এ কাফেরদেরকে কঠিন আযাব আস্বাদন করাব, আর নিশ্চয় আমি তাদের জঘন্যতম কার্যকলাপের শাস্তি প্রদান করবো।

(২৮) এটিই আল্লাহর শত্রুদের শাস্তি– দোযখ সেখানে তাদের জন্যে রয়েছে স্থায়ী বাসস্থান, কেননা তারা আমার আয়াত সমূহকে অস্বীকার করতো।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের কঠিন শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে, আর এ আয়াত থেকে এ শাস্তির কারণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُوْا لَهُمْ مَّا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ
الْقَوْلُ فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۚ

আর এ নাফরমানদের জন্যে আমি কিছু এমন সহচর নির্ধারণ করেছি যারা তাদের চরম ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় কীর্তিকলাপকে সুন্দর এবং শোভনীয় করে দেখাত। তারা তাদের যাবতীয় অসৎ কর্মকে অন্যায়ভাবে সমর্থন করতো। আর ভবিষ্যতের প্রশ্নে তথা আখেরাতের ক্ষেত্রে ঐ সহচররা বলতো, জান্নাত, দোযখ, কেয়ামত, হিসাব-নিকাশ এসব কিছুই নেই, দুনিয়ার জীবনই সত্য আর এ জীবনকে যেভাবে পার ভোগ কর, দুনিয়া কখনো শেষ হবেনা। এভাবে তাদেরকে অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত থাকার সুযোগ দিত, তাদের ঘৃণ্য কীর্তিকলাপকে এ দুষ্ট সহচররা অত্যন্ত লোভনীয় মোহনীয় করে তুলত। পরিণামে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ পাকের একটি ঘোষণা বাস্তবায়িত হলো, আল্লাহ পাক সৃষ্টির প্রথম দিন ইবলিস শয়তান ও তার সঙ্গীদের সম্পর্কে ঘোষণা করেছিলো। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

لَأَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ

'আমি তোকে এবং তোর অনুসারীদের দিয়ে দোযখকে পরিপূর্ণ করে দেব'। আর এ শাস্তি নতুন কিছু নয়; বরং তাদের পূর্বে যারা পৃথিবীতে ছিল এবং আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়েছিল, তা জ্বীন হোক বা মানুষ তাদেরও এমন শাস্তি হয়েছিল।

إِنَّهُمْ كَانُوا خٰسِرِيْنَ

'নিশ্চয় তারা ছিল অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত'।

অসৎ সংসর্গ বিষতুল্য

এখানে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য-

এক. অসৎ সংসর্গ মানুষের ধ্বংসের কারণ হয়, মন্দ সাথী মানুষকে মন্দ কাজে আকৃষ্ট করে এবং ঐ মন্দ সংসর্গের কারণে ভালও মন্দ হয়ে যায়, পরিণামে তার জীবনে আসে ধ্বংস, দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানে সে হয় সর্বস্বান্ত, অতএব অসৎ সংসর্গ বিষতুল্য, আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়ে বিশেষ ইঙ্গিত রয়েছে।

দুই. যখন মানুষ অন্যায় কাজে লিপ্ত হয় তখন তাকে অন্যায় মনে করেনা; বরং তাকে সুন্দর, শোভনীয় এবং যুক্তিপূর্ণ মনে করে। আর অন্যায় কাজের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শনের কাজটিই করে মন্দ সহচররা, আর এভাবেই মানুষের জীবনে ধ্বংস নেমে আসে, দুনিয়া-আখেরাত দু' জাহানে তার শাস্তি হয় অবধারিত।

তিন. যেহেতু মন্দ কাজকে মন্দ মনে করা হয় না তাই তা বর্জন করার চিন্তাও করা হয়না, পরিণামে এমন লোকেরা কখনও ঘৃণ্য কর্ম থেকে আত্মরক্ষা করতে

পারেনা। সারা জীবন মন্দ কাজেই লিপ্ত থাকে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ 'তোমাদের হাশর তেমনই হবে যেমন তোমাদের মৃত্যু হবে, আর তোমাদের মৃত্যু তেমনই হবে যেমন তোমাদের জীবন হবে'।

অতএব, যার এ জীবন মন্দ হবে তার পরজীবনও মন্দ, অপমানজনক এবং বিপজ্জনক হবে (আল্লাহ্ পাক রক্ষা করুন)।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ

'আর কাফেররা বলে যে, তোমরা এ কোরআন শ্রবণ করোনা, কোরআন তেলাওয়াতের সময় শোরগোল সৃষ্টি কর, যেন তোমরা জয়ী হও'।

পূর্ববর্তী আয়াতে পাপীষ্ঠ লোকদের উদ্দেশ্যে যে শাস্তির কথা ঘোষিত হয়েছে, তা থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা, অন্যায়-অনাচার পরিহার করা কর্তব্য ছিল, কিন্তু মক্কার কাফেররা কোরআনে করীমের আয়াত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার স্থলে সিদ্ধান্ত নিল যে, কোন অবস্থাতেই কোরআন শ্রবণ করোনা। যদি তোমাদের সম্মুখে কোরআন তেলাওয়াত করা হয় তবে এমন শোরগোল সৃষ্টি কর যেন কেউ কোরআন শ্রবণ করতেই না পারে।

মূলতঃ মানব মনে পবিত্র কোরআনের যে অলৌকিক প্রভাব পড়ে তা মানুষের হেদায়েতের কারণ হয়, মানুষের জীবনে আসে এক অভূতপূর্ব ইনকেলাব বা বিপ্লব, এমনকি আজো যারা পবিত্র কোরআনের মর্ম উপলব্ধি করতে পারেনা, তারাও এর পঠন-মাধুর্যের কারণে আকৃষ্ট হতে থাকে। এভাবে ধীরে ধীরে মক্কার কাফেরদের মনেও পবিত্র কোরআন রেখাপাত করতে থাকে, আর এজন্যেই তথাকথিত কাফের নেতারা লোকদেরকে বলে, তোমরা পবিত্র কোরআন শ্রবণে বিরত থাক এবং অন্যদেরকেও বিরত রাখ, যখন যেখানে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত হতে দেখ, সেখানে হট্টগোল সৃষ্টি কর, যেন কেউ পবিত্র কোরআন শ্রবণ করতে না পারে।

এ আয়াত সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, কোরায়শের মধ্যে কিছু লোক পরস্পরকে বলতো যখনই মোহাম্মদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) পবিত্র কোরআন পাঠ করতে দেখ তখন তোমরা তাঁর সম্মুখে উচ্চস্বরে কবিতা পাঠ করতে থাক, অহেতুক কথাবার্তা বল, চিৎকার কর।

মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, তারা একে অন্যকে বলতো পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত শোনার সাথে সাথে তোমরা তালি বাজাতে থাক।

যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, والغوا শব্দটির অর্থ হল, তোমরা এমন কথা বল যাতে গোলমাল সৃষ্টি হয়।

সুদ্দী (রঃ) এর অর্থ বলেছেন, তোমরা চিৎকার কর। এসব ব্যবস্থা গ্রহণ করার মাধ্যমে পবিত্র কোরআন শ্রবণ করা কারো পক্ষেই সম্ভব হবে না।[১]

কাফেরদের অপচেষ্টা ব্যর্থ

দূরাত্মা কাফেররা মানুষকে পবিত্র কোরআন থেকে দূরে রাখার এ অপচেষ্টাও করেছিল, কিন্তু তাদের এ অপচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। পবিত্র কোরআন স্ব-মহিমায় সর্বত্র প্রভাব বিস্তার করেছে, বিগত চোদ্দশ' বছরে পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার প্রচার-প্রসারে কখনও ভাটা পড়েনি, আধুনিক বিশ্বের ৪০০শ' ভাষায় পবিত্র কোরআনের অনুবাদ হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ হলো পবিত্র কোরআন। হাফেজগণ তা কণ্ঠস্ত করে রেখেছেন, কারীগণ তাদের সুমধুর কণ্ঠে পবিত্র কোরআন আবৃত্তি করে আকাশ-বাতাসকে মুখরিত রাখছেন। অনুবাদকগণ অনুবাদ করে এবং তফসীরকারগণ পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যা পেশ করে তার মর্মবাণী প্রচারের ব্যবস্থা করছেন, আর এ অবস্থা ইনশাআল্লাহ কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, কেননা পবিত্র কোরআন আল্লাহ পাকের কালাম, তাঁর মহান বাণী, বিশ্ব মানবের নামে আল্লাহ পাকের সর্বশেষ পয়গাম, বিশ্ব কল্যাণের মূর্ত প্রতীক, যতদিন এ পৃথিবী থাকবে ততদিন পবিত্র কোরআনও থাকবে।

فَلَنُذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَذَابًا شَدِيْدًا وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَسْوَاَ الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

'অতএব, আমি এ কাফেরদেরকে কঠিন আযাব আস্বাদন করাব, আর নিশ্চয় আমি তাদের জঘন্যতম কার্যকলাপের শাস্তি প্রদান করবো'।

পূর্ববর্তী আয়াতে পবিত্র কোরআনের প্রচারে কাফেরদের পক্ষ থেকে বাধা সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। আর এ আয়াতে আল্লাহ পাক তাদের এ অপকর্মের শাস্তির কথা ঘোষণা করেছেন যে, কাফেরদেরকে তাদের অপরাধের জন্যে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে। তাদের জঘন্যতম অন্যায়ের জন্যে কঠোরতম শাস্তি অপেক্ষা করছে।

ذٰلِكَ جَزَآءُ اَعْدَآءِ اللّٰهِ النَّارُ لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ ط جَزَآءً بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-২৮৪

এটি আল্লাহ পাকের দুশমনদের শাস্তি– দোযখ, সেখানে তাদের চিরস্থায়ী আবাসস্থল রয়েছে, অর্থাৎ তারা চিরদিন দোযখের শাস্তি ভোগ করতে থাকবে, কেননা তারা আমার নিদর্শন সমুহকে অস্বীকার করতো।

লক্ষ্যণীয়, কাফেররা পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের সময় হট্টগোল করে, চিৎকার করে, তালি বাজিয়ে মানুষকে পবিত্র কোরআন শ্রবণে বাধা দিত, এজন্যে তাদের চিরস্থায়ী শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

পবিত্র কোরআন সম্পর্কে কর্তব্য

এ পর্যায়ে মোমেনদের কর্তব্য নির্দেশ করে এরশাদ হয়েছেঃ

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

'আর যখন পবিত্র কোরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনযোগ সহকারে শ্রবণ কর এবং নীরব থাক, হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে'।

অতএব, মোমেন মাত্রেরই কর্তব্য হল, পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের সময় তার আদব রক্ষা করা তথা মনযোগ সহকারে শ্রবণ করা, সম্পূর্ণ নীরবতা পালন করা। যত্ন সহকারে এ কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই আল্লাহ পাকের রহমত লাভ করা যাবে।'

বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার এ যুগে রেডিও-টিভির ন্যায় প্রচার মাধ্যমে অল্পক্ষণের জন্যে হলেও পবিত্র কোরআন পাঠ করা হয়। এ পর্যায়ে মোমেন মাত্রেরই কর্তব্য হল সম্পূর্ণ নীরবতা পালন করা এবং মনযোগ সহকারে শ্রবণ করা। যারা এ কর্তব্য সঠিক ভাবে পালন করবে তাদের জন্যে সুসংবাদ রয়েছে অন্য আয়াতে-

فَبَشِّرْ عِبَادِ ۞ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ

'(হে রসূল!) আপনি সুসংবাদ দিন তাদেরকে যারা মনযোগ সহকারে কোরআনে করীম শ্রবণ করে এবং তার উত্তম কথাগুলো মেনে চলে, এরাই সে সব লোক যাদেরকে আল্লাহ পাক হেদায়েত করেছেন এবং তারাই বুদ্ধিমান'।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَبَّنَآ اَرِنَا الَّذَيْنِ اَضَلّٰنَا مِنَ الْجِنِّ
وَالْاِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ ﴿٢٩﴾
اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ
الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ
تُوْعَدُوْنَ ﴿٣٠﴾ نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۚ
وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ ﴿٣١﴾ نُزُلًا مِّنْ
غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ ﴿٣٢﴾

তরজমা

(২৯) আর কাফেররা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! যে সব জ্বীন এবং মানুষ আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল, আমাদেরকে দেখিয়ে দাও তাদেরকে, আমরা তাদেরকে পদদলিত করবো, যাতে তারা অপদস্থ হয়।

(৩০) নিশ্চয় যারা স্বীকার করেছে যে, আমাদের প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ পাকই, এরপর তারা (এ বিশ্বাসের উপর) অটল অবিচল রয়েছে, তাদের প্রতি সুসংবাদ নিয়ে ফেরেশতাগণ নাযিল হবে (এবং বলবে) তোমরা (পরকালীন জীবনের বিপদের ব্যাপারে) ভয় করোনা, আর (দুনিয়া থেকে বিদায়ের কারণেও) দুঃখিত হয়োনা, এবং তোমাদেরকে যে বেহেশতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্যে আনন্দিত হও।

(৩১) দুনিয়ার জীবনে আমরা তোমাদের বন্ধু এবং আখেরাতেও, সেখানে তোমাদের জন্যে রয়েছে সে সব বস্তু যা তোমাদের মন চায়। আর যা কিছুর জন্যে তোমরা ফরমায়েশ করবে তা-ও রয়েছে তোমাদের জন্যে সেখানে।

(৩২) পরম দয়ালু, অতীব ক্ষমা-প্রিয় আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এটিই হবে আপ্যায়ন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, কাফের মুশরেক অপরাধীদের পাপাচারের অন্যতম কারণ হলো তাদের মন্দ সহচর, যারা তাদেরকে সর্বদা মন্দ কাজে লিপ্ত থাকতে প্ররোচনা দিত, এরপর এ অন্যায়কারীদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

আর আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ অপরাধীদের যখন দোযখে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা তাদের সে সব নেতাদের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করবে এবং তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ পাকের দরবারে ফরিয়াদ করে বলবে,

رَبَّنَآ اَرِنَا الَّذَيْنِ اَضَلّٰنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا

হে পরওয়ারদেগার! যারা আমাদেরকে দুনিয়াতে পথভ্রষ্ট করেছে, যাদের কারণে আজ আমরা মহাবিপদের শিকার হয়েছি, আমরা তাদেরকে দেখতে চাই, আমাদেরকে একবার তাদেরকে দেখিয়ে দিন, আমরা তাদেরকে পদদলিত করে প্রতিশোধ গ্রহণ করবো। আমরা তো শেষ হয়ে গেছি, তাদেরকেও শেষ করবো, এভাবে আমাদের মনের জ্বালা মেটাব।

যদিও কাফের মুশরেকরা এভাবে তাদের মনের ক্ষোভ প্রকাশ করবে, কিন্তু কাফের মুশরেকদের সেই নেতারাও যথা নিয়মে দোযখেই নিক্ষিপ্ত হবে এবং তাদের উপর কঠিন আযাব শুরু হবে। এতদসত্বেও দোযখীরা এ আকাঙ্ক্ষা করবে যেন তাদের ঐ দুর্গতি কাফেররা স্বচক্ষে দেখতে পায়।

لِيَكُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ

'যেন তারা সর্বাপেক্ষা নীচেই থাকে'।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, অনুসারীরা তাদের নেতাদের সম্পর্কে এ দাবী করবে যেন তাদেরকে দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে স্থান দেয়া হয় অর্থাৎ তাদেরকে যেন কঠিনতম শাস্তি দেয়া হয়।

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا

'নিশ্চয় যারা স্বীকার করেছে যে, আমাদের প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ পাকই, এরপর তারা (এ বিশ্বাসের উপর) অটল অবিচল রয়েছে'।

اسْتَقَامُوْا

এ শব্দটির অর্থ হল, সুদৃঢ় এবং অটল অবিচল থাকা অর্থাৎ যারা এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান এনেছে, তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং এ বিশ্বাসের উপর সর্বদা অটল অবিচল থেকেছে। এ বিশ্বাস বিরোধীদের পক্ষ থেকে যত বিপদাপদ, ঝড়-ঝঞ্ঝা আসুক না কেন, মোমেনগণ সে বিশ্বাসের উপর অটল অবিচল রয়েছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নের আহবান জানালেন, তখন যে স্বল্প সংখ্যক লোক ইসলাম কবুল করেছেন, তাঁদের প্রতি কাফেররা অকথ্য নির্যাতন করে। হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত বেলাল (রাঃ), হযরত, আম্মার এবনে ইয়াসের (রাঃ) হযরত সুমাইয়া (রাঃ) সহ আরও অনেক সাহাবায়ে কেরাম শত জুলুম অত্যাচার সত্বেও ঈমানের উপর অটল অবিচল ছিলেন। হযরত আবু সালমা (রাঃ) এ ঈমানের তাগিদেই মক্কা শরীফ থেকে মদীনা মোনাওয়ারায় হিজরত করছিলেন। সূচনাতেই তাঁর স্ত্রীকে ছিনিয়ে নেয়া হল, বলা হল, তুমি যেতে পার তবে তাকে যেতে দেবনা। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তাঁর সন্তানকেও ছিনিয়ে নেয়া হল, এরপর সামান্য মালপত্র যা পাথেয় হিসাবে ছিল তা-ও কেড়ে নেয়া হল। কিন্তু এতদসত্বেও তিনি এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমানের ব্যাপারে ছিলেন অটল অবিচল। এমনি বহু ঘটনা রয়েছে। এক কথায়, যে কোন মূল্যে ঈমান বিরোধী কাজ থেকে দূরে থাকা, ঈমানের উপর সুদৃঢ় থাকা হল "এসতেকামত"।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে সাহাবী সুফিয়ান এবনে সকফী আবদুল্লাহ (রাঃ) আরজী পেশ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! ইসলামের ব্যাপারে আমাকে এমন একটি কথা শিক্ষা দিন যা আপনার পর আর কারও নিকট জিজ্ঞাসা করার আমার কোন প্রয়োজন না থাকে। তিনি এরশাদ করলেন, তুমি বল যে, "আমি এক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি" এরপর একথার উপর সুদৃঢ় থাক (অটল অবিচল থাক)। (মুসলিম শরীফ)

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর নিকট 'এসতেকামতে'র ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন, কোন অবস্থাতেই আল্লাহ পাকের সাথে কোন কিছুকে শরীক না করা।

হযরত ওমর (রাঃ)-কে 'এসতেকামত' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন, তুমি আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধকে যত্নসহকারে পালন করতে থাক, কখনও এদিক সেদিন যেওনা।

হযরত ওসমান (রাঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যারা শুধু এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে কাজ করে তারাই 'এসতেকামতে'র গুণ অর্জন করে।

হযরত আলী (রাঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যারা ঈমান আনে ও এ পর্যায়ের অবশ্য করণীয় কাজ করে অর্থাৎ ঈমান আনে এবং ঈমান মোতাবেক জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে, আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করে।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপনের পর তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা, তাঁর নাফরমানী থেকে আত্মরক্ষা করাই হলো 'এসতেকামত'।

মুজাহেদ এবং একরামা (রঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নের পর মৃত্যু পর্যন্ত এ বিশ্বাসের উপর সুদৃঢ় থাকা।

মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, ঈমানের পর আল্লাহ পাকের মা'রেফাত হাসিল করা এবং এর উপর কায়েম থাকা।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আরোপিত যাবতীয় ফরজ তথা অবশ্য কর্তব্য সমূহ সঠিকভাবে পালন করা।

কাতাদা (রঃ) বর্ণনা করেন, হযরত হাসান (রাঃ) এ আয়াত পাঠ করার পর বলতেন, 'হে আল্লাহ! তুমিই আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে এসতেকামত নসীব কর'।

বস্তুতঃ জীবনের সকল স্তরে ঈমানের উপর কায়েম থাকা, কখনও ঈমান বিরোধী কাজের প্রতি আকৃষ্ট না হওয়া, শত বিপদের মোকাবেলা করেও ঈমান রক্ষা করাই হল 'এসতেকামত'।

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে তিরমিজী, নাসাঈ, এবনে জরীর, এবনে আবি হাতেম প্রমুখ একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেনঃ একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের সম্মুখে এ আয়াত পাঠ করে এরশাদ করলেনঃ কতলোক একথা বলে যে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ পাক, এরপর অনেকেই আল্লাহ পাকের নাফরমানী করে। তবে যে একথা বলে (ঈমান আনয়ন করে) মৃত্যু পর্যন্ত এর উপর কায়েম থাকে, সে-ই এস্তেকামতের বৈশিষ্ট্য অর্জন করে।[১]

১। তফসীরে আদ্দুররুল মনসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৯৯

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এ আয়াত হযরত আবু বকর (রাঃ) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এ আয়াতের মর্ম প্রথমতঃ খোলাফায়ে রাশেদীন, এরপর প্রথম যুগের মোহাজেরীনদের ব্যাপারে বিশেষভাবে প্রযোজ্য।[১]

تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ

'যারা আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আনে এবং এ ঈমানের উপর সুদৃঢ় থাকে তাদের প্রতি ফেরেশতাগণ অবতরণ করবে'।

ঈমানদারদের নিকট ফেরেশতাদের অবতরণ তাদের উচ্চ মর্যাদারই প্রমাণ। আর এটি ঈমান ও এসতেকামতের প্রথম শুভ পরিণতি স্বরূপ আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত।

ফেরেশতাগণ কখন অবতরণ করবে

এর জবাবে হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, মোমেনের মৃত্যুর সময় রহমতের ফেরেশতাগণ অবতরণ করে।

তফসীরকার কাতাদা ও মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, মোমেনগণ যখন কবর থেকে উঠবে তখন ফেরেশতাগণ তাদের নিকট অবতরণ করবে।

আর ওকী এবনে জাররাহ্ বলেছেন, তিনটি সময়ে ফেরেশতাগণ এসে শুভ সংবাদ পৌঁছাবে। মৃত্যুর সময়, কবরে তথা মধ্যলোকে, কবর থেকে পুনরুত্থানের সময়।

ঈমান ও এসতেকামতের দ্বিতীয় শুভ পরিণতি হল, আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে ফেরেশতাগণ মোমেনদেরকে সুসংবাদ দেবেন,

اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا

অর্থাৎ আখেরাতের ব্যাপারে ভয় করোনা, আর দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়া এবং আত্মীয়-স্বজন থেকে বিচ্ছেদ হওয়ার জন্যে দুঃখিত হয়োনা।

আতা এবনে রাবাহ (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল নিজেদের গুণাহর জন্যে ভয় করোনা, অর্থাৎ আযাবের ভয়ে চিন্তিত হয়োনা, আল্লাহ্ পাক সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেবেন।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-২৮৫-৮৭
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৪ পৃষ্ঠা-৭৫

وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ

'আর দুনিয়াতে তোমাদেরকে বেহেশতের যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্যে আনন্দিত হও'।

এটি হল ঈমান ও এসতেকামতের তৃতীয় শুভ পরিণতি, মোমেনদের জন্যে নেয়ামত।

আবু নাঈম লিখেছেনঃ বিখ্যাত মোহাদ্দেস সাবেত বনানী (রঃ) এ আয়াত তেলাওয়াত করে বলেছেন, আমি এই হাদীস জানতে পেরেছি, মোমেন বন্দাকে যখন কবর থেকে ওঠানো হবে তখন দুনিয়ার জীবনে যে সব ফেরেশতা তার সাথে থাকত, তারা তাঁর সাথে দেখা করে এ সুসংবাদ দেবে, তোমরা ভীত হয়োনা, তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছিল তা নিয়ে আনন্দিত হও। এরপর আল্লাহ পাক মোমেন বন্দাকে সর্বপ্রকার ভয় থেকে নিশ্চিন্ত করবেন এবং তাদের নয়ন মনের শান্তি প্রদান করবেন। এ পর্যায়ে চতুর্থ শুভ পরিণতি হলো ফেরেশতাগণ বলবেঃ

نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

(আমরা দুনিয়াতে তোমাদের সাথী, বন্ধু ছিলাম এবং আখেরাতেও তোমাদের জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত সাথী থাকব) আর পঞ্চম শুভ পরিণতি হলো,

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ

'আর তোমাদের মন যা চাইবে, তাই রয়েছে সেখানে তোমাদের জন্যে'।

বস্তুতঃ মন যা চায় তা পাওয়ার আনন্দ বর্ণনাতীত, দুনিয়াতে এ আনন্দ খুব কমই পাওয়া যায়, কিন্তু জান্নাতে নেককার মোমেনদের জন্যে সে সব নেয়ামত মওজুদ থাকবে যা তাদের মন চাইবে।

ষষ্ঠ নেয়ামত হলো,

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ

আর যা তোমাদের চাহিদা হবে এবং যা কিছুর ফরমায়েশ তোমরা করবে, সবই তোমাদের জন্যে পরিবেশন করা হবে।

আর সপ্তম নেয়ামত এই

نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ

'এ হলো অত্যন্ত ক্ষমা-প্রিয় করুণাময় প্রভুর আপ্যায়ন'।

বস্তুতঃ সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত হলো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ করা, তাঁর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হওয়া, এ নেয়ামত নজিরবিহীন।

তাই হাদীসে শরীফে রয়েছে আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় বন্দাদেরকে জান্নাতের নেয়ামত সমূহ প্রদানের পর এরশাদ করবেনঃ হে আমার বন্দাগণ! তোমাদের আরও কিছুর প্রয়োজন আছে কি?

তখন জান্নাতবাসীগণ আরজ করবে, হে পরওয়ারদেগার! সবই তো তুমি দান করেছ, আর আমাদের কি প্রয়োজন থাকতে পারে?

এরপর ঘোষণা করা হবে,

رضاءى

'আমি তোমাদেরকে আমার সন্তুষ্টি দান করলাম, এরপর আমি আর কখনও তোমাদের প্রতি অসন্তষ্ট হবোনা'।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আহমদ, নেসায়ী সংকলিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন আল্লামা সয়ুতী (রঃ)। এই হাদীসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

من احب لقاء الله احب الله لقائه الحديث

'যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের মোলাকাতকে পছন্দ করে, আল্লাহ পাকও তার মোলাকাতকে পছন্দ করেন'।

সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমরা সকলেই মৃত্যুকে অপছন্দ করি, তিনি এরশাদ করলেন, বিষয়টি মৃত্যুকে অপছন্দ করা নয়; বরং যখন কোন মোমেনের নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সুসংবাদ দাতা ফেরেশতা তার নিকট আসে এবং তার জন্যে যে সব নেয়ামত রয়েছে তার সুসংবাদ দান করে। তখন ঐ ব্যক্তি আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হওয়াকে সর্বাধিক পছন্দ করে, আর তাই আল্লাহ পাকও তার হাযিরীকে পছন্দ করেন।

পক্ষান্তরে, কোন পাপীষ্ঠ ব্যক্তির নিকট যখন মৃত্যু হাযির হয় তখন আল্লাহ পাকের দরবার থেকে ফেরেশতা এসে তার পরিণতি সম্পর্কে তাকে অবহিত করে, এমন অবস্থায় সে আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হওয়া অপছন্দ করে, তাই আল্লাহ পাকও এমন ব্যক্তির হাযিরীকে অপছন্দ করেন।[১]

১। তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪০০

জান্নাতবাসীদের আপ্যায়ন

জান্নাতে নেককার মোমেনদের আপ্যায়নের যে অসাধারণ ব্যবস্থা হবে তার বিস্তারিত বিবরণ স্থান পেয়েছে হাদীস শরীফে, এ পর্যায়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবেনা।

প্রথমতঃ লক্ষ্যণীয় বিষয় এই, স্বয়ং আল্লাহ্ পাক হবেন মেজবান, আর জান্নাতীগণ হবেন তাঁর মেহমান অতএব, মেহমানদারীর যে শান হবে তা শুধু বর্ণনাতীতই নয়; বরং কল্পনাতীতও।

এবনে আবিদ দুনিয়া এবং বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমরা জান্নাতে যখনই কোন পাখী দেখে তার গোশ্ত খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে তখন সঙ্গে সঙ্গে তা ভাজা গোশ্ত হয়ে তোমাদের সম্মুখে এসে পড়বে।

হযরত আবু উমামা (রাঃ) বর্ণনা করেন, কোন জান্নাতী ব্যক্তি যখনই পাখীর গোশ্ত খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে তখনই উড়ন্ত পাখী তার দস্তরখানে আহার্য হিসেবে এসে পড়বে। কিন্তু সেখানে অগ্নিও থাকবেনা, ধোঁয়াও থাকবেনা। জান্নাতবাসীগণ সে পাখীর গোশ্ত পেট ভরে আহার করবে, এরপর পাখীটি পুনরায় উড়ে চলে যাবে।

তিরমিজী এবং বায়হাকী আরও একখানি হাদীস সংকলন করেছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, জান্নাতে যদি কোন মোমেন ব্যক্তির এ আকাঙ্ক্ষা হয় যে এখানেও তার সন্তান-সন্ততি হোক, আল্লাহ্ পাক তাকে ঘন্টা খানেকের মধ্যেই সন্তান দান করবেন।[১]

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-২৮৮

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ
صَالِحًا وَّقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَ
لَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ
عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا
يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ
فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ
وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ
الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ
عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ﴿٣٨﴾ السجدة

তরজমা

(৩৩) সে ব্যক্তির চেয়ে উত্তম কথা কার? যে মানুষকে আল্লাহ পাকের দিকে আহবান করে এবং সৎ কাজ করে আর বলে, 'নিশ্চয় আমি মুসলমানদের (আত্মসমর্পণকারীদের) অন্তর্ভুক্ত'।

(৩৪) ভাল ও মন্দ সমান হতে পারেনা, মন্দের জবাবে এমন কথা বল যা তার চেয়ে উত্তম, এতে তুমি দেখতে পাবে যে তোমার এবং যার মধ্যে শত্রুতা রয়েছে সে তোমার ঘণিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেছে।

(৩৫) আর এ সৌভাগ্য শুধু তারাই লাভ করতে পারে, যারা সবর অবলম্বন করে, আর একমাত্র পরম সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরাই এ গৌরব অর্জন করতে পারে।

(৩৬) আর শয়তান যদি তোমাকে প্ররোচনা দেয় তবে তুমি আল্লাহ পাকের আশ্রয় গ্রহণ কর, নিশ্চয় তিনি সব কিছু শ্রবণ করেন, সব কিছু জানেন।

(৩৭) আর তাঁর নিদর্শন সমূহের মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র, তোমরা সূর্য ও চন্দ্রকে সেজদা করোনা, সেজদা কর আল্লাহ পাককে, যিনি সৃষ্টি করেছেন এসবগুলোকে, যদি তোমরা তাঁরই বন্দেগী কর।

(৩৮) তবুও যদি কাফেররা অহংকার করে, তবে (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালকের নিকট যারা রয়েছে, তারা তো দিন রাত তাঁর পবিত্র মহিমা ঘোষণা করে এবং তারা ক্লান্তিও বোধ করেনা।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে নেককার মোমেনদের কথা বলা হয়েছে, যারা ঈমান আনয়নের পর আজীবন ঈমানের উপর অটল অবিচল থাকে এবং কখনও আল্লাহ পাকের নাফরমানীতে লিপ্ত হয়না, এরপর তাদের জন্যে একাধিক নেয়ামতের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

আর এ আয়াতে মোমেনদের একটি উন্নত আদর্শ তথা বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা রয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ

'সে ব্যক্তির চেয়ে উত্তম কথা কার? যে মানুষকে আল্লাহ পাকের দিকে আহবান করে'।

অর্থাৎ মোমেনগণ শুধু নিজেরাই আল্লাহর পথে থাকেনা এবং নিজেদের নাজাতের ব্যবস্থা করেই তৃপ্ত হয়না; বরং অন্যদেরকেও নাজাতের পথে আনার জন্যে সচেষ্ট হয়, তাই তারা মানুষকে আল্লাহ পাকের দিকে, তাঁর প্রতি ঈমান আনয়নের পথে আহবান করে, নিঃসন্দেহে এটি নেককার মোমেনেরই বৈশিষ্ট্য। এজন্যেই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, 'সে ব্যক্তির চেয়ে উত্তম কথা কার? যে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহবান করে'। অতএব যে এ দায়িত্ব পালন করে সে উত্তম ব্যক্তি, তার একথা উত্তম এবং তার এ কাজও উত্তম।

وَعَمِلَ صَالِحًا

অর্থাৎ সে শুধু উত্তম কথাই বলেনা, আর সে মানুষকে শুধু উত্তম কাজের দিকেই ডাকেনা; বরং নিজেও সৎ কাজ করে শুধু তাই নয়, সুস্পষ্ট ভাষায় সে ঘোষণা করেঃ আমি একজন মুসলমান, "আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণকারী"।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, মোহাম্মদ এবনে সিরীন ও সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, এ আয়াত দ্বারা স্বয়ং হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, কেননা তিনিই সমগ্র বিশ্ব মানবকে আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নের আহবান জানিয়েছেন, তিনিই সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল।

হাসান (রঃ)-এর মতে, এ আয়াত দ্বারা সে মোমেনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যে মানুষকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানিয়েছে, নিজেও সৎ কাজ করেছে এবং নিজেকে মুসলমান বলে পৃথিবীতে প্রকাশ করেছে।

উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমার মনে হয় এ আয়াত নাযিল হয়েছে মোয়াজ্জেনদের সম্পর্কে। আল্লাহ্ পাকের দিকে ডাক দেয়ার তাৎপর্য হল আযান দেয়া আর وعمل صالحا (যে সৎ কাজ করেছে) এর অর্থ হল, আযান ও একামতের মধ্যে যে দু' রাকাআত নামাজ পড়েছে।

কায়েস এবনে হাজেমও একথাই বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে সৎ কাজ করার তাৎপর্য হল আযান ও একামতের মাঝখানে নামাজ আদায় করা।

হযরত মা'কাল এবনে ইয়াসার (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, প্রত্যেক দু' আযানের মধ্যে (আযান ও একামতের মধ্যে) নামাজ রয়েছে, কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আযান ও একামতের মধ্যে যে দোয়া করা হয় তা ফেরত দেয়া হয়না। (আবু দাউদ, তিরমিজী)

আযানের ফজিলত ও মাহাত্ম

হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কেয়ামতের দিন মোয়াজ্জেনের গর্দান সবচেয়ে উঁচু হবে। (মুসলিম শরীফ)

হযরত আবু সায়ীদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মোয়াজ্জেনের (আযানের) আওয়াজ যত দূর যাবে যত জ্বীন, মানুষ বা জীব-জন্তু তা শ্রবণ করবে, কেয়ামতের দিন সকলেই তার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। (বোখারী শরীফ)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ইমাম জিম্মাদার, মোয়াজ্জেন আমানতদার, হে আল্লাহ! ইমামদেরকে হেদায়েত কর, আর মোয়াজ্জেনদেরকে মাগফেরাত দান কর। (আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিজী)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সওয়াবের আশায় সাত বছর যাবত আযান দেয় তার জন্যে দোযখ থেকে নাজাতের ঘোষণা লিপিবদ্ধ করা হয়। –(তিরমিজী, এবনে মাজা, আবু দাউদ)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তিন ব্যক্তি জান্নাতের উচ্চ স্থানে থাকবে (১) সেই গোলাম যে আল্লাহ পাকের হক্ব আদায় করে এবং তার মণিবের দায়িত্বও পালন করে (২) সে ব্যক্তি যে মানুষের ইমামতী করে এবং লোকেরাও তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে। (৩) সে ব্যক্তি যে দিনে রাতে পাঁচবার আযান দেয়। (তিরমিজী)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যেখান পর্যন্ত মোয়াজ্জেনের আযান যায়, তার মাগফেরাত করা হয় এবং সব কিছু তার জন্যে সাক্ষী হয়, আর যারা নামাজে হাযির হয়, তাদের এক নামাজে পঁচিশটি নামাজের সওয়াব লিপিবদ্ধ হয়, আর দু' নামাজের মধ্যে যে গুনাহ হয় তা মাফ করা হয়। (আহমদ, আবু দাউদ, এবনে মাজা)

হযরত সাহল এবনে সাদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, দুটি কথা যা ফেরত দেয়া হয়না, অথবা তিনি বলেছেন, খুব কমই ফেরত দেয়া হয়, আযানের সময়ের দোয়া এবং জেহাদের সময়ের দোয়া, যখন আমরা যুদ্ধরত হই।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি বার বছর আযান দেয় তার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব হয়, প্রত্যেক আযানের জন্যে ৬০টি নেকী লিপিবদ্ধ হয়, আর একামতের জন্যে ৩০টি নেকী লিপিবদ্ধ হয়।[১] (এবনে মাজা)

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ পর্যায়ে হযরত ওমর (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ যদি আমি মোয়াজ্জেন হতাম তবে আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হতো, আর সে অবস্থায় আমি রাত্রের নফল নামাজ এবং দিনের নফল রোজার জন্যেও এত ব্যাকুল হতাম না। আমি শুনেছি যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের মহান দরবারে মোয়াজ্জেনদের মাগফেরাতের জন্যে তিনবার দোয়া করেছেন, আমি আরজ করেছি, হুজুর আমাদেরকে আপনি দোয়াতে স্মরণ করলেন না? অথচ আমরা আজান জারী করার জন্যে জেহাদ করে থাকি। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ হ্যাঁ, কিন্তু হে ওমর!

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-১০, পৃষ্ঠা-৩৮৯-৯০

এমনও সময় আসবে যখন মোয়াজ্জেনের কাজটি নিতান্ত দরিদ্র এবং অনাথ লোকদের মধ্যে সীমিত হয়ে পড়বে। শোন হে ওমর! যাদের গোশ্ত এবং চর্ম দোযখের উপর হারাম মোয়াজ্জেনও তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।[১]

এ আয়াতে সে সব লোকের প্রশংসা করা হয়েছে যারা মানুষকে আল্লাহ পাকের দিকে আহবান করে এবং যারা সৎ কাজ করে আর একথা জানিয়ে দেয় যে, আমি একজন মুসলমান।

এ পর্যায়ে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতের মর্ম অনুযায়ী যাঁরা মানুষকে আল্লাহ পাকের দিকে আহবান করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন স্বয়ং হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। সেজন্যে কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এ আয়াত দ্বারা তাঁকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এ মত পোষণ করতেন হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), তাঁর অন্য একটি মত হলো, এর দ্বারা সাহাবায়ে কেরামকেও উদ্দেশ্য করা হয়েছে, আর যেহেতু মোয়াজ্জেনগণ মানুষকে নামাজের জন্যে আহবান করে থাকেন, সেজন্যে উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) এবং একরামা (রঃ), মুজাহেদ (রঃ) এবং কায়েস এবনে আবি হাজেম বলেছেন, এ আয়াত মোয়াজ্জেনদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। তবে অধিকাংশ তফসীরকারগণ এ মত পোষণ করেন, এ আয়াত সে সব লোকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে যারা মানুষকে আল্লাহ পাকের দিকে ডাকে। এ মত পোষণ করেন হাসান বসরী (রঃ), মোকাতেল (রঃ) এবং অন্যান্য অনেক তফসীরকারগণ।

মূলতঃ মোয়াজ্জেনগণের ফজিলত ও মাহাত্ম সর্বত্র স্বীকৃত। হাদীস শরীফে এর বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে যার কিছুটা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু আলোচ্য আয়াতে শুধু মোয়াজ্জেন নয়; বরং যে কেউ মানুষকে আল্লাহ পাকের বন্দেগীর দিকে ডাকে, তার ফজিলতের কথাই বর্ণিত হয়েছে। তিনি পীর ও মুর্শেদও হতে পারেন, দ্বীনি কিতাবের গ্রন্থকারও হতে পারেন, ওয়ায়েজ বা মোদাররেসও হতে পারেন, ন্যায় বিচারক, মুজাহেদও হতে পারেন, যদি কেউ মানুষকে ইসলামের দিকে আন্তরিকভাবে আহবান করে এবং নিজেও ইসলামী বিধি-নিধানের উপর আমল করে তবে সে-ই হলো সর্বোত্তম ব্যক্তি, তার মর্তবা হবে সর্বোচ্চে।[২]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৪ পৃষ্ঠা-৭৮
২। তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড-২৪, পৃষ্ঠা-১২২
তফসীরে কবীর খন্ড-২৭, পৃষ্ঠা-১২৫
তফসরি আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪০০
তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৯০৯

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, তারাই হলেন আউলিয়া আল্লাহ, আল্লাহ পাকের দরবারে তাঁরাই হলেন সর্বাধিক পছন্দনীয় এবং প্রিয়। তাঁরা আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন এবং অন্যদেরকে আনুগত্যের জন্যে আহবান করেছেন এবং সর্বদা নেক আমল করেছেন, নিজের মুসলমান হওয়ার কথা সর্বত্র ঘোষণা করেছেন, পৃথিবীতে তাঁরাই হলেন আল্লাহ পাকের প্রকৃত প্রতিনিধি।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, যারা আল্লাহর দিকে মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে সর্বোত্তম হল নবী রসূলগণের দাওয়াত। এরপরের স্থান হলো ওলামায়ে কেরামের দাওয়াতের, কেননা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

العلماء ورثة الانبياء

'আলেমগণ হল নবীগণের উত্তরাধিকারী'। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেনঃ

علماء امتى كانبياء بنى اسرائيل

'আমার উম্মতের ওলামায়ে কেরাম বনী ইসরাঈলের নবীগণের ন্যায়'।

যেহেতু আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, তাঁর পর অন্য কোন নবীর আগমনের আর কোন সম্ভাবনা নেই, তাঁর দ্বীনের প্রচারের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে উম্মতের ওলামায়ে কেরামের প্রতি, তাই ওলামায়ে কেরামের দাওয়াতী কর্মসূচীই হলো উত্তম। আর এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাকের দিকে দাওয়াত বা আহবান করা হলো সর্বোত্তম কাজ আর যা সর্বোত্তম কাজ তা ওয়াজিব বা অবশ্য কর্তব্য। অতএব, মানুষকে আল্লাহর দিকে আহবান করা অবশ্য কর্তব্য।[২]

হাকীমুল উম্মত হযরত মওলানা থানভী (রঃ) লিখেছেন, আল্লাহ পাকের দিকে আহবান করার পাশাপাশি সৎ কাজ করার যে নির্দেশ রয়েছে তা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, শুধু ভাল কথা বললেই হবেনা; বরং ভাল কাজও করতে হবে, যদি শুধু ভাল কথাই বলা হয়, সে অনুযায়ী কাজ না করা হয় তবে তাতে বরকত হয় না।[৩]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), পারা-২৪ পৃষ্ঠা-৭৮
২। তফসীরে কবীর খন্ড-২৬, পৃষ্ঠা-১২৫-২৬
৩। তফসীরে বয়ানুল কোরআন, পৃষ্ঠা-৯২৮

وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

(আর সে বলে, নিশ্চয় আমি আল্লাহ্ পাকের অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত।)

কখনও কখনও দেখা যায়, যদি ওয়াজ বয়ান ভাল হয় এবং নেক আমলও হতে থাকে তখন মানব অন্তরে তার কুপ্রবত্তির কারণে অহংকার সৃষ্টি হয়, সে নিজেকে অন্যদের চেয়ে বড় মনে করতে থাকে, তার এলম, আমল এবং দাওয়াতী কর্মসূচীর বড়াই করতে থাকে। ঐ ব্যক্তির মনের এ অবস্থা তার সমূহ ধ্বংসের কারণ হয়, এজন্যে আলোচ্য আয়াতের সর্বশেষ বাক্যে এ ব্যাধির চিকিৎসা স্বরূপ বিনয় অবলম্বনের শিক্ষা দেয়া হয়েছে, অর্থাৎ যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে এবং নিজেও সৎ কাজ করে, সে একথা বলে যে, আমি আল্লাহ্ পাকের অগণিত অনুগত গোলামদের অন্যতম, আল্লাহ্ পাকের অনুগত লোকদের সংখ্যা অগণিত, আমিও তাদের মধ্যে একজন। আল্লাহ্ পাক তৌফিক দান করেছেন বলেই আমি তাঁর অনুগত হতে পেরেছি। এটি আমার কোন গুণ নয়; তাঁরই তৌফিক, তাঁরই দয়া।

আয়াতের মর্মকথা

আলোচ্য আয়াতের মর্মকথা হলো তিনটি বিষয়ঃ

১. মানুষকে আল্লাহ্ পাকের দিকে আহবান করা, সত্যের নির্দেশ দেয়া এবং অসত্য থেকে বিরত রাখা অবশ্য কর্তব্য।

২. কিন্তু এ কর্তব্য পালনের পাশাপাশি নিজেও সৎ কাজ করতে হবে। মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ দেয়া ভাল কাজ, কিন্তু যে পর্যন্ত নির্দেশ দাতা নিজে আমল না করে বরং শুধু অন্যকেই আহবান করে তার সে আহবান ফলপ্রসূ হয়না।

৩. মানুষকে আল্লাহ্ পাকের আনুগত্যের দিকে আহবান করা তথা দাওয়াতী দায়িত্ব পালন করা এবং সর্বদা নেক আমল করার কারণে কখনও আত্মপ্রসাদ লাভ করা উচিত নয়, কখনও মনে যেন দম্ভ অহংকার সৃষ্টি না হয়, নিজেকে অন্যদের চেয়ে বড় এবং ভাল মনে করা সমীচিন নয়; বরং বিনীত ভাবে একথা প্রকাশ করা উচিত যে, আমিও আল্লাহ্ পাকের অনুগত বন্দাদের একজন।

বর্তমান যুগের কর্তব্য

যেভাবে মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় কাফেররা ইসলামের বিরোধিতা করেছিল, আর এজন্যে তখন মানুষকে ইসলামের প্রতি আহবান জানানো অত্যন্ত বড় কাজ ছিল, বর্তমানে ক্ষেত্র বিশেষে মুসলমান নামধারী লোকেরাই ইসলামের বিরোধিতা করে।

ইসলাম একটি পূর্ণ, পরিণত জীবন বিধান, জীবনের সকল অঙ্গন এর আওতাধীন রয়েছে, জীবনের কোন স্তর বা দিক ইসলামের বাইরে নয়, যদি কোন ব্যক্তি তার জীবনের কোন দিককে ইসলামী বিধি-নিষেধের বাইরে রাখতে চায়, সে পরিপূর্ণ মুসলমান হতে পারেনা। এজন্যেই কোরআনে করীমে আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً

'হে মোমেনগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর'।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, বর্তমান যুগে কোন কোন লোককে দেখা যায় রাষ্ট্রীয় জীবনে তারা ইসলামের বিধি-নিষেধ প্রয়োগের কথা স্বীকার করতে রাজী নন, মানব জীবনের এ অঙ্গনকে ইসলামের বিধি-নিষেধ থেকে দূরে রাখতে ইচ্ছুক। এ-তো হলো বিশ্বাসগত ব্যাপার, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বিশ্বাস ঠিকই আছে কিন্তু কার্যতঃ তার বাস্তবায়ন অনুপস্থিত। যেমন সুদ, ঘুষ প্রভৃতি ইসলামের দৃষ্টিতে ঘৃণ্য এবং অবৈধ, কিন্তু এ বিশ্বাস থাকা সত্বেও সুদ এবং ঘুষের আদান-প্রদান অহরহ চলছে। এতদ্ব্যতীত, নারী সমাজের ব্যাপারে ইসলামের বিধি-নিষেধ সর্বজন-বিদিত, তাদের পর্দায় রাখার ব্যাপারে কোরআনে করীমের ঘোষণা অত্যন্ত সুস্পষ্ট, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ

(সূরা আহযাব, আয়াত-৩৩)

'এবং তোমরা তোমাদের নিজ নিজ ঘরে অবস্থান কর আর প্রাচীন জাহেলিয়া যুগের ন্যায় নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবেনা, তোমরা নামাজ কায়েম করবে এবং যাকাত আদায় করবে এবং আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের অনুগত থাকবে'।

বর্তমান যুগে এসব নির্দেশ অহরহ লঙ্ঘন করা হয়। ইসলামের এসব বিধান অমান্য করতে কারোই কোন প্রকার ভয় হয়না, অথচ এর অবশ্যম্ভাবী শোচনীয় পরিণতি এখন সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। নারীকে বেপর্দা করে লাঞ্ছিত অপমানিত করা হয়েছে এবং এতে করে সমাজে ব্যভিচার বৃদ্ধি পেয়েছে। দেখা দিয়েছে নৈতিক অবক্ষয়। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ব্যাভিচারের সময় ব্যাভিচারী, মদ্যপানের

সময় মদ্যপায়ী এবং চুরি করার সময় চোর মোমেন থাকেনা। মানুষ যখন এমনি অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকে তখন তার ঈমান দূরে সরে পড়ে। অন্য একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ গুপ্তস্থান ও রসনার পাপই মানুষকে সবচেয়ে বেশী দোযখের দিকে নিয়ে যাবে। অর্থাৎ ব্যভিচার ও মিথ্যাবাদিতা মানুষের জন্যে কঠিন শাস্তির কারণ হবে।

হযরত মায়মুনা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ এ উম্মত সর্বদা সুখে-শান্তিতে থাকবে, যতদিন তাদের মধ্যে অবৈধ সন্তান জন্মের হার বৃদ্ধি না পাবে। কিন্তু যখন অবৈধ সন্তান জন্মের হার বেড়ে যাবে তখন সমগ্র উম্মতের উপরই আযাব নাযিল হবার আশঙ্কা দেখা দেবে। (বোখারী শরীফ)

অন্য একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে জনপদে সুদখোরী এবং ব্যভিচার প্রকাশ্যে হতে থাকে তবে মনে করবে সে জনপদের অধিবাসীরা নিজেদেরকে আল্লাহর গজবে পতিত করেছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেনঃ

متى يفشو الزنا يكثر الهزل

'যখন কোন সমাজে ব্যাভিচার বেড়ে যাবে তখন হত্যাকান্ডও বেড়ে যাবে'।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, যে সম্প্রদায়ের মধ্যে খেয়ানত প্রাধান্য লাভ করবে, আল্লাহ পাক তাদের অন্তরে দুশমনের ভয় সৃষ্টি করে দেবেন। আর যে সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যভিচার বেড়ে যাবে, তাতে হত্যাকান্ড বেড়ে যাবে। আর যে সম্প্রদায় ওজনে ফাঁকি দেবে তাদের রিয্ক কমে যাবে। আর যারা সত্য বিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, তাদের মধ্যে হত্যাকান্ড বেড়ে যাবে। আর যারা প্রতিশ্রুতি বিনষ্ট করবে, অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে, আল্লাহ পাক তাদের উপর দুশমনকে চড়াও করে দেবেন।

লক্ষ্যণীয়, আল্লাহ পাকের আযাবের যে সব কারণ ও উপকরণের কথা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন তার কোন্‌টি বর্তমান সমাজকে বিষাক্ত সর্পের ন্যায় দংশন করেনি? বর্তমান অবস্থার সঠিক মূল্যায়ন করা হলে এ সত্য দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হবে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যেন এ যুগের জন্যেই এসব সতর্কবাণী উচ্চারণ করে গেছেন।

বস্তুতঃ বর্তমানে বর্বরতার যুগের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটছে- একথা আদৌ অত্যুক্তি নয়। কোরআনে করীমে আল্লাহ পাক এ সম্পর্কে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ

করেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এরশাদ হয়েছেঃ

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖٓ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْيُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

'অতএব, যারা আল্লাহ্ পাকের বিধানের বিরোধিতা করে, তাদের ভয় করা উচিত যে, তাদের উপর যে কোন বিপদ বা কঠিন শাস্তি আসতে পারে'।

বর্তমান যুগে মুসলিম জাতির উপর যে দুর্গতি নেমে এসেছে, এটি সে বিপদই যে সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

অতএব, বর্বরতার যুগে মানুষকে আল্লাহ্ পাকের দিকে আহবান করা যেমন উত্তম এবং অবশ্য কর্তব্য ছিল, ঠিক তেমনি আজো তা সর্বাধিক উত্তম ও অবশ্য কর্তব্য। প্রতিটি মুসলমানের বিশেষতঃ ওলামায়ে কেরামের জন্যে এ কর্তব্য অবশ্য পালনীয়। আর এর ফজিলত ও মাহাত্ম বর্ণনাতীত।

وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ط اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ

'ভাল ও মন্দ সমান হতে পারেনা, মন্দের জবাবে এমন কথা বল, যা তার চেয়ে উত্তম, এতে তুমি দেখতে পাবে যে, তোমার এবং যার মধ্যে শত্রুতা রয়েছে সে তোমার ঘণিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেছে'।

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাকের দিকে আহবান করার নির্দেশ রয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি অত্যন্ত মহান এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ, কিন্তু তা সহজ নয়, অতীব জটিল এবং এ পথ কন্টকাকীর্ণ, যুগে যুগে যারাই মানুষকে সত্যের দিকে আহবান করেছেন তাঁদের বিরোধিতা করা হয়েছে, তাঁদের উপর জুলুম-অত্যাচার করা হয়েছে, সমাজের দুবৃত্তরা তাঁদের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হয়েছে এমন সময়ের কর্মপন্থা নির্দেশ করা হয়েছে আলোচ্য আয়াতে, এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ

'ভাল ও মন্দ সমান হতে পারেনা, মন্দের জবাবে এমন কথা বল যা তার চেয়ে উত্তম, এতে তুমি দেখতে পাবে যে তোমার এবং যার মধ্যে শত্রুতা রয়েছে সে তোমার ঘণিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেছে'।

আত্মসংযম ও সবর অবলম্বন

অর্থাৎ সত্যের প্রতি আহবান জানানোর পর যখন অপর পক্ষ থেকে মন্দ ব্যবহার শুরু হয় তখন আত্মসংযম এবং ধৈর্য ধারণ করা একান্ত কর্তব্য। কেউ মন্দ কথা বললে বা মন্দ আচরণ করলে তার প্রতি-উত্তরে ভাল ব্যবহার করতে হবে, গালি দিলে তার জন্যে দোয়া করতে হবে, ক্ষমা ও ঔদার্য্যের আদর্শ গ্রহণ করতে হবে, যেখানে চরম অন্যায়, জুলুম-অত্যাচার করা হয় সেখানেও উদার ব্যবহারই একান্ত কাম্য। কেননা, ভাল ও মন্দ কখনো সমান হতে পারেনা, যে মন্দ তার কাছে ভাল ব্যবহার আশা করা যায়না। আর যে ভাল তার পক্ষ থেকে মন্দ ব্যবহার কাম্য নয়। হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি তোমার ব্যাপারে আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী করে, তুমি তার ব্যাপারে আল্লাহ্ পাকের হুকুম পালন কর। এর চেয়ে বড় কল্যাণকর কাজ আর কিছুই নেই।

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, মোমেনদের প্রতি আদেশ হলো ক্রোধের সময় সবর করবে। অন্যরা যখন মূর্খতার পরিচয় দেবে মোমেনরা তখন ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দেবে, অপরের অন্যায় আচরণকে ক্ষমা করবে, যারা ইসলামের এ অমোঘ নীতি গ্রহণ করে তারা শয়তানের আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকে, আর তাদের শত্রু হয়ে যায় বন্ধু।

وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ۚ وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ

অর্থাৎ শত্রুর মন্দ আচরণের বিনিময়ে ভাল ব্যবহার করা সকলের পক্ষে সহজও নয় সম্ভবও নয়, এ উন্নত আদর্শ গ্রহণ করা এবং এ কৃতিত্ব অর্জন করা শুধু তাঁদের পক্ষেই সম্ভব যারা সবর অবলম্বন করে, যারা ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দেয়, যারা উদারতা ও মহানুভবতার স্বাক্ষর রাখে আর এ গুণাবলী অর্জন করা শুধু তাদের পক্ষ্যেই সম্ভব, যারা ভাগ্যবান, যাদের অন্তর প্রশস্ত, উদারতা যাদের বৈশিষ্ট্য, সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যাদের সংকল্প, ভাগ্য যাদের সুপ্রসন্ন, শুধু এমন লোকেরাই এমন গুণের অধিকারী হয়ে থাকে।

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

'আর শয়তান যদি তোমাকে প্ররোচনা দেয়, তবে তুমি আল্লাহ্ পাকের আশ্রয় গ্রহণ কর, তিনি সব কিছু শ্রবণ করেন, সব কিছু জানেন'।

পূর্ববর্তী আয়াতে মানুষের মন্দ আচরণ থেকে আত্মরক্ষার পথ-নির্দেশ করা হয়েছে। আর এ আয়াত থেকে ইবলিস শয়তানের প্ররোচনা থেকে নিরাপত্তা লাভের পন্থা নির্দেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ সত্যের আহবানে আত্মনিয়োগ করার পর ইবলিস শয়তান যদি কোন প্রকার প্ররোচনা দিতে চায় তবে সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ পাকের আশ্রয় গ্রহণই হলো আত্মরক্ষার একমাত্র পথ, কেননা আল্লাহ্ পাক সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত। এসব ক্ষেত্রে কখনও শয়তান মানুষকে শত্রু থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের প্ররোচনা দেয় কিন্তু প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করা হলে হেদায়েত সম্ভব হয়না। প্রতিশোধ গ্রহণের মাধ্যমে শত্রুকে ধ্বংস করা সম্ভব হয়, কিন্তু এতে কোন কৃতিত্ব নেই, প্রকৃত কৃতিত্ব শত্রুকে মিত্রতে পরিণত করায়, পথভ্রষ্টকে পথে আনায়, আর এ উদ্দেশ্য সফল করতেই পবিত্র কোরআন সবর অবলম্বনের এবং উদারতা ও মহানুভবতার শিক্ষা দেয়।

اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক সর্বশ্রোতা। তিনি সকলের দোয়া শ্রবণ করেন, তিনি মহাজ্ঞানী, তিনি সকলের নিয়ত এবং যোগ্যতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক বিশেষ ভাবে শয়তানের ওয়াস ওয়াসা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে আল্লাহ্ পাকের আশ্রয় গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন, এর তাৎপর্য এই, যারা আল্লাহ্ পাকের দিকে মানুষকে আহবান করে তাদের কর্তব্য হলো আল্লাহ্ পাকের দরবারে এ দোয়া করা যেন তিনি শয়তানী প্ররোচনা থেকে রক্ষা করেন। ধৈর্য ও সহনশীলতা, উদারতা মহানুভবতা এবং সংকল্পের দৃঢ়তার গুণ অর্জনের তৌফিক দান করেন। মানুষ মুখে যা বলে, তা সবই আল্লাহ্ পাক শ্রবণ করেন, আর মানুষের মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠে যেসব ভাবনার অবতারণা হয় সে সম্পর্কেও আল্লাহ্ পাক সম্পূর্ণ অবগত থাকেন, এমন অবস্থায় যখন কোন ব্যক্তি মানুষকে আল্লাহ্ পাকের দিকে আহবান করে এবং তাঁর সাহায্য কামনা করে তখন আল্লাহ্ পাক তাকে সাহায্য করেন, আল্লাহ্ পাক তাকে শয়তানের প্ররোচনা থেকে রক্ষা করেন।

وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ

'আর তাঁর নিদর্শন সমূহের মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্য ও চন্দ্রকে সেজদা করোনা, সেজদা কর আল্লাহ পাককে, যিনি সৃষ্টি করেছেন এসব কিছুকে যদি তোমরা তাঁরই বন্দেগী কর'।

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাকের দিকে আহবানের নির্দেশ দিয়ে এ পথের সম্ভাব্য অন্তরায় সমূহ দূরীভূত করার পথ-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আর এ আয়াত থেকে আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরত হেকমতের নিদর্শন সমূহের উল্লেখ করা হয়েছে। রাত ও দিনের পরিবর্তন নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরত হেকমতের নিদর্শন, এমনিভাবে চন্দ্র-সূর্যও আল্লাহ পাকের অন্যতম বিস্ময়কর নিদর্শন। আল্লাহ পাকের প্রতি আহবানের ক্ষেত্রে এসব নিদর্শনের উল্লেখ বিশেষভাবে তাৎপর্যবহ। যথা নিয়মে, যথা সময়ে দিবা-রাত্রির পরিবর্তন দেখে মানুষ আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, এমনিভাবে চন্দ্র-সূর্যের নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিভ্রমণ এবং নির্ধারিত সময়ে উদয় ও অস্ত– এসব আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরতের মহিমা ব্যতীত আর কিছুই নয়। অতএব, পবিত্র কোরআন বুদ্ধিমান মানুষ মাত্রের প্রতি এ আহবান করছে যে, এসব কিছু আল্লাহ পাকের সৃষ্টি মাত্র এবং তাঁর প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত, অতএব তোমরা সৃষ্টির প্রতি মাথা নত করোনা, এদেরকে সেজদা করোনা; বরং যিনি এসব কিছু সৃষ্টি করেছেন তাঁকে সেজদা কর এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কর।

দ্বিতীয়তঃ যিনি চন্দ্র-সূর্য এবং নক্ষত্রপুঞ্জকে সৃষ্টি করেছেন, সেগুলোকে পরিচালনা করছেন এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীকে আলোকিত করছেন, তিনি ইচ্ছা করলে মানব মনের অন্ধকারও দূর করতে পারেন, নবুওয়্যতের আকাশের দীপ্তিমান সূর্য হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের আলোকে মানব মনকে আলোকিত করতে পারেন, এটি তাঁর শুভ-দৃষ্টি তথা তৌফিকেরই ব্যাপার।

তৃতীয়তঃ যে সব পথভ্রষ্ট লোকেরা চন্দ্র-সূর্যকে পূজা করে তারা বলে থাকে যে, আমরা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই তা করছি। আলোচ্য আয়াতে তাদের এ ভুল ধারণা নিরসন-কল্পে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর সৃষ্টিকে সেজদা করোনা, বরং শুধু এক আল্লাহ পাককেই সেজদা কর। আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কিছুকে সেজদা করা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ব্যতীত আর কিছুই নয়, আর বিদ্রোহীদের শাস্তি অবধারিত। এজন্যে পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ۩ السجدة

'তবুও যদি কাফেররা অহংকার করে তবে (হে রসূল!) জেনে রাখুন, আপনার প্রতিপালকের নিকট যারা রয়েছে, (ফেরেশতাগণ) তারা তো দিনরাত তাঁর পবিত্র মহিমা ঘোষণায় রত হয়েছে, আর তারা ক্লান্তিও বোধ করেনা'।

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম বিস্ময়কর কুদরত হেকমত দেখার এবং এত করে বোঝানোর পরও কাফেররা যদি অহংকার করে, তৌহীদের মহাসত্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়, তবে (হে রসূল!) এতে আল্লাহ পাকের কিছুই যায় আসেনা। তারা এভাবে শুধু নিজেদেরই সর্বনাশ ডেকে আনে। আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য ফেরেশতাগণ তাঁর পবিত্র মহিমা ঘোষণায় সর্বক্ষণ মশগুল রয়েছে, আল্লাহর ওলিগণ তাঁর এবাদত-বন্দেগীতে নিরত রয়েছে, তারা কখনও ক্লান্তি বোধ করেনা।

অহংকার যাদেরকে আল্লাহর বন্দেগীতে বাধা দেয়, তাদের ধ্বংস অনিবার্য।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ
اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ؕ اِنَّ الَّذِيْٓ اَحْيَاهَا لَمُحْىِ الْمَوْتٰى ؕ اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ
شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٣٩﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ؕ
اَفَمَنْ يُّلْقٰى فِى النَّارِ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ يَّاْتِيْٓ اٰمِنًا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِعْمَلُوْا مَا
شِئْتُمْ ۙ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٤٠﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ لَمَّا
جَآءَهُمْ ۚ وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ ﴿٤١﴾ لَّا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ
وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ ؕ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ﴿٤٢﴾

তরজমা

(৩৯) এবং আল্লাহ পাকের একটি নিদর্শন হলো এই, তুমি জমীনকে দেখতে পাও শুষ্ক, উষর, এরপর যখন আমি তার উপর বারি বর্ষণ করি তখন তা সতেজ হয়ে ওঠে এবং বাড়তে থাকে। নিশ্চয় যিনি ভূমিকে জীবনী-শক্তি দান করেন, তিনিই মৃতকেও জীবিত করবেন। নিশ্চয় তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

(৪০) নিশ্চয় যারা আমার আয়াত সমূহকে বিকৃত করে তারা আমার নিকট গোপন থাকতে পারেনা। বল, যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে, সে

ভাল? অথবা যে কেয়ামতের দিন নিরাপদে থাকবে। তোমাদের যা ইচ্ছা করতে থাক, নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তোমাদের কার্যাবলী লক্ষ্য করছেন।

(৪১) নিশ্চয় যারা তাদের নিকট কোরআনে করীম উপস্থিত হওয়ার পরও তা অস্বীকার করে (তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে)। আর নিশ্চয় তা এক মহিমময়, অসাধারণ গ্রন্থ।

(৪২) কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করতে পারেনা, সম্মুখ থেকেও নয় পশ্চাৎ থেকেও নয়, এ মহাগ্রন্থ প্রজ্ঞাময়, স্বয়ং প্রশংসিত আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আল্লাহ্ পাকের দিকে আহবানের কথা ছিল এবং এ পথে যে সব অন্তরায় সৃষ্টি হয়, তা দূরীভূত করার পন্থা নির্দেশ করা হয়েছে।

এ আয়াত থেকে আল্লাহ্ পাকের কুদরত হেকমতের এমন নিদর্শন সমূহের উল্লেখ রয়েছে, যার প্রতি লক্ষ্য করলে আল্লাহর দিকে আহবানকারী কখনো নিরাশ হয়না, এ পথ যত কন্টকাকীর্ণই হোক না কেন তার গতি কখনো শ্লথ হয়না, বরং সে এগিয়ে যায় পায়ে পায়ে মঞ্জিলের দিকে, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ط

'এবং আল্লাহ্ পাকের একটি নিদর্শন হলো, তুমি জমীনকে দেখতে পাও শুষ্ক, উষর, এরপর যখন আমি তার উপর বারি বর্ষণ করি তখন তা সতেজ হয়ে ওঠে এবং বাড়তে থাকে'।

বিশ্বস্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ পাক বিশাল-বিস্তৃত এ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তাঁর কুদরত অসীম, তাঁর দান অফুরন্ত, তাঁর একত্ববাদের, তাঁর কুদরতের, হেকমতের নিদর্শন অগণিত। লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, পৃথিবী যখন খরায় মৃত, শুষ্ক হয়ে পড়ে তখন আল্লাহ্ পাক পৃথিবীতে বারি বর্ষণ করেন, বৃষ্টির পানির স্পর্শ পেয়ে জমীনে তখন প্রাণের সঞ্চার হয়, পৃথিবী নব জীবন লাভ করে, সমগ্র সৃষ্টি জগৎ যেন সজীব এবং সতেজ হয়ে ওঠে। চারিদিকে দেখা যায় শুধু সবুজের মেলা। বিষয়টি একটু চিন্তা করলে যে সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়, তা হলো যেভাবে আল্লাহ্ পাক মৃত শুষ্ক জমীনকে নব জীবন দান করেন ঠিক তেমনি মৃত মানুষকেও তিনি জীবিত করবেন। এতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা-দ্বন্দের কোন অবকাশ নেই, তাই পরবর্তী আয়াতাংশে এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ الَّذِیْٓ اَحْیَاهَا لَمُحْیِ الْمَوْتٰی ط

'নিশ্চয় যিনি জমীনকে জীবনী শক্তি দান করেন, তিনি মৃতকেও জীবিত করবেন'। আর এটি তাঁর পক্ষে কোন কোন কঠিন কাজ নয়।

اِنَّهٗ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ

'নিশ্চয় তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান'।

অর্থাৎ জীবিত করার এবং মৃত্যুমুখে পতিত করার সর্বময় ক্ষমতা তাঁর রয়েছে। যেভাবে আল্লাহ পাক মৃত শুস্ক জমীনকে জীবন-শ্যামলিমায় পরিপূর্ণ করেন ঠিক তেমনি মৃত অন্তর সমূহকেও জীবিত করতে পারেন। এজন্যে যারা মানুষকে আল্লাহ পাকের দিকে আহবান করে তাদের কোন প্রতিকূল পরিবেশেই আল্লাহ পাকের রহমত থেকে নিরাশ হওয়া উচিত নয়। যে অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ, গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, আল্লাহ পাক তার অন্তরকে হেদায়েতের আলোকে উদ্ভাসিত করতে পারেন, তাকওয়া পরহেযগারী এবং আনুগত্যের গুণে গুণান্বিত করতে পারেন। কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময় এবং পরিতাপের বিষয় এই, আল্লাহ পাকের এসব নিদর্শন দেখেও মানুষ তাঁর প্রতি ঈমান আনেনা, তাঁর শোকর গুজার হয়না, তারা সঠিক পথ পরিহার করে বক্র পথে চলতে চায়, এমন অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ লোকদের জেনে রাখা উচিতঃ

اِنَّ الَّذِیْنَ یُلْحِدُوْنَ فِیْٓ اٰیٰتِنَا لَا یَخْفَوْنَ عَلَیْنَا ط

'নিশ্চয় যারা আমার আয়াত সমূহকে বিকৃত করে, তারা আমার নিকট গোপন থাকতে পারেনা'।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো যারা আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করে, তাঁর বিরোধিতা করে, আল্লাহ পাকের কালামের ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ অবগত। তাদের শাস্তি বিধানে তিনি সম্পূর্ণ সক্ষম, অতএব যারা আল্লাহ পাকের দিকে মানুষকে আহবান করে, তাদের কোন অবস্থাতেই নিরাশ হওয়া উচিত নয়। আল্লাহর অবাধ্য, নাফরমানরা যত বিরোধিতাই করুক না কেন, যখন তাদের উপর আল্লাহ পাকের আযাব আপতিত হবে তখন কেউ তাদেরকে রক্ষা করতে পারবেনা। আল্লাহ পাক তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছেন, আর এটি তাঁর হেকমত।

اَفَمَنْ یُّلْقٰی فِی النَّارِ خَیْرٌ اَمْ مَّنْ یَّاْتِیْٓ اٰمِنًا یَّوْمَ الْقِیٰمَةِ ط

'বল, যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে, সে ভাল? অথবা যে কেয়ামতের দিন নিরাপদে থাকবে'।

এবনুল মুনজের বশীর এবনে ফাতহের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে আবু জেহেল এবং হযরত আম্মার এবনে ইয়াসের (রাঃ) সম্পর্কে। আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আবু জেহেল এবং হযরত হামজা (রাঃ) সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

একথা সন্দেহাতীত রূপে বলা চলে, যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন নিরাপদে থাকবে, আল্লাহ্ পাকের রহমত ও মাগফেরাত লাভ করবে, তার চেয়ে উত্তম কেউ হতে পারেনা। কিন্তু একথাও সত্য, দুনিয়াতে ঈমান ও নেক আমল অর্জন না করে কেউ পর জীবনে উত্তম হতে পারেনা। পর জীবনের কল্যাণ এবং পরম সাফল্য লাভের জন্যে পূর্বশর্ত হলো, আল্লাহ্ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান এবং সৎ কাজ। আবু জেহেল ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনেনি এবং সৎ কাজও করেনি, অতএব তারা কখনো উত্তম হতে পারেনা।

হাদীস শরীফে রয়েছে, কবরে নেককার মোমেনদের সম্মুখে একটি অতি সুন্দর আকৃতি প্রকাশ পাবে, ঐ ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞাসা করবে, তুমি কে? সে জবাব দেবে,

انا عملك الصالح

(আমি তোমার নেক আমল)

আর পাপীষ্ঠ ব্যক্তির সম্মুখেও একটি আকৃতি প্রকাশ পাবে যা অত্যন্ত মন্দ এবং ভয়ংকর হবে, তাকে দেখে ঐ পাপীষ্ঠ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করবে, তুমি কে? সে বলবে,

انا عملك الخبيث

(আমি তোমার মন্দ কাজ)

বস্তুতঃ এ জীবনে আমল যেমন হবে পরকালে পরিণতি তেমনই হবে। আর এজন্যেই আয়াতের পরবর্তী অংশে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছেঃ

اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ ۙ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

'তোমাদের যা ইচ্ছা করতে থাক, নিশ্চয় আল্লাহ পাক তোমাদের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করছেন'।

অর্থাৎ হে পাপীষ্ঠরা! দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে যা ইচ্ছা করে নাও, মনের স্বাদ পূর্ণ করে নাও, আল্লাহ পাক তোমাদের সব কিছু দেখছেন, যথাসময়ে সব কিছুর বিচার করা হবে। কেয়ামতের দিন তোমরা দেখতে পাবে একজন দোযখের কঠিন শাস্তি ভোগ করছে, আরেকজন নিশ্চিন্ত অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করছে। তোমরাই বল এ দু'জনের মধ্যে কে উত্তম?

যারা দুনিয়াতে মন্দ কাজ করে তাদের শাস্তি অবধারিত, আর যারা ঈমানদার ও নেককার তাদের শুভপরিণতিও সুনিশ্চিত।

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ ۚ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ

'নিশ্চয় যারা তাদের নিকট কোরআনে করীম উপস্থিত হওয়ার পরও তা অস্বীকার করে (তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে)। আর নিশ্চয় তা এক অসাধারণ মহিমময় গ্রন্থ'।

যারা শত্রুতাবশতঃ কোরআনকে অস্বীকার করে, যারা নিজেদের দুষ্ট প্রকৃতির কারণেই সত্যকে গ্রহণ করেনা, পবিত্র কোরআনকে অস্বীকার করে তাদের জন্যে কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করছে, তাদের ধ্বংস অনিবার্য।

কালবী (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ পাক এ মহান গ্রন্থকে মহিমান্বিত করেছেন।

কাতাদা (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ পাক এ গ্রন্থকে অত্যন্ত সম্মানিত করেছেন।

لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ

'কোন মিথ্যা, বাতিল কখনো কোন ভাবেই এতে প্রবেশ করতে পারেনা, সম্মুখ থেকেও নয়; পশ্চাৎ থেকেও নয়'।

কাতাদা এবং সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে 'বাতিল' শব্দটি দ্বারা শয়তানকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে অর্থাৎ শয়তান তা জ্বীন হোক বা মানুষ পবিত্র কোরআনে কোন প্রকার পরিবর্তন করতে পারেনা।

জুযায (রঃ) বলেছেন, সম্মুখ থেকে বাতিল অনুপ্রবেশ না করার অর্থ হলো কম না হওয়া আর পশ্চাৎ থেকে বাতিল না আসার তাৎপর্য হলো বেশী না হওয়া।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য বাক্যটির তাৎপর্য হলো পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থ সমূহে পবিত্র কোরআনের সত্যতা অস্বীকার করা হয়নি, আর পবিত্র কোরআনের পর আর কোন আসমানী গ্রন্থ নাযিল হবেনা যা পবিত্র কোরআনকে রহিত করতে পারে।

অতএব, পবিত্র কোরআন এমনি এক মহান, নিঃস্কলঙ্ক, নির্ভুল, সর্বকালে সংরক্ষিত, সর্বাধিক পঠিত, সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ যাতে কোন অসত্যের অনুপ্রবেশ ঘটেনা।

تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ

এ বিস্ময়কর গ্রন্থ মহাজ্ঞানী, বিজ্ঞানময়, স্বয়ং প্রশংসিত সর্বগুণে গুণান্বিত, সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ।

مَا يُقَالُ لَكَ اِلَّا مَا
قَدْ قِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ وَّذُوْ عِقَابٍ
اَلِيْمٍ ﴿٤٣﴾ وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ؕ
ءَاَعْجَمِيٌّ وَّعَرَبِيٌّ ؕ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ ؕ وَ
الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ؕ اُولٰٓئِكَ
يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ ﴿٤٤﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ
فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ
بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿٤٥﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا
فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا ؕ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿٤٦﴾

তরজমা

(৪৩) (হে রসূল!) আপনার পূর্বের নবী রসূলগণকে যা বলা হয়েছে, আপনাকে তারা তাই বলছে, নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং অতীব কঠিন শাস্তি দাতাও।

(৪৪) যদি আমি এ কোরআনকে (আরবী ব্যতীত) অন্য কোন ভাষায় নাযিল করতাম তবে তারা বলতো, এর কথাগুলো সুস্পষ্ট করে কেন বলা হয়নি? কিতাব

অন্য ভাষায় অথচ রসূল আরবী? (হে রসূল!) আপনি বলুন, এ মহান গ্রন্থ মোমেনদের জন্যে পথ প্রদর্শক এবং (অন্তরের) রোগের নিরাময়, আর যারা ঈমান আনেনা, তাদের কর্ণে বধিরতা এবং পবিত্র কোরআন হবে তাদের জন্যে অন্ধত্ব, তাদের অবস্থা এমন যেন তাদেরকে বহুদূর থেকে আহবান করা হয়।

(৪৫) আমি মূসাকেও কিতাব দান করেছিলাম, তাতেও মতভেদ হয় আর (হে রসূল!) যদি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি সিদ্ধান্ত পূর্বেই না থাকত তবে তাদের মীমাংসা হয়ে যেত। আর নিশ্চয় তারা পবিত্র কোরআন সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে পড়ে আছে।

(৪৬) যে ভাল কাজ করে সে তা নিজের জন্যেই করে আর যে মন্দ কাজ করে তার পরিণতি সে নিজেই ভোগ করে। আর (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালক তাঁর বন্দাদের প্রতি জুলুম করেন না।

তফসীরুল কোরআন

প্রিয়নবী (দঃ)-কে সান্ত্বনা

যেহেতু মক্কার কাফেররা তাদের অন্যায় আচরণের মাধ্যমে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে চরম কষ্ট দিত, তাঁর সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অকথ্য নির্যাতন করতো, তাঁকে কখনো কবি, যাদুকর বলতো, আর কখনো বলতো পাগল (নাজ্জুবিল্লাহি মিন জালিক), তাই এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

مَا يُقَالُ لَكَ اِلَّا مَا قَدْ قِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ط

(হে রসূল!) কাফেররা আপনার সম্পর্কে যে সব আপত্তিকর মন্তব্য করে তা নতুন কিছু নয়; ইতোপূর্বেও নবী রসূলগণকে কাফেররা এভাবেই কষ্ট দিত। তাদের সম্পর্কেও এমন আপত্তিকর মন্তব্য করতো, কিন্তু তারা কাফেরদের এসব আচরণে সবর করতেন, ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিতেন, আপনিও তেমনি সবর অবলম্বন করুন, সবরের মাধ্যমেই অবশেষে তারা এর সুফল লাভ করেছেন, অতএব, আপনিও সবর করুন। যারা ভাগ্যাহত, তারা আপনার কথা শ্রবণ করবেনা, পক্ষান্তরে, যারা ভাগ্যবান তারা আপনার আহবানে সাড়া দেবে, ইসলাম কবুল করে জীবনকে ধন্য করবে।

اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ وَّذُوْ عِقَابٍ اَلِيْمٍ

(হে রসূল!) নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে ক্ষমাপ্রার্থী হয় আল্লাহ পাক তাদেরকে ক্ষমা করেন, কিন্তু যারা ঈমান আনেনা, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মিথ্যাজ্ঞান করে, সত্যের বিরোধিতায় অনড় থাকে তাদেরকে আল্লাহ পাক কঠোর কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিয়ে থাকেন। অতএব, (হে রসূল!) আপনি চিন্তিত হবেন না, যারা আপনার প্রতি ঈমান আনবে তাদের জন্যে রহমত ও মাগফেরাতের দ্বার উন্মুক্ত, আর যারা পাপীষ্ঠ, অবাধ্য তাদের কঠিন শাস্তির পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রয়েছে।

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ءَاَعْجَمِىٌّ وَّعَرَبِىٌّ

'যদি আমি এই কোরআনকে (আরবী ব্যতীত) অন্য কোন ভাষায় নাযিল করতাম তবে তারা বলতো, এর কথাগুলো সুস্পষ্ট করে কেন বলা হয়নি? কিতাব অন্য ভাষায় অথচ রসূল আরবী'?

শানে নযুল

এবনে জরীর হযরত সায়ীদ এবনে যোবায়েরের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, মক্কার কোরায়শরা বলেছিল, এ কোরআন শুধু আরবীতে কোন নাযিল হলো? কিছু অংশ আরবী এবং কিছু অংশ অন্য ভাষায়ও নাযিল হতে পারতো তাহলে সকলের বোধগম্য হতো। যদি অন্য কোন বিদেশী ভাষায় কোরআন নাযিল হতো, আর তা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পাঠ করে শোনাতেন তবে আমরা বুঝতাম যে এটি তাঁর মোজেযা। তাঁর অলৌকিক শক্তির কথা আমরা স্বীকার করে নিতাম। এখন রসূলের মাতৃ-ভাষাও আরবী এবং কোরআনও নাযিল হয়েছে আরবী ভাষায়, এমন অবস্থায় তাঁর বাহাদুরী কোথায়?

কোরায়শদের এমনি আপত্তিকর মন্তব্যের জবাবেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ءَاَعْجَمِىٌّ وَّعَرَبِىٌّ

অর্থাৎ কাফেরদের দাবী মোতাবেক যদি পবিত্র কোরআন আরবী ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় নাযিল হতো, তখন তারা বলতো, এ কেমন বিস্ময়কর ব্যাপার, রসূল হলেন আরবী অথচ তাঁর নিকট অবতীর্ণ গ্রন্থের ভাষা আজমী, যদি আরবী ভাষায় কোরআন নাযিল হতো তবে আমরা বুঝে নিতে পারতাম! পরবর্তী আয়াতাংশে আল্লাহ পাক এর জবাবে এরশাদ করেছেনঃ

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ

'(হে রসূল!) আপনি বলুন, এ মহান গ্রন্থ মোমেনদের জন্যে পথ প্রদর্শক এবং (অন্তরের) রোগের নিরাময়'।

অর্থাৎ কাফেররা যাই বলুক, আপনি তাদেরকে সুস্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিন, পবিত্র কোরআন সমগ্র মানব জাতির জন্যে পথ-প্রদর্শক, মানুষের অন্তরের ব্যাধির অব্যর্থ মহৌষধ রয়েছে এতে, যুগ যুগ ধরে বিভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট মানুষ এ মহাগ্রন্থ থেকে পেয়েছে পথের দিশা, কুসংস্কারের অন্ধকার দূরীভূত করে তাদেরকে এনে দিয়েছে হেদায়েতের আলোর জগতে। শুধু ব্যক্তি জীবনেরই নয়; বরং সমাজ ও জাতীয় জীবনের সকল সমস্যার সমাধান দিয়েছে পবিত্র কোরআন।

وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ط اُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍۢ بَعِيْدٍ

'আর যারা (এতদসত্বেও) ঈমান আনেনা তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং পবিত্র কোরআন হবে তাদের জন্যে অন্ধত্ব, তাদের অবস্থা এমন যেন তাদেরকে বহু দূর থেকে আহবান করা হয়'।

তারা শোনে কিন্তু বোঝেনা, তাদের অবস্থা এই যে, শ্রবণ শক্তি থাকা সত্বেও তারা বধির হয়ে আছে। দৃষ্টিশক্তি থাকলেও তারা অন্ধ হয়ে আছে। দূর থেকে ডাকলে যেমন কেউ আওয়াজ শুনতে পায়না, অথবা শুনতে পেলেও কথা বুঝতে পারেনা, কাফেরদের অবস্থাও হয়েছে তদ্রুপ। তারা শুনেও শোনেনা, বুঝেও বোঝেনা, তাই তারা ঈমান আনেনা।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, কাফেরদের অবস্থা ছিল এই যে, পবিত্র কোরআন দেখার ব্যাপারে তারা ছিল অন্ধ, আর তা শ্রবণের ব্যাপারে তারা ছিল বধির। এ কারণেই তারা পবিত্র কোরআন দ্বারা উপকৃত হয়নি।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ط

'আমি মূসাকেও কিতাব দান করেছিলাম, তাতেও মতভেদ হয়'।

অর্থাৎ একদল লোক ঐ কিতাবকে মেনে নেয়, আর একদল লোক তা অমান্য করে, ঠিক এভাবে পবিত্র কোরআনের ব্যাপারেও একদল লোক পবিত্র কোরআনকে

মেনে নেয়, আরেকদল বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। আর এ মতবিরোধ নতুন কিছু নয়, ইতোপূর্বেও যখনই কোন আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছে তখনই দূরাত্মা কাফেররা তার বিরোধিতা করেছে, কাজেই মক্কার কাফেরদের বিরোধিতায় মনক্ষুন্ন হবার কোন কারণ নেই।

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ

'(হে রসূল!) যদি আপনার প্রতিপালকের একটি সিদ্ধান্ত পূর্বেই না থাকত তবে তাদের মীমাংসা হয়ে যেত'।

অর্থাৎ কাফেরদের শাস্তি সম্পর্কে পূর্বেই যদি সিদ্ধান্ত না থাকত তবে দুনিয়াতেই তাদের প্রতি আযাব নাযিল হতো এবং তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হতো।

যেহেতু পূর্বেই এ সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, পূর্ণ শাস্তি হবে পরকালীন জীবনে অথবা নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবেনা, এ কারণেই আল্লাহ পাক দয়া করে তাদেরকে কিছু অবকাশ দিয়েছেন। আর এ সুযোগেই তারা দু'দিনের এ জীবনে বাড়াবাড়ি করে চলেছে।

وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ

'আর নিশ্চয় কাফেররা পবিত্র কোরআন সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে পড়ে আছে'।

অমূলক সন্দেহ তাদের মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, পরিণামে তারা সত্যকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করেনা।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ط وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ط

'যে ভাল কাজ করে সে নিজের জন্যেই তা করে আর যে মন্দ কাজ করে তার পরিণতি সে নিজেই ভোগ করে'।

বস্তুতঃ এ পৃথিবী মানুষের কর্ম ক্ষেত্র, মানুষ যেমন কাজ করবে তেমনই ফল ভোগ করবে। যে ভাল কাজ করে সে তা তার নিজের জন্যেই করে, কেননা সে নিজেই তার শুভ পরিণতি ভোগ করবে।

পক্ষান্তরে, যে মন্দ কাজ করে তার শোচনীয় পরিণতি তাকেই ভোগ করতে হবে। মানুষ আল্লাহ পাকের বিধান মেনে চললে তথা ভাল কাজ করলে অথবা আল্লাহর বিধান অমান্য করলে আল্লাহ পাকের কিছু যায় আসেনা, ভাল কাজের উপকার তার নিজেরই, আর মন্দ কাজের অপকারও তাকেই ভোগ করতে হবে।

وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ

'আর (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালক তাঁর বন্দাদের প্রতি জুলুম করেন না'।

অর্থাৎ কারো নেক আমলের সওয়াব তিনি বিনষ্ট করেন না, আর একজনের পাপের বোঝা অন্যকে বহন করতে বাধ্য করেন না এবং যারা পাপীষ্ঠ, শাস্তির যোগ্য, তাদেরকে তাদের অপরাধের চেয়ে অধিক শাস্তি প্রদান করেন না, তিনি পরম করুণাময়, অনন্ত অসীম দয়াময়।

আলহামদুলিল্লাহ! অদ্য ১৬ই মার্চ ১৯৯৬ মোতাবেক ২৫শে শওয়াল ১৪১৬ হিঃ, ৩রা চৈত্র ১৪০২ সাল রোজ শনিবার, বিকাল ৩.০০ টায় তফসীরে নূরুল কোরআনের ২৪তম খন্ডের রচনা সমাপ্ত হলো। হে আল্লাহ! কবুল কর এ সাধনা, এ মহান গ্রন্থকে পূর্ণ করার তৌফিক দান কর, আমাদের সকলের প্রতি রহমত নাযিল কর। আমীন।